বি রমন

র এর কাওবয়েরা

স্মৃতির সিঁড়িতে অবরোহণ

র এর কাওবয়েরা

স্মৃতির সিঁড়িতে অবরোহণ

বি রমন

অনুবাদ

মাসুমুর রহমান খলিলী

মোঃ একরামুল্লাহিল কাফি

প্রতীতি প্রকাশন

বাংলাবাজার, ঢাকা

র এর কাওবয়েরা
বি রমন

প্রকাশক
রতন সরকার
প্রতীতি প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

প্রকাশ
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ছবি
রামেশ্বরনাথ কাও

মুদ্রণ
প্রিন্টমাস্টার

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাঙলায়ন
ঢাকা বুক কর্ণার
তামান্না বুক কর্ণার
আহসান পাবলিকেশন
মহানগর প্রকাশনী

সূচি

পরিচ্ছেদ : এক ■ ক্ষোভ ও তিক্ততা / ৭
পরিচ্ছেদ : দুই ■ বাংলাদেশ ও কাওবয়েরা / ১২
পরিচ্ছেদ : তিন ■ কাওয়ের পরিচয় / ২৬
পরিচ্ছেদ : চার ■ উত্তর-পূর্ব ভারত / ৩১
পরিচ্ছেদ : পাঁচ ■ বিদেশী হাত / ৩৯
পরিচ্ছেদ : ছয় ■ জরুরি অবস্থা / ৪৭
পরিচ্ছেদ : সাত ■ মেঘের ঘনঘটা / ৫১
পরিচ্ছেদ : আট ■ না থেকে হ্যাঁ / ৫৮
পরিচ্ছেদ : নয় ■ ক্ষমতায় আবার ইন্দিরা / ৬৬
পরিচ্ছেদ : দশ ■ খালিস্তান সহিংসতা / ৭৬
পরিচ্ছেদ : এগার ■ ইন্দিরা হত্যাকান্ড / ৮৯
পরিচ্ছেদ : বার ■ সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাও / ১০১
পরিচ্ছেদ : তের ■ পাঞ্জাবে অব্যাহত শিখ সহিংসতা / ১২০
পরিচ্ছেদ : চৌদ্দ ■ জেনেভা এবং বফোর্স / ১৪৬
পরিচ্ছেদ : পনের ■ রাজিব গান্ধী এবং 'র' / ১৬৫
পরিচ্ছেদ : ষোল ■ ভিপি সিং এবং চন্দ্রশেখর / ১৮২
পরিচ্ছেদ : সতের ■ রাজিব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড / ১৯৮
পরিচ্ছেদ : আঠারো ■ সন্ত্রাস এবং কর্ম / ২০৬
পরিচ্ছেদ : উনিশ ■ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি / ২৩৬

মুখবন্ধ

মিষ্টি মেয়ে শক্তি ভাটের অনুপ্রেরণা ছাড়া এ বইটি আলোর মুখ দেখত না। শক্তি **ভাট** দিল্লির রেডিফ কোম্পানির নির্বাহী সম্পাদক শিলা ভাট এবং গুজরাটি লেখক কান্তি ভাটের কন্যা। তার স্বামী জিত থাইল একজন খ্যাতিমান কবি।

২০০২ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্কে এক সম্মেলনে শক্তি ভাটের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। শক্তি ও তার স্বামী দু'জনই রেডিফ কোম্পানি গ্রুপের বহুল প্রচারিত সাময়িকী 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড'-এর সাংবাদিক ছিলেন।

২০০৪ সালের আগস্টে তারা দু'জন ভারতে ফিরে আসেন। কিছুকাল এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করার পর শক্তি ভাট একটি নামকরা প্রকাশনা সংস্থার নয়া দিল্লি অফিসে যোগ দেন। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি চাকরিটি ছেড়ে দেন। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের একটি নতুন প্রকাশনা সংস্থার প্রধান হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয়।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমি দিল্লি গিয়েছিলাম। এটি জানতে পেরে শক্তি ভাট আমাকে অ্যাম্বেসেডর হোটেলের কফি শপে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান। লাঞ্চ খেতে খেতে তিনি আমাকে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান। শক্তি ভাট জানান, তিনি ২০০৭ সালে পাঁচটি বই প্রকাশ করার প্রস্তাব করেছেন। এর মধ্যে চারটি গল্পের এবং একটি অন্য বই। তিনি আমাকে রিসার্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)-তে আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বই লেখার প্রস্তাব দেন।

আমি তাকে বললাম, ইতঃপূর্বে আরো কিছু প্রকাশক আমাকে একই প্রস্তাব দেন। আমি এই ধারণাকে পছন্দ করিনি বিধায় তাদের না করে দিয়েছি।

শক্তি ভাট আমাকে মত পরিবর্তন করার এবং তার প্রতি এ ব্যাপারে একটু বিশেষ আনুকূল্য দেখানোর অনুরোধ জানান। শক্তি ভাট এতটাই অনুনয় করলেন যে আমি তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই রাজি হয়ে গেলাম।

চেন্নাই ফিরেই আমি বইটি লিখতে বসে যাই। অল্প কয়েক দিন পরই শক্তির কাছ থেকে একটি বার্তা পাই। তাতে বলা হয়, 'মি. রমন, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কি নমুনা হিসেবে কয়েকটি অধ্যায় দেখতে পারি?'

আমি তাকে বইয়ের একটি অধ্যায় পাঠিয়ে দেই। দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমি তার প্রতিক্রিয়া পেয়ে যাই। এটি ছিল এমন, 'চমৎকার, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম।

আপনার লেখার ধরন খুবই আধুনিক এবং এতটাই আধুনিক যা আমি কল্পনা করতে পারিনি।'

২০০৭ সালের ২৪ মার্চ আমি শক্তিকে আমার বই লিখে শেষ করার কথা জানাই। আমি তাকে এও জানাই, রিভিশনের পর পাণ্ডুলিপিটি হস্তান্তরের জন্য আমি ১৮ এপ্রিল দিল্লিতে তার সাথে দেখা করব। এ খবর পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং বইটির সম্পাদনা, প্রকাশনা, বাজারজাতকরণ এমনকি কিভাবে তার উদ্বোধন করা হবে সে সম্পর্কে পর্যন্ত পরিকল্পনা করতে লেগে যান।

কিন্তু নিয়তি বড্ড নিষ্ঠুর। হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ক'দিন শয্যাশায়ী থেকেই ২০০৭ সালের ১ এপ্রিল ভোরে শক্তি পরলোক গমন করেন। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম। আমি এই বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আমি এটি কেবল তার জন্যই লিখেছিলাম। তার অনুপস্থিতিতে এই বই প্রকাশের বিষয়টিই আমি মানতে পারিনি।

অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই বইটি আমি শক্তির নামে উৎসর্গ করব।

তার কতই না ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ছিল। কতই না সুন্দর সুন্দর ধ্যানধারণা তার মধ্যে লুকায়িত ছিল। প্রকাশনার জগতে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করার কতই না সঙ্কল্প তার মধ্যে ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই তিনি তাকে স্বর্গে নিয়ে গেছেন।

তিনি মাত্র ২৬ বছরের অপরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাই তার স্মৃতি, স্বপ্ন ও ধ্যানধারণাগুলো জীবিত রাখতে হবে। আমার এ বই সে লক্ষ্যেই নিবেদিত ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আপনারা যখন বইটি পড়বেন তখন দয়া করে শক্তির কথা একটু ভাববেন এবং তাকে আশীর্বাদ করবেন যাতে তার আত্মা শান্তি পায়।

তিনি পীড়াপীড়ি না করলে হয়তো এ বই আমি লিখতাম না। তিনি চেয়েছিলেন এ বইটি যেন তার প্রতি আমার বিশেষ উপহার হয়। আজ এটা তাই হয়ে রইল।

বি. রমন
চেন্নাই
১৮-০৫-২০০৭

পরিচ্ছেদ : এক

ক্ষোভ ও তিক্ততা

ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড এনালাইসিস উইং (আর অ্যান্ড এ ডব্লিউ) 'র'-তে আমি ২৬ বছর চাকরি করেছি। এই দীর্ঘ কর্মজীবনে আমার সহকর্মীরা আমাকে নানাভাবে চিনতেন। কেউ মনে করতেন আমার মুখায়বে নাকি ভাবলেশ বলতে কিছু ছিল না। কেউ মনে করতেন আমার কথায় ও কাজে আবেগ-অনুরাগের কোনো লক্ষণ ছিল না। কেউ মনে করতেন আমি একটি রোবট, যে নাকি সপ্তাহের সাত দিন আর বছরের ৩৬৫ দিন সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা অবধি কাজ করে চলে। আবার কেউ মনে করতেন আমি জীবনে বেশ সাফল্য পেয়েছি।

১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট কিন্তু আমি একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ বনে গিয়েছিলাম। সেদিন আমি ও আমার এক সহকর্মীর ৫৮ বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে 'র'-এর কর্মকর্তারা সন্ধ্যায় এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। সে সংবর্ধনা শেষে যখন রাতে সরকারি গাড়িতে আমি বাসায় ফিরছিলাম তখন আমার মানসিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল তা ভাষায় বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, সেদিন রাতে আমার প্রতিবেশীদের কেউ যদি আমাকে ঘরে ফেরার সময় দেখে থাকেন তাহলে তারা নির্ঘাত আমাকে চিনতে পারেননি।

বিগত ২৬ বছর ধরে চাপা দিয়ে রাখা আমার সব অবদমিত ভাবাবেগ ক্ষোভ ও তিক্ততা যেন বিস্ফোরিত হয়ে ফেটে পড়ল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম বাসটার্ড (হারামজাদারা)। হ্যাঁ, আমি বড্ড ক্ষেপে গিয়েছিলাম। তবে আমার সে রাগ বা ক্ষোভ আমার সংস্থার প্রতি নয়, যেটি আমাকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে দেখত।

এই ক্ষোভ ছিল না আমার সহকর্মীদের প্রতিও। কেননা তারাও আমাকে কদর করত, আপন ভাবত। আমার এ ক্ষোভ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের প্রতি কিংবা তার পূর্বসূরীরা, যারা সেই ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রত্যক্ষভাবে 'র'-এর দায়িত্বে ছিলেন তাদের প্রতিও না। ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) বিভক্ত হয়ে 'র'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

আসলে আমার যত ক্ষোভ ছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতি। আমি সব

সময় যুক্তরাষ্ট্রকে, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষগুলোকে ভালোবাসতাম। কিন্তু আমেরিকানদের মধ্যে এমন একটি প্রজাতি আছে যাদের প্রতি আমি আমার বিগত ২৭ বছরের গোয়েন্দাগিরির জীবনে কোনো ভালোবাসা জন্মাতে পারিনি। আর এরা হচ্ছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা। 'র' গঠিত হওয়ার আগে মিয়ানমার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমি যখন ১ বছর আইবি'র দায়িত্বে ছিলাম এবং ২৬ বছর যখন 'র'তে কাটিয়েছি তখনো আমি তাদের ভালোবাসতে পারিনি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতি আমার ঘৃণার মাত্রা 'র'তে আমার চাকরি জীবনের শেষদিকে আরো বেশি বেড়ে গিয়েছিল। অবসরে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে 'র' প্রধান আমাকে জানালেন, নরসীমা রাও তাকে কোনো একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনার জন্য ডেকেছেন এবং তিনি চান আমি যাতে এ আলোচনাকালে তার সাথে থাকি। আমি তাই করেছিলাম।

নরসীমা রাও ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের কাছ থেকে পাওয়া একটি ব্যক্তিগত বার্তা আমার বসকে দিলেন। তিনি সেটি নীরবে পড়ে আমাকে দিলেন। বিশ্বাস করুন, আমি যখন এটা পড়ছিলাম তখন আমার ইচ্ছে করছিল মার্কিনিদের ওপর বমি করি। কিংবা থুথু ফেলি। সত্যি যদি তাদের কেউ তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন আমি হয়ত তাই করতাম।

ওই বার্তায় বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রদূতকে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন মধ্যম শ্রেণীর কর্মকর্তা ডেকে নিয়ে বলেন, তারা জানতে পেরেছেন যে, 'র'-এর গোপন তৎপরতা শাখা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে এবং দেশটিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ইতঃপূর্বে নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে কাজ করা পররাষ্ট্র দফতরের সে কর্মকর্তা রাষ্ট্রদূতকে বললেন, তিনি যেন নয়াদিল্লিকে জানিয়ে দেন যে, 'র' যদি পাকিস্তানে তাদের গোপন তৎপরতা বন্ধ না করে তা হলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে এই অভিযোগ এনে পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে পারে।

পররাষ্ট্র দফতরের বার্তায় বলা হয়েছিল, 'আপনারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বলে আসছেন পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। হ্যাঁ, আমরা তা করব। কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ না করলে আমরা একই সাথে ভারতের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেব।'

নরসীমা রাও প্রশ্ন করলেন, 'পকিস্তানে আমরা কী ধরনের গোপন তৎপরতা চালাচ্ছি?'

আমি বললাম, 'আমাদের ভারতের প্রতি ভালো দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে পাকিস্তানি সমাজের এমন বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছি এবং আমরা তাদেরকে সরাসরি রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন দিচ্ছি।'

তিনি বলেন, 'কখন থেকে?'

আমি বললাম, '১৯৮৮ সাল থেকে। যখন পাঞ্জাবে পাকিস্তানের মদদে সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যায় এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সূত্রগুলোর একটি থেকে প্রমাণ

পাওয়া যায় যে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, কানাডায় অবস্থানরত বাবর খালসার একজন সন্ত্রাসী তালিন্দার সিং পারমারকে পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স ডাইরেক্টরেট (আইএসআই) আশ্রয় দিয়েছে। তালিন্দার সিং পারমার ১৯৮৫ সালের জুনে আয়ারল্যান্ডের উপকূলের কাছে ভারতীয় বিমান সংস্থার বিমান কানিষ্কা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সে অবস্থায় রাজীব গান্ধী আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আমরা যাতে আমাদের যোগাযোগ শুধু পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মহলের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ না রাখি। তার বাইরেও যারা ভারতকে বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে করে তাদের সাথেও যাতে আমরা যোগাযোগ রক্ষা শুরু করি।'

আমি আরো বললাম, '১৯৯১ সালে আপনি যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে সময় এবং পরবর্তী সময়েও আমরা সে বিষয়ে আপনাকে অবহিত করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু পররাষ্ট্র দফতর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা বলছে কেন? তাহলে আপনাদের কোনো পদক্ষেপকে সন্ত্রাসবাদ বলে ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কি?'

'নিশ্চয়ই না, স্যার।'

নরসীমা রাও কিছু সময়ের জন্য চিন্তা করে বললেন, 'পররাষ্ট্র দফতরের অভিযোগগুলোর যাতে জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয় সে মর্মে রাষ্ট্রদূতকে পাঠানোর জন্য একটি জবাবের খসড়া আমাকে দিন। আর আপনাদের পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ করবেন না। পাকিস্তানের সবশ্রেণীর মানুষের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষার অধিকার রয়েছে। আমেরিকার এটা পছন্দ না হলেও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই।'

রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠানোর জন্য জবাবের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল অবসর গ্রহণের আগে সেটিই ছিল আমার শেষ খসড়া। সেটি লিখে আমি আমার চিফকে দিয়েছিলাম। তিনি সেটি নরসীমা রাওয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নরসীমা রাও রাষ্ট্রদূতের কাছে সেটিই পাঠিয়েছিলেন কি না, কিংবা পাঠালেও অবিকল সে ভাষায় পাঠিয়েছিলেন কি না তা আর আমি জানতে পারিনি।

আমার অবসরে যাওয়ার পরদিন তৎকালীন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রতিমন্ত্রী রাজেস পাইলট আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, 'এখন আপনার কী কী পরিকল্পনা রয়েছে?' 'স্যার আমি ২০ সেপ্টেম্বর স্থায়ীভাবে মাদ্রাজ চলে যাচ্ছি।' 'আপনার মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি আপনার ব্যাপারে নরসীমা রাওয়ের সাথে কথা বলেছি। তিনি আপনার মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান। সে লক্ষ্যে তিনি আপনাকে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করতে সম্মত হয়েছেন। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে আপনি সে অঞ্চলে বহু বছর কাজ করেছেন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান হবে বলে আমরা মনে করি।'

আমি তাকে বললাম, আমি মাদ্রাজে ফিরে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করি। আমি আরো বললাম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য যদি কাউকে ইন্টেলিজেন্স কো-অর্ডিনেটর

নিয়োগ করতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনো রাজ্যেরই লোক হতে হবে। কোনো বহিরাগত সেখানে তেমন একটা সফল হবেন না।

এর কিছু দিন পর নরসীমা রাও আমাকে তলব করলেন। 'রাজেস পাইলট বলল, আপনি নাকি ২০ সেপ্টেম্বর স্থায়ীভাবে মাদ্রাজ চলে যাচ্ছেন?' 'জী স্যার।'

'কিন্তু আপনার এত তাড়া কিসে? আমরা আপনার সেবাকে কাজে লাগাতে চাই। আপনি যদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কাজ করতে ইচ্ছুক না হন তাহলে আমরা আপনার জন্য অন্য কোনো কিছু ভাবতে পারি।'

আমি আমার অপারগতার কথা জানিয়ে মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম।

তিনি বললেন– 'আপনি যদি না চান তাহলে আর কি-ই বা করার আছে। তবে আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন।'

আমি যে মুহূর্তে উঠি উঠি করছি ঠিক সে মুহূর্তে তিনি পররাষ্ট্র দফতরের একজন মহিলা কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে জানতে চাইলেন তার সম্পর্কে আমার ধারণা কী। আমি বললাম, তার সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে ভারতের প্রতি তার অন্তর থেকে ঘৃণা রয়েছে। আমি আরো বললাম, 'স্যার জম্মু ও কাশ্মীরের গোলযোগের পেছনে তার হাত রয়েছে। তিনি নয়াদিল্লিবিরোধী কাশ্মীরী নেতাদের সাথে দূতিয়ালি করেন। তিনি বেনজির ভুট্টোর একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আমার সন্দেহ যে, পাকিস্তানে অবস্থানরত খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত আমাদের গোয়েন্দা তথ্য তিনি বেনজিরকে সরবরাহ করেন, যা বেনজির ভুট্টো যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করেন। এতে কয়েকজন মূল্যবান সোর্স আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।' বেনজির ভুট্টো ওই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

নরসীমা রাও বললেন, 'আমি জানি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ভারতকে কখনো সুনজরে দেখেনি। কিন্তু হঠাৎ করে এই অপছন্দের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণটা কী?

'স্যার, এটা হঠাৎ করে হয়নি। আপনার হয়ত মনে আছে নারকটিক্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দিচ্ছে না মর্মে ঘোষণা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের হুমকি দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, সেটি আমার স্মরণে এসেছে। কেন তারা এমনটি করল?'

'তাদের অভিযোগ, চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর কিছু স্থানে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণে আফিম চাষ হয়। কয়েক বছর আগে তারা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিকিউরিটিকে (ডিজিএস) বলেছিল– বিমানের সাহায্যে ওই এলাকার আকাশ থেকে ছবি তুলে তাদেরকে সরবরাহ করতে এবং এ কাজের জন্য তারা একটি বিমান দিয়েও সহায়তা করতে চেয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু তারা চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর অ্যারিয়াল ভিউ ক্যামেরায় ধারণ করার সময় বিমানে তাদের কিছু গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে সাথে রাখার কথা বলেছিল। তাতে রাজি না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এই বলে তখন হুমকি দিয়েছিল যে, ভারত নারকটিক্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা করছে না। আপনার অনুমোদন পেয়ে আমরা আমাদের অবস্থানে অটল ছিলাম। পরে আর অবশ্য তারা বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।'

'তাদেরকে সাথে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। তবে সে সাথে আমাদেরকে সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে'– এ কথা বলে তিনি আমাকে বিদায় জানালেন।

নরসীমা রাওয়ের সাথে সেটাই ছিল আমার শেষ বৈঠক। কিন্তু আমি জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে আমার মতামত তুলে ধরে মাঝে মধ্যে পত্র লিখতাম। তিনি কখনো সেসব চিঠির জবাব দেননি। তবে আমার ধারণা হচ্ছে– তিনি সেসব চিঠি অবশ্যই পড়তেন। কেননা, বেশ কয়েক বার গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তারা রাওয়ের পরামর্শে আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং নরসীমা রাওকে লেখা চিঠির বিষয় নিয়ে বিশেষত আমাদের টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসে বিদেশীদের অংশগ্রহণ করতে দেয়ার বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশ ও কাওবয়েরা

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরিতা রয়েছে এমন যেকোনো দেশে পরিচয় গোপন রেখে কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এটি শুধু গোয়েন্দা তথ্যের জন্য প্রয়োজন হয় এমনটি নয়। অধিকন্তু জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধা-কূটনৈতিক ও আধা-সামরিক ধরনের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। গতানুগতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক বা সামরিক উপায়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ বা জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না মনে হলে অথবা এ ধরনের গতানুগতিক উপায় কার্যকর হবে না বলে মনে হলে সে ক্ষেত্রে কোনো কোনো দেশ গোপন কার্যক্রমের আশ্রয় নেয়। প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানোর জন্য যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থা গোপন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মতো সক্ষমতা অর্জন করে। কোনো কোনো দেশের সরকার তাদের গোয়েন্দা সংস্থার এ ধরনের কার্যক্রম চালানোর ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করে। তবে গোপন রাখা বা অস্বীকার করার প্রয়োজন রয়েছে এমন কাজের প্রকাশ তারা বিস্তারিতভাবে করে না। আবার কোন কোন রাষ্ট্র এ ধরনের কার্যক্রমের অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) দ্বিতীয় পরিচালক পরলোকগত বিএন মল্লিকের দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির সীমিত গোপন কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা ছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএসআই'র কর্মকাণ্ডের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর গোপন কার্যক্রম বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ভারতে এ রকম একটি ধারণা চালু রয়েছে যে, পাকিস্তান ১৯৮৯ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস বা সহিংসতা শুরু করেছে। বাস্তবে এ ধারণা সঠিক নয়। ১৯৪৬ সালে নাগাল্যান্ডে প্রথম তা শুরু করা হয়। আইএসআই নাগা বিদ্রোহী নেতা ফিজোর অনুসারীদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত বিভিন্ন ক্যাম্পে। উত্তর মিয়ানমারের মাধ্যমে ভারতীয় ভূখণ্ডে তৎপরতা চালানোর জন্য নাগাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপদ আশ্রয়স্থলও দেয়া হয়।

১৯৬০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একই ধরনের সহায়তা ও আশ্রয়স্থল দেয়া

হয় লালদেঙ্গার নেতৃত্বাধীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টকে (এমএনএফ)। আইএসআই পূর্ব পাকিস্তানে নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের সাথে চীনা গোয়েন্দাদের যোগাযোগ স্থাপনেরও ব্যবস্থা করে দেয়। পরে চায়নিজ ইন্টেলিজেন্স চীনের ইউনান প্রদেশে নাগা ও মিজোদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করে দেয়।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএসআই'র চালানো কার্যক্রমের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষীদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা দানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন সরকার এ ফলাফলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানালে ১৯৭১ সালের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক অসন্তোষ ও গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন বিদ্রোহ শুরু করে তখন 'র'-এর বয়স মাত্র আড়াই বছর। বিদেশের ভূখণ্ড এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্তের ওপারে গোপন তৎপরতা চালানোর সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়ার ব্যাপারে পেশাদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জন্য এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। তখনো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'র'কে তৈরি করার প্রক্রিয়া চলমান ছিল।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) উত্তরাধিকারী সংস্থা হিসেবে 'র' আইবি'র গোয়েন্দা সংগ্রহগুলো এবং পাকিস্তান ও চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট গোপন তৎপরতার নেটওয়ার্কের অধিকারী হয়। পশ্চিমা দেশগুলো এবং ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার মান অনুযায়ী এগুলো মোটেই উত্তীর্ণ ছিল না। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্তর্ঘাত প্রতিরোধে আইবি'র কার্যক্রমে অনেক অপূর্ণতার বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৬৮ সালে ২১ সেপ্টেম্বর 'র' গঠন করার সময় আইবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখার প্রধান রামেশ্বরনাথ কাওকে নতুন সংস্থার শীর্ষ পদে বসানো হয়। র গঠনের প্রথম কয়েক মাসে তিনি দু'টি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেন। প্রথমত, পাকিস্তান ও চীনে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা সুসংহত করা। দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে গোপন তৎপরতা বৃদ্ধি ও সুসংহত করা।

দু'বছরের কিছু বেশি সময় কার্যকর গোপন কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য খুবই সামান্য হলেও 'র' তা করতে সক্ষম হয়। বাস্তবে এই সক্ষমতা প্রমাণিত হয় পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সাহায্য করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত নেয়ার পর।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় ভারতের একক সাফল্য ছিল না। এ যুদ্ধ মূলত ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের যৌথ বিজয় অর্জনের ঘটনা হয়ে উঠে। এটা বললে ভুল হবে যে, ভারত স্বাধীন বাংলাদেশের একক স্থপতি।

সৃষ্টির চাইতেও ভারতের ভূমিকা বেশি ছিল সৃষ্টিতে সহায়তাকারীর।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীন হওয়ার আগ্রহ ও সঙ্কল্প ছাড়া বাংলাদেশের জন্ম হতো না। লক্ষ্য অর্জনে তাদের আত্মত্যাগ ছিল অনেক বড়। ভাবতে হবে কত মানুষ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন! কত বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি সেনা ও আইএসআই সৃষ্ট সংগঠন আল শামস, আল বদরের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন! তাদের এই আত্মত্যাগ স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত শুধু তাদের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ যাতে ব্যর্থ না হয় তা নিশ্চিত করেছে।

ফিল্ড মার্শাল (তখন জেনারেল) এস এইচ এফ জে মানেকশ'র নেতৃত্বে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং পরলোকগত কে এম রুস্তমজির নেতৃত্বে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর (বিএসএফ) প্রকাশ্য এবং 'র' ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর গোপন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। তবে ইন্দিরা গান্ধী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তা না হলে এ প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। এর সাথে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুকূল পরিবেশ তৈরির কাজ করেন। তারা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে আসা লাখ লাখ উদ্বাস্তুর জন্য মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম সংগঠিত করেন।

জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) দুই সদস্য ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটি বিমান অপহরণ করে লাহোরে নিয়ে যায়। এর পর ভারতের আকাশ সীমায় পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর নাটকীয় সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তানে বিজয় অর্জনকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়। পাকিস্তানি বিমানবহর সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘুরে পূর্ব পাকিস্তান যেতে শ্রীলঙ্কার কাছে রিফুয়েলিং সুবিধা চায়। ইন্দিরা গান্ধী এ সুবিধা বন্ধের জন্য কলম্বো সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। এটি পশ্চিম পাকিস্তানের সদর দফতর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রসদ, গোলাবারুদ ও জনবল সরবরাহ ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে দুর্বল করে ফেলে।

'র' এ সময় পাঁচ পর্যায়ে ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, নীতিনির্ধারক ও সশস্ত্র বাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ; দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দান; তৃতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তান ও বিদেশে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি কর্মকর্তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা; চতুর্থত, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ শিবির ও নিরাপদ আস্তানাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা এবং পঞ্চমত, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা এবং শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সংগঠিত করা।

'র' ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে নীতিনির্ধারকদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের প্রবাহ ছিল অবিরাম ও ব্যাপক। পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙালি সরকারি কর্মকর্তার সহযোগিতা এবং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর দুর্বল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের

কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল।

'র' গঠনের পর কাওয়ের প্রথম কাজ ছিল পাকিস্তান ও চীনের কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্মি সিগন্যাল কোরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি মনিটরিং বা তদারকি বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আইবি'র একজন সংকেত বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে একটি সংকেত শাখা স্থাপন। চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সংকেত শাখার সাফল্য হতাশাব্যঞ্জক হলেও এ শাখা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ইন্টারসেপ্ট করা বা আড়িপাতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব কোড ব্যবহার করত তা ভাঙতে তারা সক্ষম হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং সিনিয়র কর্মকর্তারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে নিরাপত্তা নির্দেশনা দেয়ার জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সর্তকতাও অবলম্বন করত না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে ইন্টারসেপশন প্রতিরোধে স্ক্রাম্বলিং ডিভাইস ব্যবহারের প্রাথমিক সতর্কমূলক পদক্ষেপও তখন পাকিস্তানের শীর্ষ কর্মকর্তারা গ্রহণ করতেন না। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান ও অন্যরা তাদের কর্মকর্তাদের সাথে যে টেলিফোন আলাপ করতেন তার বিবরণ প্রায় প্রতিদিনই চলে যেত ইন্দিরা গান্ধী এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তার আস্থাভাজন ভারতীয় কর্মকর্তাদের হাতে।

১৯৭১ সাল ছিল ভারতের পেশাদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জন্য এক ধরনের স্বপ্নময় পরিস্থিতি। গোয়েন্দা তথ্যের জন্য তাদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো না বরং এসব তথ্য তাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির হতো। পূর্ব পাকিস্তানের পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে তখন এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য তাদের নেতৃবৃন্দ ও ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে সরবরাহ করত। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ গোপন তথ্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সরবরাহ করা এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা দানকে তাদের দেশপ্রেম ও দায়িত্বের অংশ বলে মনে করত।

১৯৬৮ সালের আগে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) এবং পরে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে বাঙালি নেতা ও কর্মকর্তাদের অপদস্থ ও নিগৃহীত হওয়ার বোধ এ নেটওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করে। এই নেটওয়ার্কের কারণেই 'র' এবং পূর্ব পাকিস্তানের নেতা ও কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষিত নিজস্ব যোদ্ধা এবং আমলাদের সমন্বয়ে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু ভারত এবং এর সংস্থাগুলোর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণকারি বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা মুসলমানরাই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষে। এসব বিহারি অভিবাসী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি অনুগত ছিল এবং তাদের সহায়তা নিয়ে বাঙালিদের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। বিহারি অভিবাসীদের সংখ্যা কম হলেও তাদের স্বাধীনতা

আন্দোলনে শরিক করা যায়নি।

১৯৭১ সালে 'র'-এর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (মনোযুদ্ধ) শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণভাবে তথ্য শাখা হিসেবে এর পরিচিতি ছিল। মি. কাও তথ্য মন্ত্রণালয় ও বেতার থেকে নেয়া পেশাজীবীদের সাথে সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করা লোকদের সমন্বয়ে গঠিত এ শাখাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর নির্মমতা এবং এর ফলে ভারতে কোটি শরণার্থীর বোঝা চেপে বসার ব্যাপারে অবিরাম প্রচারণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব দেন।

'র'-এর মনোযুদ্ধ শাখা বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে কাজ করে। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মাঠ পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং ভারতের কর্তব্য পালনের ব্যাপারে সচেতন করার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব কাউকে দিতে হলে তা দিতে হবে অবশ্যই ইন্দিরা গান্ধীকে। তিনি ছিলেন জন্মগতভাবেই এক মনস্তাত্ত্বিক যোদ্ধা। পৃথিবীজুড়ে সফরের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি পরিবেশকে এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে, কেউ সমর্থন না জানালেও পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বৈরী মনোভাব দেখাতে পারেননি।

ভারতের প্রতি প্রধান বৈরী মনোভাবের দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। তাদের কেউই পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারত সফল হোক তা চায়নি। তারা মনে করেছে, পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ এবং এর ফলে শরণার্থীদের প্রবাহ সৃষ্টির কারণেই ভারত তার পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা বা নীলনকশা তৈরি করেনি। তারা পাকিস্তানি শাসকদের সাথে একমত হয়েছে যে, ভারতীয় নীলনকশার কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ এবং ভারতমুখী শরণার্থী প্রবাহ সৃষ্টি হয়। মস্কোর সাথে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের মৈত্রী তাদের এই বৈরিতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

সেই দিনগুলোতেই প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনের গোপন যোগাযোগ শুরু হয়। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ের শুভেচ্ছা অর্জন করেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে মাও সে তুং ও তার সহযোগীদের সাথে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের গোপনে চীন সফর সম্ভব হয়।

ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়েছিল প্রধানত মস্কোর প্রতি শত্রুতাকে কেন্দ্র করে, তবে এতে ভারতের বিষয়টিও সক্রিয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই মনে করত, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিভূ হিসেবে ভারতের প্রতি নজর রাখার প্রয়োজন রয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসি ও বেইজিংয়ের মধ্যে ঐকমত্য ছিল যে, ভারতের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা প্রয়োজন এবং ভারতকে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেয়া উচিত হবে না। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মমতার ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী জনমতের বিস্তৃতির কারণে নিক্সন ও মাও সে তুং দু'জনই বুঝতে পারেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে সহায়তা করার মতো তাদের খুব বেশি

করণীয় আর নেই। এমনকি পাকিস্তান তার পূর্বাঞ্চল নিশ্চিতভাবেই হারাতে যাচ্ছে এ উপলব্ধি থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনের পর ইন্দিরা গান্ধী যাতে পশ্চিম পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা কার্যকর করতে না পারে সে ব্যাপারে তারা সংকল্পবদ্ধ হন। তারা মনে করতে থাকেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর আসলেই এ ধরনের মতলব রয়েছে। বাংলাদেশের পর তিনি ইরান সীমান্তবর্তী বেলুচিস্তানের প্রতি দৃষ্টি দেবেন, যেখানে ইতোমধ্যে জনগণের মধ্যে পাঞ্জাবি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে।

ভারতীয় এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে চীন পাকিস্তানি প্রশাসনকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ শুরু করে। তারা একই সাথে চীনের জিন জিয়াংয়ের সাথে পাকিস্তানের সংযোগকারী কারাকোরাম মহাসড়কের নির্মাণকাজ দ্রুততর করেন। যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে চীনা সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত এ মহাসড়কটির কাজ ১৯৭৮ সালে শেষ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকারের সাথে মিলে এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারতকে অস্থিতিশীল করার গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের এ পরিকল্পনা পাঞ্জাবে খালিস্তান নামে শিখদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহিত করে।

১৯৭১ সালের আগেই যুক্তরাজ্যে চরণ সিং পাঞ্চির নেতৃত্বে শিখ স্বশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সক্রিয় ছিল, তবে এর প্রতি শিখ মূলধারার কোনো সমর্থন ছিল না এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও গণমাধ্যম এর প্রতি কোনো গুরুত্ব দিত না। ১৯৭১ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ও পাকিস্তানের আইএসআই'র যৌথ গোপন তৎপরতার ফলে পাঞ্জাবে ভারতের জন্য নানা ধরনের জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দেখা যায়। এ ধরনের তৎপরতায় মার্কিন উৎসাহ এক দশকের অধিককাল ধরে চলতে থাকে এবং ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দুই শিখ দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পর তার অবসান ঘটে।

১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী এবং 'র'-এর মনোযুদ্ধ শাখা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রশ্নে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। এক সময় ইন্দিরা গান্ধী প্রশাসনের বিরুদ্ধেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ও আইএসআই'র যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক মনোযুদ্ধ শুরু হতে দেখা যায়। পাঞ্জাবে শিখদের ব্যাপারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে এই মনোযুদ্ধ শুরু করা হয়।

শিখ নেতা ড. জগজিৎ সিং চৌহান যুক্তরাজ্যে গিয়ে শিখ স্বশাসন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এর নাম দেন খালিস্তান আন্দোলন। পাঞ্জাবে ড. জগজিৎ সিংয়ের অনুসারীর সংখ্যা বা প্রভাব খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ইয়াহিয়া প্রশাসন শিখ জনগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে তাকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং তার কাছে পাকিস্তানে রক্ষিত শিখদের কিছু পবিত্র নিদর্শন হস্তান্তর করেন। ড. সিং এসব নিদর্শন তার সাথে নিয়ে যুক্তরাজ্যে যান এবং সেখানকার শিখ ধর্মানুসারীদের মন জয় করার চেষ্টা করেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে

তিনি স্বাধীন খালিস্তান প্রতিষ্ঠার ডাক দেন।

ড. জগজিৎ সিং নিউ ইয়র্ক গিয়ে জাতিসঙ্ঘ কর্মকর্তা ও মার্কিন সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে শিখদের মানবাধিকার হরণের অভিযোগ আনেন। ড. হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট এসব বৈঠকের আয়োজন করে নেপথ্যে থেকে।

মার্কিন ও পাকিস্তানি উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে ড. চৌহানের আন্দোলন ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন এবং মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার নয়াদিল্লিতে ক্ষমতায় আসে। এ সময় চৌহান আকস্মিকভাবে তার খালিস্তান আন্দোলন পরিত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারণা করে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতিকে ভারত সমর্থন করবে এবং ভারতীয় গোয়েন্দারা আফগান প্রতিপক্ষকে সহায়তা দেবে। এ সময় চৌহান আবার যুক্তরাজ্যে ফিরে যান এবং খালিস্তান আন্দোলন নতুন করে শুরু করেন।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ লাইন তৈরির জন্য এ সময় কারাকোরাম মহাসড়ক তৈরির কাজ জোরদার করা হয়। চীনও নাগা এবং মিজো বিদ্রোহীদের অন্তর্ঘাত ও সহিংসতা সৃষ্টিতে সহায়তা দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাপারে তাদের এ বিশেষ উৎসাহ পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭১ সালের ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারা তা ১৯৬৮ সাল থেকেই শুরু করে।

পাঞ্জাবে ভারত ও ইন্দিরা গান্ধীর জন্য জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ও পাকিস্তান যখন একে অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসে, তখন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য আইএসআই ও চায়নিজ ইন্টেলিজেন্স এক সাথে কাজ করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল– যাতে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সেখানকার অন্তর্ঘাত প্রতিরোধের কাজেই ব্যস্ত থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ভারত যেন কোনো হুমকি হয়ে দাঁড়াতে না পারে। অন্যদিকে পাকিস্তানকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সহায়তার পাশাপাশি এ অঞ্চলে ভারতীয় অবস্থানকে দুর্বল করে তিব্বতে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য ছিল চীনের। একই সাথে ভারতের অরুনাচল ও তিব্বতের মধ্যে সংযোগ-সমন্বয়ের লক্ষ্য অর্জনেও তা সহায়ক হতে পারে বলে মনে করে বেইজিং।

ভারতীয় সেনাবাহিনী বিমান ও নৌ বাহিনীর সহায়তায় সাফল্যের সাথে ঢাকামুখী অভিযান চালালেও 'র'-এর গোপন কর্মকাণ্ড ইউনিট এবং ডাইরেক্টর জেনারেল অব সিকিউরিটি (ডিজিএস) এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের অবকাঠামোগুলো ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালায়। ডিজিএসকেও এ সময় 'র' প্রধান মি. কাওয়ের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। এ অভিযানের আগেই নাগা বিদ্রোহীরা তাদের অবস্থান বার্মার নাগা পাহাড়ে সরিয়ে নেবে বলে যে ধারণা করা হয়েছিল তা সঠিক প্রমাণিত হয়। মিজোরা অবস্থান সরিয়ে না নিলেও 'র' ও

ডিজিএস-এর অভিযানের সময় সীমানা পেরিয়ে চীন পাহাড় ও বার্মার আরাকান বিভাগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের (এমএনএফ) নেতা লালদেঙ্গা রেঙ্গুন চলে যান। সেখান থেকে তাকে আইএসআই করাচি নিয়ে যায়। বিদ্রোহীদের ভৌত অবকাঠামো ধ্বংসের পাশাপাশি এ অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের কার্যালয় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধার, যেখানে এমএনএফ-এর সাথে আইএসআই ও চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সের যোগসূত্র পাওয়া যায়। এ অভিযানের পর নাগা ও মিজো বিদ্রোহীরা তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হারালেও তাদের জনবল অক্ষত থেকে যায়। আশ্রয়কেন্দ্র এবং অর্থ ও গোলাবারুদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হারানোর পর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে বিদ্রোহী নেতারা চিন্তায় পড়ে যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে এরপর মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডে আংশিক শান্তি ও স্থিতিশিলতা ফিরে আসে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধ এবং নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান পরিচালনার পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য উত্তর-বার্মার গুরুত্ব নতুন করে অনুভূত হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য আমি গোয়েন্দা বিভাগে আমার প্রারম্ভিক সময়ে ফিরে যাব।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে প্রশিক্ষণ শেষ করে আমি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে যোগ দিই। এ সময় ব্যুরোর বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখার প্রধান মি. কাও বলেন, আমাকে সংস্থার বার্মা শাখার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর এই ইউনিটটি গঠন করা হয়। তিনি মনে করেন, এ শাখাটি পাকিস্তান ও চীনকে মোকাবেলা করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চান, আমি শুধু বার্মার ব্যাপারেই দক্ষতা অর্জন করব না, একই সাথে চীনের ইউনান প্রদেশ সম্পর্কেও আমাকে জানতে হবে।

আমি প্রায় পাঁচ বছর বার্মা শাখার দায়িত্ব পালন করি এবং এ সময় আমি এতটাই খ্যাত হই যে, লোকজন আমাকে বার্মা রমন বলে উল্লেখ করত। এ সময় গুপ্ত অভিযানের সাথে সাথে পরিস্থিতির নানা বিশ্লেষণ পাঠানোর দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি চিন্তা করি, আমাকে এ শাখাটি সৃষ্টির পটভূমি জানতে হবে। তাই আমি এর প্রাসঙ্গিক ফাইলপত্র তলব করি। এখানে তখনকার আইবি'র পরিচালক বিএন মল্লিকের হাতে লেখা নোটের একটি প্যারায় আমার দৃষ্টি পড়ে। ভারতে চীনা আক্রমণের পর সৃষ্ট যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছু সময় পর তিনি এটি লিখেছিলেন।

বিএন মল্লিকের নোটে বলা হয়, 'আমি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে আলোচনা করেছি। তারা একমত হয়েছেন যে, যথাসম্ভব দ্রুত আইবি'র বার্মা শাখা খুলতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছাড়াই আজ থেকেই এর কাজ শুরু হলো। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের কাজ পৃথকভাবে শুরু করা হচ্ছে।'

বার্মা শাখা সৃষ্টির এ জরুরি পটভূমি দেখার পর খানিকটা আতঙ্ক বোধ করে

আমি ১৯৬২ সালের বার্মা সংশ্লিষ্ট সব ফাইল এবং রেকর্ড রুম থেকে এর আগের কাগজপত্রও চেয়ে পাঠাই।

এসব ফাইলের বিভিন্ন নোট থেকে দেখা যায় যে মি. মল্লিক এবং অন্যরা উপলব্ধি করেন, ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় চীনা সৈন্যদের একটি অংশ উত্তর দিক থেকে সরাসরি না ঢুকে পূর্বের ইউনান প্রদেশ থেকে অরুনাচলে প্রবেশ করে, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিস্মিত করে। সেনাবহিনীর স্বাভাবিক হিসাব-নিকাশে এটি আসেনি এবং এ জন্য তাদের প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়।

এসব চীনা সৈন্য ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অজ্ঞাতসারে বার্মার কাচিন রাজ্যের পোটাও অঞ্চল পেরিয়ে গোপনে সামনে এগিয়ে যায়। সে সময় কাচিন রাজ্য ও বার্মার নাগা পাহাড় ছিল নোম্যানস ল্যান্ড। তখন মিটকাইনা ও পোটাও শহরের বাইরে কোথাও বার্মার প্রশাসনিক বা সামরিক উপস্থিতি ছিল না। চীনারা এ সুযোগটি গ্রহণ করে।

এরপর আমি আইবি'র ১৯৬২ সালের পূর্ববর্তী ফাইলের সূত্র ধরে বোঝার চেষ্টা করি, কিভাবে উত্তর বার্মার আইবি'র সূত্রগুলো এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতেই পারল না। সে সময় যে ধরনের সড়ক অবকাঠামোই থাক না কেন, কাচিন রাজ্য এবং বার্মার নাগা পাহাড়ে রেঙ্গুনবিরোধী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোরই আধিপত্য ছিল। এখানকার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল পরিবহনের একমাত্র উপায় ছিল গাধার পিঠে নিয়ে যাওয়া। উত্তর বার্মায় ইউনান বংশোদ্ভূত চীনা জনগোষ্ঠীর বিপুলসংখ্যক লোকের বসবাস রয়েছে। তাদের অনেকেরই আয়ের সূত্র ছিল গাধা দিয়ে মাল টানা।

১৯৬২ সালের আগের বছর আইবি'র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আন্তঃসীমান্ত সূত্রগুলো বার বার জানায়, গাধা এবং গাধা দিয়ে মালবাহীর সংখ্যা কাচিন রাজ্য ও নাগা পাহাড়ে বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেছে।

ভারতের নাগাল্যান্ড ও অরুনাচল প্রদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনার জাতীয় নিরাপত্তার ওপর প্রভাব সম্পর্কে আইবি'র কর্মকর্তারা নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘুম ভাঙাতে চান। কিন্তু নীতিনির্ধারকরা এসব তথ্যকে হাস্যকর এবং অনুমাননির্ভর ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন।

শেষ পর্যন্ত অনেক দেরিতে উপলব্ধি হয় যে, এসব গাধাবাহী ছিল আসলে চীনা সৈন্য এবং ইউনান ভিত্তিক চীনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ভারতে আগ্রাসন চালানোর কয়েক মাস আগে ভারত বরাবর বর্মী সীমান্ত এলাকায় তারা অবস্থান নেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উত্তর বার্মায় গাধা ও গাধাবাহী দুটোরই সংখ্যা কমে যায়।

১৯৬৮ সালে ভারত এবং বার্মা সরকার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ত্রিপক্ষীয় সংযোগস্থল ছাড়া দু'দেশের বাকি সীমান্ত চিহ্নিতকরণের জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠনের ব্যাপারে সম্মত হয়। এ কাজে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো দেখার জন্য মি. কাও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের গোপন পরিচয়ে আমাকে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিবের সাথে কথা বলেন।

ইন্দিরা গান্ধী এ সময় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোকে ভাগ করে কাওয়ের নেতৃত্বে 'র'

গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, বার্মা শাখার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমি 'র'তে অবিলম্বে বদলি হব। তবে আইবি'র তখনকার পরিচালক পরলোকগত এমএমএল হোজ্জাকে আমার কাজের ব্যাপারে অবহিত রাখতে হবে।

এরপর কমিশনে 'র' ও আইবি'র যৌথ প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাজ করার ব্যাপারে হোজ্জার সম্মতি নেন কাও। যৌথ কমিশনের সদস্য হওয়ার পর উত্তর বার্মার দুর্গম এলাকায় বারবার ব্যাপক সফর করার সুযোগ সৃষ্টি হয় আমার।

যৌথ কমিশন পর্যায়ক্রমে ভারত ও বার্মায় বৈঠকে মিলিত হয়। সাধারণত সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয় যৌথভাবে বিমান থেকে সীমান্ত এলাকার ছবি গ্রহণের মাধ্যমে। রেঙ্গুনে কমিশনের এক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রস্তাব করে যে, এ ধরনের ছবি নেয়ার কাজ শুরু করা যেতে পারে। আমরা আরো প্রস্তাব করি, বর্মি বিমান বাহিনীর কাছে আকাশ থেকে ভালো ছবি নেয়ার মতো বিমান নেই। কমিশনের জন্য এ ধরনের ছবি নেয়ার দায়িত্ব ভারতীয় বিমান বাহিনীকে দেয়া হলে আমরা খুশি হব। এ জন্য আমরা বর্মি সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থ চাইব না। বর্মি বিমান বাহিনীর সাথে যুক্ত একজন কর্মকর্তাকে এরিয়াল ফটোগ্রাফি মিশনকে গাইড করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলেও আমরা উল্লেখ করি।

বর্মিরা এর জবাবে জানায়, ভারত-বার্মা সীমান্ত এলাকার আকাশ থেকে তোলা ভালো ছবি তাদের কাছে রয়েছে এবং সে ছবি দিয়েই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

বর্মি কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা এসব এরিয়াল ছবির মান ছিল চমৎকার। আমরা বিস্মিত হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করি, এ ধরনের ছবি গ্রহণের জন্য যেখানে বার্মার কোনো বিমান নেই, সেখানে এ ছবি কিভাবে বর্মি বিমান বাহিনী ধারণ করল। তাদের জবাব আমাদের জন্য তড়িতাহত হওয়ার মতো ছিল। তারা উল্লেখ করেন, 'আমাদের চীনা বন্ধুরা এ কাজে সাহায্য করেছেন। ভারত-বার্মা সীমান্তের এরিয়াল ছবি নেয়ার জন্য তারা চীনা বিমান বাহিনীর একটি বিমান পাঠিয়েছিলেন।'

আমাদের অনুমতি ছাড়া স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকার ছবি নেয়ার জন্য চীনা বিমান বাহিনীর বিমানকে অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আমরা যখন কড়া আপত্তি উত্থাপন করি, তখন বার্মিজ প্রতিপক্ষ জবাব দেয়, 'আমরা কখনো আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের অবজ্ঞা করিনি। আমরা আপনাদের পূর্ব অনুমতি নিয়েই এটি করেছি।'

এরপর তারা সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি কাগজ বের করে দেখান, যেটি রেঙ্গুনস্থ ভারতীয় হাইকমিশন থেকে দেয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকার এরিয়াল ছবি নেয়ার ব্যাপারে চীনা সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অনাপত্তির কথা উল্লেখ করা হয় এ কাগজটিতে।

দিল্লিতে ফিরে আসার পর এ বিষয়টি আমি মি. কাওকে অবহিত করি এবং পরামর্শ দিই যে, প্রধানমন্ত্রী যেন এ ব্যাপারে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, যাতে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশি-ষ্ট গুরুতর একটি বিষয়কে কেন এতটা হালকাভাবে গ্রহণ করা হলো এবং এর দায় কার কতটুকু তা নির্ণিত হয়।

কাও জবাবে বলেন, 'রমন, 'র' সবে যাত্রা শুরু করেছে। বিদেশে ভারতীয়

মিশনগুলো যাতে কাজ করতে পারে এ জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের শুভকামনা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে 'র'-এর সম্পর্কে অহেতুক টানাপড়েন সৃষ্টি হবে। আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলব, এ কাজের কারণে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে করণীয় কী হবে সে সিদ্ধান্ত তাদের হাতে ছেড়ে দেব।' পরে অবশ্য এ ব্যাপারে আর কিছুই করা হয়নি।

১৯৬৮ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৬৯ সালে 'র'-এর কাচিন রাজ্যের সোর্সরা খবর দেয় যে, পূর্বের কাচিন রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্বের মিটকাইনা এবং ভামো এলাকাসহ ইউনান সীমান্ত সন্নিহিত অঞ্চলগুলোতে বার্মার সামরিক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইউনানের বিপুলসংখ্যক চীনা সৈন্য বর্মি এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং সেখানকার বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। সোর্সরা আরো জানায়, বর্মি সরকার তাদের এই অনুপ্রবেশের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

বার্মা শাখার প্রধান হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল চীনা সৈন্যরা পশ্চিম দিকে ভারতীয় সীমান্ত অভিমুখে আরো অগ্রসর হয় কি না তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। ১৯৭০ সালে এসব সৈন্যের একটি অংশ ইউনানে ফিরে যায়। বাকিরা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

আমাদের উদ্বেগ ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার কারণে চীনা সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ও অবস্থান অব্যাহত থাকে কি না এবং পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় তৎপরতাকে বাধা দেয়ার কোনো ইচ্ছা তাদের রয়েছে কি না। কিন্তু আরো খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে, এ ধরনের কোনো অভিপ্রায় তাদের ছিল না।

১৯৪৯ সালের পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইউনানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর অবশিষ্ট কমিউনিস্টবিরোধী কোমিনতাং (কেএমটি) সেনারা সীমান্ত পার হয়ে বার্মার কাচিন ও শান রাজ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে ঘাঁটি বানায়। বেইজিং তাদের বের করে দেয়ার ব্যাপারে রেঙ্গুনের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আমাদের ধারণা, বার্মা এলাকায় চীনা সৈন্যদের উল্লিখিত অনুপ্রবেশ সে চাপকে নতুন করে দেয়ার জন্য হতে পারে। এর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

ভারত ও মার্কিন গোয়েন্দাদের উদ্বেগ ছিল, চীনারা বার্মা সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তর বার্মার ওপর চীনা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে কি না। বাস্তবে সেটি ঘটেনি। ১৯৭০-এর দশকে কোমিনতাং সেনারা তাইওয়ানে চলে যাওয়ার পর বার্মা এলাকা থেকে চীনা সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

চীনের ব্যাপারে সাধারণ উদ্বেগ উত্তর বার্মায় 'র'-এর সাথে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র এ বিষয়ে যৌথ কাজের সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যে কেউ দেখে বিস্মিত হতে পারেন যে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ভারতের পাঞ্জাবে আইএসআই'র সাথে মিলে খালিস্তান আন্দোলনকে সাহায্য করছে, আবার ভারতের পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা ঠেকাতে কাজ করছে চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের সাথে। আর সেই সিআইএ উত্তর বার্মায় সম্ভাব্য চীনা নিয়ন্ত্রণ ঠেকাতে কাজ করছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের সাথে। দৃশ্যত: এটাকে মনে হতে পারে এক অদ্ভুত এবং বিচিত্র ঘটনা,

তবে গোয়েন্দা পেশায় এ এক স্বাভাবিক দৃশ্যপট।

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ যখন চরম শিখরে পৌঁছে তখন হেনরি কিসিঞ্জার বার বার নিক্সনকে পরামর্শ দেন, যেন পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত মার্কিন বিমানবাহী রণতরী বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা দেয়। ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর মার্কিন রণতরী সেখানে পৌঁছে। কী ছিল সেই মার্কিন রণতরীর বঙ্গোপসাগরে গমনের মূল হেতু? সাধারণভাবে গৃহীত মত এই যে, যুক্তরাষ্ট্র এ রণতরী পাঠিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বন্ধ করতে ভারতকে সতর্ক করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে যেন ভাঙার চেষ্টা না করে সেজন্য। এ সময় মার্কিন রণতরী পাঠানোর মূল কারণ কী তা উদঘাটন করার ব্যাপারে 'র'-এর ওপর নীতিনির্ধারকদের চাপ বেড়ে যায়।

কিন্তু প্রতিবেশী দেশের বাইরে অন্য দেশ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা এবং সমুদ্র এলাকার তথ্য সংগ্রহের দুর্বল ক্ষমতার কারণে মার্কিন রণতরীর গমনাগমন নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে 'র' একেবারে অসহায় বোধ করে। এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে।

পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আশঙ্কা থাকলেও বাস্তবে ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিম পাকিস্তান ভাঙার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তিনি জানতেন, এ পদক্ষেপ বুমেরাং হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ব্যাপকভাবে ভারতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ করে তুলতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের বিষয়টি ভারতের বাধ্যবাধকতা হিসেবে যেখানে মূল্যায়িত হয়েছে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান ভাঙার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ভিন্ন হতো। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে ভাঙন সৃষ্টির মতো এলাকা হলো বেলুচিস্তান। কিন্তু এর সাথে ভারতের সংলগ্ন কোনো সীমান্ত নেই। বেলুচিস্তানে যেকোনো ভারতীয় সহায়তা দিতে হবে শুধু সমুদ্রপথে। এটি কৌশলগতভাবে বাস্তবসম্মত ছিল না। অধিকন্তু বালুচ জাতীয়তাবাদীদের প্রতি ভারতের যেকোনো সমর্থন সংলগ্ন ইরান ও ইরানের শাসক শাহের জন্য বৈরী সতর্ক সঙ্কেত হতে পারত। এসব বিবেচনায় পশ্চিম পাকিস্তানে সম্ভাব্য ভাঙন সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়ার কথা ইন্দিরা গান্ধী ভাবেননি। পশ্চিম পাকিস্তানে যেকোনো ভারতীয় হস্তক্ষেপ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং দেশটির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য চরম অমর্যাদাকর বিবেচিত হতো। দীর্ঘ মেয়াদে কোনোভাবেই এটি ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে যেত না।

দু'টি প্রশ্ন ভারতে বারবার উত্থাপিত হয়। প্রথমত, ইন্দিরা গান্ধী অন্তত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং উত্তরাঞ্চলের গিলগিট ও বাল্টিস্তান মুক্ত করার আদেশ দিতে পারতেন। কেননা ভারত এটাকে পাকিস্তানের জবরদখলকৃত তার নিজস্ব ভূখণ্ডের অংশ মনে করে। কিন্তু কেন তিনি এ আদেশ দিলেন না সেটাই প্রশ্ন।

দ্বিতীয়ত, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীকে গ্রহণ করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মর্মে লিখিত স্বীকৃতি ছাড়াই কেন তাদেরকে ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তির আওতায় পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে গেলেন মিসেস গান্ধী?

এসব প্রশ্নের নিশ্চিত কোনো উত্তর কারো জানা নেই। আমার ধারণা, সে সময়

ইন্দিরা গান্ধী সামরিক বাহিনী নিয়ে বড় ধরনের নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কায় পাকিস্তানের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চেয়েছিলেন, যাতে দেশটির রাজনৈতিক নেতৃত্ব শক্তিশালী হয় এবং সামরিক বাহিনীর ওপর তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন।

এটি যদি সত্যিই ইন্দিরা গান্ধীর আশাবাদ হয়ে থাকে তবে তা বিশ্বাস করার মতো। যদিও সিমলা চুক্তির পাঁচ বছরের মধ্যে জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে। বিচারের নামে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। অপাত্রে ক্ষমা প্রদর্শনের মতোই পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি ভারতের কোনো কাজে লাগেনি।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 'র' এবং কাও উভয়েই নীতিনির্ধারকদের কাছে ছিলেন প্রশংসিত। ১৯৭১ সালে মি. কাও ইন্দিরা গান্ধীর সবচেয়ে আস্থাভাজন উপদেষ্টায় পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই আস্থা ধরে রাখেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত অথবা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ইন্দিরা গান্ধী মি. কাওয়ের সাথে পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করেননি।

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সাফল্যের জন্য সামরিক বাহিনীর তেমন প্রশংসা হয়নি। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রশংসা অর্জন করে 'র'। তবে পশ্চিম ফ্রন্টে 'র'-এর সাফল্য নিয়ে কিছু সমালোচনাও হয়। এই ফ্রন্টে সামরিক বাহিনী ভালো কিছু করতে পারেনি। এর পরও সবাই একমত যে, ১৯৭১ সালে 'র' তার চমৎকার সময় পার করেছে। 'র'-এর শীর্ষ কর্মকর্তা কাও এবং দ্বিতীয় শীর্ষ কর্মকর্তা কে শঙ্করন নায়ারের নেতৃত্বে 'র'-এর বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন পদমর্যাদার ডজন ডজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে চমৎকার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৭১ সালে কাওয়ের বয়স ছিল ৫৩ আর নায়ারের ছিল ৫০। নায়ার ছিলেন অবিভক্ত মাদ্রাজ ক্যাডারের পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি ১৯৭৭ সালে কাওয়ের অবসর গ্রহণের পর 'র'-এর প্রধান হন। কিন্তু এর কয়েক মাস পর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সাথে মতান্তরের কারণে তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তৈরি হওয়া ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মধ্যে বিস্ময়কর প্রতিভার অপারেশনাল কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হতেন তিনি। নায়ার এবং কাও তার সময় 'র'তে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে 'র'-এর সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা কাও এবং তার কর্মকর্তারা পরিচিত হয়ে ওঠেন 'কাওবয়' হিসেবে। কে এ উপাধি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। কেউ বলেন স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী নিজেই এ নাম দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, যুক্তরাজ্য ও ইতালিতে ভারতের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী সাবেক কর্মকর্তা আপ্পা বি পান্ত এ নাম দিয়েছিলেন। কারো কারো ধারণা, কাওবয় নামটি সাবেক ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউলের দেয়া।

কাওবয় নামটি যেই দিয়ে থাকুন না কেন, ১৯৭১ সালের অপারেশনে অংশ নেয়া কর্মকর্তারা যোগ্য ছিলেন নিঃসন্দেহে। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা

জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সময় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত মেয়াদে সিআইএ'র প্রধান ছিলেন। তিনি কাওয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। সিআইএ'র নয়াদিল্লির স্টেশন চিফ ও অন্যান্য কর্মকর্তার মাধ্যমে তিনি কাও সম্পর্কে জানেন এবং তারা অবহিত হন যে, তার কর্মকর্তাদের ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যরা কাওবয় হিসেবে ডাকেন।

বলা হয়, ওয়াশিংটন ডিসিতে সিআইএ'র সদর দফতর পরিদর্শনের সময় মি. কাওকে প্রেসিডেন্ট বুশ কাওবয়ের একটি ব্রোঞ্জের প্রতিকৃতি উপহার দেন। কাও সব সময় এটাকে তার অফিসের টেবিলে রাখতেন।

কলকাতার ভাস্কর সাদিক হুবহু এর মতো একটি বড় আকারের মূর্তি তৈরি করে 'র'কে উপহার দেন। কেউ 'র'-এর সদর দফতর পরিদর্শনে গেলে সে ভবনের প্রবেশ পথে তিনি কাওবয়ের এই মূর্তিটি দেখতে পাবেন। কাও নিজেই ছিলেন একজন ভালো ভাস্কর ও সাদিকের ছাত্র। সাদিক কাওবয়ের মুখমণ্ডলটি বানিয়েছিলেন ঠিক কাওয়ের চেহারার মতো করে।

এটি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কাওয়ের চমৎকার অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। তবে ১৯৭১ সালের কাওবয়দের কথা রয়ে গেছে জাতির কাছে অজানা এবং তাদের গুণগানও কেউ গায় না।

পরিচ্ছেদ : তিন

কাওয়ের পরিচয়

১৯৯৬ সালটি ছিল ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বিজয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ২৫তম বার্ষিকী। সে উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত হয় বহু স্মরণসভা। আর তাতে ১৯৭১ সালের কুশীলবরা এবং সামরিক ও বেসামরিক লোকজন অংশ নেন। তারা এই যুদ্ধে আত্মত্যাগকারিদের ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলেন এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এ ধরনের বৈঠকের একটিতে নয়াদিল্লিতে বসবাসকারী এক বাংলাদেশী পেছনের সারির দর্শকদের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে থাকা একজন দীর্ঘদেহী সুদর্শন লোককে আবিষ্কার করেন। তিনি সুদর্শন ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনার তো মঞ্চে উপবিষ্টদের মাঝখানে বসার কথা ছিল। আপনার কারণেই তো ১৯৭১-এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল।' সেই সুদর্শন ও লাজুক লোকটি জবাবে বলেন, 'আমি কিছুই করিনি। তারাই সব প্রশংসার দাবিদার।' পেছনের সারিতে এভাবে গুটিসুটি মেরে বসে থাকার পরও তাকে খুঁজে বের করে ফেলায় বিব্রত বোধ করেন তিনি। ফলে সন্তর্পণে হল থেকে কেটে পড়েন তিনি।

এতক্ষণ যার কথা বললাম তিনি হলেন রামেশ্বর নাথ কাও— যিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে রামজি এবং জুনিয়র কলিগদের কাছে 'স্যার' বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন র-এর প্রতিষ্ঠাতা। কাওকে ইন্দিরা গান্ধী এবং তার পিতা জওহরলাল নেহরু ভালোভাবে চিনতেন এবং তার পেশাগত সততার ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলে তাকে এ সম্মানজনক পদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এর পেছনে আরো কারণ ছিল। তিনি আইবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখার প্রধান ছিলেন এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব সিকিউরিটির (ডিজিএস) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আর এই ডিজিএস সৃষ্টি করা হয়েছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের সহায়তায় সংঘটিত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর। ওই যুদ্ধে ভারতীয় গোয়েন্দাদের মধ্যে দক্ষতার যে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল সেটা পূরণ করার জন্যই র সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি কাওকে 'র' এবং ডিজিএস উভয়েরই প্রধান করেছিলেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি জিসকার্ড দেঁস্তার অধীনে সার্ভিস ফর এক্সটারনাল

ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তথা এসডিইসিই'র প্রধান কাউন্ট আলেকজান্ডার ডি মারেনচেসকে ১৯৮২ সালে একজন আলোচক ১৯৭০-এর দশকের নামকরা পাঁচজন সেরা গোয়েন্দা প্রধানের নাম বলতে বললে তিনি সেই পাঁচজনের একজন হিসেবে কাওয়ের নাম বলেন। কাও যেভাবে 'র'কে একটি পেশাদার গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তার প্রশংসা করেন। তার মন্তব্য ছিল, 'তার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যের কী অপূর্ব সংমিশ্রণই না রয়েছে! কতই না বন্ধুভাবাপন্ন লোকটি! অথচ তারপরও তিনি নিজের সম্পর্কে, তার সাফল্য সম্পর্কে এবং তার বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে কিছু বলতে লজ্জাবোধ করেন।'

সংক্ষেপে কাও সম্পর্কে এটুকুই বলা চলে। যখন কোনো সফলতা আসত তখন তার কৃতিত্ব তিনি তার সহকর্মী ও অধীনদের দিতেন, আর যখন কোনো ব্যর্থতার প্রশ্ন আসত তখন তার বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নিতেন। শুধু ভারত নয়, আরো বহু দেশের উচ্চপর্যায়ের লোকেরা তাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু কাও তার সারা জীবনে কখনো তাদের পরিত্যাগ করেননি কিংবা তাদের নাম ব্যবহার করেননি। কাও তাদের সাথে বন্ধুত্বের গোপনীয়তা কফিনে করে চিতায় নিয়ে গেছেন, তবুও ফাঁস করেননি কারো কাছে। চাকরিজীবন থেকে অবসর নেয়ার ২৫ বছর পর ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে কাও পরলোক গমন করেন। তিনি যেভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জীবনযাপন করতেন ঠিক সেভাবেই নীরবে-নিভৃতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য ভারতের ইতিহাসে যে ব্যক্তির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার কথা, সে মহান ব্যক্তির দেহাবশেষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার আত্মীয়স্বজন, সাবেক কেবিনেট সচিব ও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত নরেশচন্দ্র এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের সাবেক ও বর্তমান সহকর্মীর মতো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব যোগ দেন। এ ছাড়া গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের বাইরে, জুনিয়রই হোক আর সিনিয়রই হোক, কদাচিৎ কোনো সরকারি কর্মকর্তা তার শেষকৃত্যে যোগ দেন। তবে পরবর্তীকালে তার প্রতি এই অবহেলাটুকু মুছে ফেলার জন্য একটি বড় ধরনের শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে বেশ লোকসমাগম হয়েছিল। সেই সভায় বক্তারা জাতির প্রতি তার অবদানের প্রশংসা করতে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

অনেক মানুষের মতো কাওয়েরও ভুলত্রুটি ছিল; ছিল মহত্ত্ব। একটি সংস্থার বহু কর্ণধারের মতো তারও ব্যর্থতা ছিল, ছিল সাফল্য। মানুষ, বিভিন্ন বিষয় এবং ঘটনাবলির ব্যাপারে তার মূল্যায়ন অধিকাংশ সময়ই সঠিক হতো আর ভুল হতো মাঝে মধ্যে। মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা ও আত্মনিষ্ঠতার এক জটিল সংমিশ্রণ ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন চমৎকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক। এত কিছুর পরও তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণে সঠিক পুরুষ ও নারীকে বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সব সময় একইভাবে সফল হননি। তার মধ্যকার বিনম্র ভাব ও ঔদার্যের কারণে তিনি তার চার পাশের লোকজনের ভুল ধরার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ব্যর্থ হতেন। তিনি এমন

কিছু দোষত্রুটিযুক্ত নারী-পুরুষকে বিশ্বাস করতেন যারা আসলে বিশ্বাস করার মতো ছিলেন না।

এর পরও তিনি যে তার সময়ে গোয়েন্দা জগতে অনায়াসে ও বীরদর্পে এক উজ্জ্বল ভাবমর্যাদা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তা কোনো ওয়াকিবহাল ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না। ভারতের বিগত বছরগুলোতে গোয়েন্দা জগতে কাও ছিলেন প্রথম সারির। তবে বাকি যারা ছিলেন তাদের মধ্যে নামোল্লেখ করার মতো আর কেউই নেই। তিনি একজন কিংবদন্তিতুল্য গোয়েন্দা। ১৯৭১ সালের বিজয়, আফগানিস্তানের গ্রেট গেমে ভারতের ভূমিকা, আফ্রিকার নতুনভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর গোয়েন্দা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের সহায়তা, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামে ও নামিবি-য়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের গোপন সহায়তা, ১৯৭০-এর দশকে সিকিম ও নাগাল্যান্ড সমস্যার এবং ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে মিজোরাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাও পর্দার অন্তরালে থেকে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ভারতের গোয়েন্দা জগতে এত বিশাল অবদান রাখা ব্যক্তিটির বিপুল কর্মযজ্ঞের ব্যাপারে ভালো গবেষণাধর্মী ও সুসংবদ্ধ কোনো দলিলপত্র নেই। যে সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধানরা তাদের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে লোকজনের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করছেন, সে সময় ভারতের গোয়েন্দা প্রধানরা পর্দার অন্তরালে রয়ে গেছেন। গোয়েন্দা জগতের আরেক দিকপাল বি এন মল্লিক আইবি'র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়কার কিছু দিকের ওপর আলোকপাত করে 'মাই ইয়ার্স উইথ নেহরু' নামে বই লিখে গেছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো গোয়েন্দা প্রধান তার স্মৃতিকথা লিখে রাখেননি। ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে তাদের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করার চিন্তাই যেন অশোভনীয় বলে মনে হয়।

চাকরিতে থাকা গোয়েন্দা কমকর্তারা তাদের সব চিন্তাভাবনা ও কাজের বিষয় সব সময় লিখে রাখেন না। 'রেস্ট্রিকটিভ সিকিউরিটি' বলে যে কথা রয়েছে এটা তারই অংশ। আপনি যত বেশি লিখবেন, তত বেশি তা ফাঁস হয়ে গিয়ে আপনাকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাপারটিকে এভাবেই দেখা হয়। তাই তারা তাদের সব স্মৃতি ও অন্তর্দৃষ্টি একেবারে কফিনে করে চিতায় বা গোরে নিয়ে যান। এ মনোভাব ইতিহাসকে খুব কমই সমৃদ্ধ হতে দেবে।

১৯৫০-এর দশকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যেও এ ধরনের মনোভাব কাজ করত। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা একটা ইতিহাস শাখা চালু করে, যাতে তারা এই সংস্থা ও সংস্থার কর্মকর্তাদের স্মৃতিকথা, অন্তর্দৃষ্টি এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সাধারণ মানুষ কিংবা ঐতিহাসিকদের জন্য না হলেও অন্তত তাদের পরবর্তী প্রজন্মের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জন্য রেকর্ড করে রাখতে পারেন। ১৯৭০-এর দশকে সাবেক গোয়েন্দা প্রধানরাসহ বহু সিআইএ কর্মকর্তা এ মনোভাব ত্যাগ করে তাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করেন। একই মনোভাব

ব্রিটিশ গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও মিসেস স্টেলা রেমিংটনের মতো কয়েকজন সাম্প্রতিক গোয়েন্দা প্রধান এ ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। স্টেলা রেমিংটন ১৯৯০-এর দশকে সিকিউরিটি সার্ভিস এমআই-ফাইভ-এর প্রধান ছিলেন।

কাও ইতিহাস শাখার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাকে বেশ পছন্দ করতেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ব্যাপারে 'র' এবং ডিজিএস-এর যেসব কর্মকর্তা ভূমিকা রেখেছিলেন তারা যদি মারা যান তাহলে জাতি এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের বর্ণনা থেকে বঞ্চিত হবে। ১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সিনিয়র অ্যাডভাইজার থাকাকালে তিনি এ ধরনের একটি ইতিহাস শাখা খোলার জন্য 'র'-কে রাজি করিয়েছিলেন, যাতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে যেসব কর্মকর্তা ভূমিকা পালন করেছিলেন সেসব কর্মকর্তার মাথা থেকে যুদ্ধের স্মৃতিগুলো মুছে যাওয়ার আগেই তাদের বক্তব্যের আলোকে সে সময় 'র'-এর ভূমিকা সংক্রান্ত সঠিক দলিলপত্র প্রস্তুত করা যায়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে কাও দায়িত্বভার ছেড়ে দেয়ার পর এ শাখাটি তার কাজকর্ম শেষ করার আগেই তুলে দেয়া হয়। ব্যাপারটি বড়ই পরিতাপের! গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কতই না স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারেন! ১৯৭১ সালের যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এমন বড়জোর ডজন খানেক 'র' এবং ডিজিএস কর্মকর্তা এখনো বেঁচে আছেন। তাদের স্মৃতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার যে ইতিহাস রক্ষিত আছে তা যদি আজ লিখে রাখা না হয় তাহলে তাদের মৃত্যুর পর তা হারিয়ে যাবে।

১৯৯৬ সালের পর ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগে কাওয়ের বেশ কিছু ভক্ত গোয়েন্দা জগৎ সম্পর্কে তার সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বহস্ত বর্ণনা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার অনুরোধ জানান। কাও মৃত্যুর কয়েক মাস আগে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে তার স্মৃতিকথাগুলো একটি টেপ-রেকর্ডে ধারণ করতেন। পরে প্রতিলিপি করে নিজেই আবার সেগুলোকে সংশোধন করেছিলেন। তার সেই টেপ ও প্রতিলিপিগুলো নয়াদিল্লির একটি প্রসিদ্ধ বেসরকারি সংস্থার হেফাজতে তিনি রেখে গিয়েছিলেন। তিনি ওই সংস্থাটির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে সেটি তার মৃত্যুর কয়েক বছর পর প্রকাশ করা হবে। আশা করা যায়, এগুলো সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করা আছে। কেননা, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের মূল্যবান অংশ হতে পারে এগুলো।

আমাদের ইতিহাসজ্ঞান নেই বলে আমরা এগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করতে পারি। ১৯৮৪ সালের জুনে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সৈন্যদের অভিযান চালানোর নির্দেশ দেয়ার আগে ইন্দিরা গান্ধী মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে শিখ নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের চূড়ান্ত চেষ্টা চালান। এসব নেতার মধ্যে কিছু ছিলেন চরমপন্থী আবার কিছু ছিলেন উদারপন্থী। তাদের এই আলোচনা ভারতের ভেতরে ও বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতে এই আলোচনায় ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে রাজিব গান্ধী এবং তার দুই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অংশ নিয়েছিলেন। আর বিদেশের আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

কাও, যিনি আমাকেও তার সাথে রেখেছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য পাঠানোর আগে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কেন তা ব্যর্থ হলো তার একটা রেকর্ড ভারতবাসীর কাছে রাখার জন্য তিনি (ইন্দিরা) খুবই আগ্রহী ছিলেন। এই দায়িত্বটা আমাকে দেয়া হয়েছিল। আমি গোপনে এসব আলোচনার বিষয় রেকর্ড করে রেখেছিলাম এবং সেগুলোর প্রতিলিপি তৈরির কাজে বহু ঘণ্টা ব্যয় করেছিলাম। ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট অবসর গ্রহণের সময় আমি এসব রেকর্ডপত্র সংস্থার মোহাফেজখানায় হস্তান্তর করেছিলাম নিরাপদ হেফাজতের জন্য। আজ ১৩ বছর পর ওই সব ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন দলিলপত্র কোথায় আছে তা কেউই জানে না।

পরিচ্ছেদ : চার

উত্তর-পূর্ব ভারত

১৯৫৬ সাল থেকে পরলোকগত ফিজোর নেতৃত্বে নাগা বিদ্রোহীরা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র সংস্পর্শে ছিল। আইএসআই তাদের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন এবং তাদেরকে অর্থ, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত।

আইএসআই পূর্ব-পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদেরকে আস্তানা গড়ার ও প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপনের অনুমতি দেয়। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে নাগা বিদ্রোহীদের বহু দল আইএসআই'র কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম যায় এবং প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে। তারা বার্মার নাগা পাহাড়ের সোমরা ট্র্যাক্টে প্রবেশ করে বার্মার আপার চিন্দুইন জেলা ও চিন হিলস স্পেশাল ডিভিশন হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করত। তারা আবার একই পথ ধরে দেশে ফিরে আসত। বার্মার নাগা পাহাড়ে বর্মি সেনাবাহিনীর কার্যকর উপস্থিতি ছিল না। ফলে নাগা বিদ্রোহীরা যাতে সোমরা ট্র্যাক্ট ব্যবহার করতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়ার মতো অবস্থায় তারা ছিল না। তবে আপার চিন্দুইন জেলা ও চিন হিলস স্পেশাল ডিভিশনের ওপর তাদের ভালো নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে তারা নাগাদেরকে সেখান দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের দিকে যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে আসা বন্ধ করতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। বরং ওই এলাকায় কর্মরত বর্মি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাগা বিদ্রোহীদের মধ্যে এক ধরনের সখ্য গড়ে উঠে। নগদ অর্থ বা অন্য কোনো ধরনের উপঢৌকন পাওয়ার কারণে তারা ওই পথে নাগা বিদ্রোহীদের গমনাগমনের ব্যাপারটি দেখেও না দেখার ভান করত। ইন্দিরা গান্ধী ও তার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরলোকগত এম সি চাগলা (১৯৬৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে বারবার রেঙ্গুনে বর্মি কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তি জানান। কিন্তু বর্মি কর্তৃপক্ষ তাদের ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে এ ধরনের কোনো যাতায়াতের বিষয় অস্বীকার করে। অবশ্য এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে তারা সেটি বন্ধের ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীকালে এ সংক্রান্ত কোনো ফলোআপ অ্যাকশন দেখা যায়নি। বর্মি কর্তৃপক্ষ এ কাজে সমস্যাবোধ করলে ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব-পাকিস্তানে নাগা বিদ্রোহীদের গমনাগমন বন্ধে বর্মি ভূখণ্ডে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্মি কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হয়নি। বর্মি কর্তৃপক্ষ এই ভেবে চিন্তিত

ছিল যে, আজ যদি তারা নাগা বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়, তাহলে চীনা কর্তৃপক্ষও তার ইউনান প্রদেশ থেকে বার্মার শান রাজ্যে যাতায়াতকারী কেএমটি'র বিদ্রোহীদের দমনের জন্য চীনা সৈন্যদের বার্মায় অভিযান চালানোর ব্যাপারে চাপ দেবে। কেএমটি বিদ্রোহীরা চীনা সেনাবাহিনীর সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর জন্য হুমকি হয়ে ছিল; যদিও তাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের নাগা বিদ্রোহীরা বার্মার নাগাদের সাথে কোনো ধরনের ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক স্থাপন এড়িয়ে চলে। তারা ভেবেছিল, এটি করতে গেলে বর্মি সেনাবাহিনী তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ওই সময় ভারতের নাগা বিদ্রোহীরা বার্মার নাগা সম্প্রদায়ের একটা শ্রেণীর সাথে হাত মেলায় এবং ভারত ও বার্মা উভয় সীমান্তের দু'পাশের বর্মি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে তথাকথিত বৃহত্তর নাগাল্যান্ড গঠনের ডাক দেয়। এর ফলে রেঙ্গুনে চরম উদ্বেগ দেখা দেয় এবং সেখানকার বার্মিজ সেনা সদর দফতর ভারতীয় নাগা বিদ্রোহীরা যাতে পূর্ব-পাকিস্তানে গমনাগমনে বর্মি ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। বর্মি ভূখণ্ড ব্যবহারের চেষ্টা চালানো বহু নাগা বিদ্রোহীকে হত্যার মাধ্যমে তারা সেটি কার্যকরভাবে রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আইএসআই কর্তৃক নাগা বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ব্যাহত হয়। তারপরও নাগা বিদ্রোহীরা কোনোভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের আস্তানাগুলো ও প্রশাসনিক সদর দফতর চালু রাখতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহীরা ছোট ছোট গ্রুপে আইএসআই'র কাছ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য ভারতের মনিপুর ও আসাম রাজ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যাওয়ার ব্যবস্থা করত।

নাগা বিদ্রোহীদের নেতারা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে চীনা সাহায্য চেয়েছিলেন। তারা এর আগেই ঢাকায় চীনা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। চীনারা তাদেরকে ইউনানে বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দিতে সম্মত হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর থেকে নাগা বিদ্রোহীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য বার্মার নাগা হিলস ও কাচিন রাজ্য দিয়ে ইউনান যাওয়া শুরু করে। কাচিন রাজ্য দিয়ে তাদের যাতায়াত এ কারণে সম্ভব হয়েছিল যে, ওই এলাকায় পুতাও ও মিটকাইনার মতো বড় বড় শহর ছাড়া আর কোথাও বর্মি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ডের (এনএসসিএন) বর্তমানে ব্যাংককভিত্তিক নেতা আইজ্যাক সু এবং থুইঙ্গালেং মুইভা ও নাগা ফেডারেল গভর্নমেন্ট (এএফজি) নামে পরিচিত সংস্থার প্রধান স্বঘোষিত জেনারেল মৌ আঙ্গামি প্রথম দলটির সাথে গিয়েছিলেন। তারপর অন্যান্য দল একই পথ ধরে ইউনান যায়।

চীনারা প্রশিক্ষণ দিতে বিলম্ব করে। তারা একটি শর্ত আরওপ করে বলে যে, প্রশিক্ষণের সিলেবাসে মার্কসবাদ ও মাওবাদী চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই দলের সাথে সানডে প্রার্থনা এবং বাইবেল ক্লাস পরিচালনার জন্য নাগা ধর্মযাজকরা গিয়েছিলেন। চীনারা এর বিরোধিতা করে এবং ধর্মযাজকদের দেশে ফিরে যেতে বলে। চীনারা তাদের কাছ থেকে বাইবেলগুলো কেড়ে নেয়। নাগা বিদ্রোহীরা তাদের

এসব শর্ত মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করে। এ নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বিরোধ চলে। আইজ্যাক সু ও মুইভা চীনাদের শর্ত মানতে প্রস্তুত থাকলেও অন্যান্য নেতা তাতে রাজি ছিলেন না। নেতাদের কয়েক জনকে উর্ধ্বতন চীনা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার জন্য বেইজিং নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চীনারাই তাদের শর্ত ত্যাগের মাধ্যমে নতি স্বীকার করে। ফলে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়।

নাগা বিদ্রোহী দলগুলো প্রশিক্ষণের জন্য একের পর এক ইউনান যাচ্ছে, এ মর্মে রিপোর্ট প্রদানের ব্যাপারে আইবি ও 'র' বলতে গেলে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এসব রিপোর্টের অনেকগুলো উত্তর বার্মার উপজাতীয় সূত্রগুলোর কাছ থেকে আসছিল। তাদের পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিংয়ের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মতো কিছু ছিল না। 'র'-এর কিছু রিপোর্ট আসত নাগা বিদ্রোহী ও বর্মি সেনাবাহিনীর মধ্যকার কথোপকথন আড়িপেতে শোনার মাধ্যমে। কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মি (কেআইএ) এবং কেএমটি'র মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা কাচিন রাজ্যে কিছু মার্কিন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি বসবাস করতেন। তারা বার্তাবাহকের মাধ্যমে আইবি ও 'র'-এর কাছে ভয়ঙ্কর ধরনের বিভিন্ন রিপোর্ট প্রেরণ করে আরও বেশি সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতেন। অবস্থাটা এতই সংশয়পূর্ণ ও আতঙ্কজনক ছিল যে, গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারত সরকারের জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি (জেআইসি) আইবি ও 'র'-কে একটি যৌথ টিম গঠনের পরামর্শ দেয়। যাতে এই টিম সংস্থা দু'টির প্রাপ্ত রিপোর্টগুলো যাচাই-বাছাই করে তার আলোকে একটি অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

১৯৬৯ সালে আইবি ও 'র' তাদের সব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে যৌথভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ১২টি দলে মোট আনুমানিক ২ হাজার ১০০ সদস্য ইউনান প্রদেশে যেতে পেরেছে। এই যৌথ মূল্যায়ন জেআইসি'র কাছে পাঠানো হলে ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ (পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৎকালীন লে. জেনারেল) এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের তৎকালীন ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার এম এন বাটরা জেআইসিতে উপস্থিত হয়ে ওই দু'টি বেসামরিক সংস্থার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন। তারা অভিমত দেন, তিন কি চারটি দলে আনুমানিক ৪৫০ সদস্য ইউনান গেছে। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধিরা আইবি ও 'র'-এর মূল্যায়নকে সমর্থন করেছিলেন।

মানেকশ বলেন, এত বিপুলসংখ্যক লোক ইউনান গেছে বলে আইবি ও 'র' যে কথা বলছে তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে স্থানীয় গ্রামবাসী ও প্রশাসনের লোকেরা তা জানতেন। এত বিপুলসংখ্যক লোকের ইউনান গমন সম্পর্কে তারা কিছুই বলতে পারেননি। মানেকশ'র এই অভিমত সত্ত্বেও জেআইসি আইবি ও 'র'-এর মূল্যায়নকে সমর্থন করে। মানেকশ'র পরামর্শে সেনাবাহিনী এই মূল্যায়ন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কেন তারা এটি মানতে রাজি নন সে বিষয়ে একটি মতামতও তাদের মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্তি আকারে রাখার জন্য মানেকশ পরামর্শ দেন।

কয়েক মাস পর এসব বিদ্রোহী ইউনানে তাদের প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে আসে।

বর্মি ও ভারতীয় সেনাবাহিনী সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চীন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা বিদ্রোহীদের অনেককে হত্যা ও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃতদের একজন হচ্ছেন মৌ আঙ্গামি। গ্রেফতারকৃত বিদ্রোহীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আইবি, 'র' ও ডাইরেক্টরেট অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের (ডিএমআই) প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ টিম গঠন করা হয়। এই টিমে আমিও ছিলাম। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পায় যে, মানেকশ'র হিসাব সঠিক ছিল এবং আইবি ও 'র'-এর মূল্যায়ন ছিল ভুল।

মানেকশ মনে করতেন, বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজেদের ভাবমর্যাদা রক্ষার জন্য সব সময়ই কোনো ধরনের হুমকিকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করে; যাতে কোনো অঘটন ঘটে গেলে তারা বলতে পারে যে, আমরা বিষয়টি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করেছিলাম। এ ধরনের অ্যাসেসমেন্টের ফলে নিরাপত্তা বাহিনী অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে গিয়ে পরিস্থিতিকে অনেক সময় জটিল করে তোলে। তবে আইবি ও 'র'-এর সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, তাদের ওভার অ্যাসেসমেন্ট ইচ্ছাকৃত ছিল না। এর পেছনে ছিল আন্তঃসীমান্ত উপজাতীয় সূত্রগুলো থেকে পাওয়া রিপোর্টগুলোর অগভীর মূল্যায়ন। সূত্রগুলোর অনেকেই বিশেষত কাচিন রাজ্যে গমনকারী বিদ্রোহী দলগুলোর সংখ্যা, দিনক্ষণ ও রুটের ব্যাপারে একাধিক এবং ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছিল। এর ফলে সংস্থা দু'টি ভুলক্রমে হয়তো একই দলকে একাধিকবার গুণে থাকবে। আর এভাবেই ওভার অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারটি ঘটেছে।

১৯৬৯-৭০ সালে ভারতীয় ও বর্মি সেনাবাহিনীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় ইউনানে নাগা বিদ্রোহীদের গমনাগমন বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় 'র' এবং ডিজিএস'র সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের আশ্রয়স্থল ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে ইউনানে নাগা বিদ্রোহীদের ব্রেইন ওয়াশের চীনা প্রচেষ্টার কারণে তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি জন্মে যে, ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড সফল হবে না। এই উপলব্ধির ফলে তারা ১৯৭৫ সালে সিলং চুক্তির আওতায় বিদ্রোহের অবসান মেনে নেয়। তবে যারা চীনের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে আছে তারা এখনো এনএসসিএন-এর পতাকাতলে থেকে বিদ্রোহী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা অবশ্য বর্তমানে অস্ত্র বিরতি পালন করে ভারত সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব-পাকিস্তানে আইএসআই'র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। আইএসআই নাগা বিদ্রোহীদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে এমএনএফ'কেও আশ্রয় নেয়ার সুযোগ এবং প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। এমএনএফ-এর দলগুলো হয় সরাসরি ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে কিংবা বার্মার চিন হিলস স্পেশাল ডিভিশন হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করত। নাগাদের গমনাগমন বন্ধে বর্মি সেনাদের অভিযান জোরদার হওয়া সত্ত্বেও মিজো বিদ্রোহীদের চলাচলে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। তারা সরাসরি ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করত।

নাগা বিদ্রোহীদের মতো মিজো বিদ্রোহীরাও ঢাকায় অবস্থানরত চীনা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। লালদেঙ্গা স্বয়ং চীনা প্রশিক্ষণ ও

সহায়তা পাওয়ার আশায় বেইজিং সফর করেন। উত্তর বার্মা দিয়ে মিজোরা ইউনানে প্রবেশ করতে পারলে চীনারা তাদের সহায়তা করতে রাজি ছিল। কিন্তু মিজোরা ইউনানে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। তাদেরকে চিন হিলস স্পেশাল ডিভিশন ও আপার চিন্দুইন জেলার মধ্য দিয়ে যেতে হতো এবং ওইসব স্থানে বার্মার নাগা হিলস ও কাচিন রাজ্যের চেয়েও বর্মি সৈন্যদের উপস্থিতি বেশি ছিল। ফলে এমএনএফ'কে পার্বত্য চট্টগ্রামে আইএসআই কর্তৃক তার ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় 'র' ও ডিডিএস-এর গোপন ইউনিটগুলোর অভিযানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এমএনএফ-এর ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্রোহীকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি। এই হামলার হাত থেকে আত্মরক্ষাকারীরা বার্মা বা মিজোরামে চলে গিয়েছিল কিংবা আত্মগোপন করেছিল। লালদেঙ্গা নিজেও রেঙ্গুন হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় এমএনএফ তার চিরাচরিত আশ্রয়স্থল থেকে বঞ্চিত হয়। লালদেঙ্গা পাকিস্তানে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিলেন। ফলে তিনি আইএসআই কর্মকর্তাদের প্রতি আর মৈত্রী বজায় রাখতে পারেননি বরং তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি জয়ী হতে পারবেন না। তাকে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেয়া হলে লালদেঙ্গা ভারত সরকারের সাথে আলোচনায় বসার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, আইএসআই যদি জানতে পারে যে তিনি ভারত সরকারের সাথে আলোচনায় আগ্রহী তাহলে তারা তাকে পাকিস্তান থেকে বেরোনোর সুযোগ দেবে না। লালদেঙ্গাকে আফগানিস্তান হয়ে জেনেভায় চলে যেতে পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি দাবি করেন, পাকিস্তানে তার এক বড় অঙ্কের ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে এবং তিনি যদি এই অর্থ তুলে নেন তাহলে আইএসআই বুঝে ফেলবে তিনি পাকিস্তান ত্যাগের পরিকল্পনা করছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানান, ব্যাংক ব্যালেন্সের এ অর্থ ছাড়াই তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করবেন। তবে তিনি সমপরিমাণ অর্থ পরে তাকে দিয়ে দিতে হবে এই মর্মে আশ্বাস চান। সে আশ্বাস তাকে দেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে তিনি জেনেভায় পৌঁছতে সক্ষম হন। তার সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরুর জন্য 'র' ও আইবি'র একটি যৌথ টিম জেনেভায় তার সাথে কথাবার্তা শুরু করে। এসব কথা ধীরগতিতে হলেও সন্তোষজনকভাবে চলতে থাকে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি এবং সে অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী তার অন্যান্য বিষয়ে নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও লালদেঙ্গার সাথে আলোচনা যাতে সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়ে 'র' ও আইবিকে ভালোভাবেই গাইড করছিলেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে কার্যত ওই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। লালদেঙ্গা তার ও তার সংগঠন এমএনএফ-এর প্রতি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরন সিংয়ের আচরণে বিরক্ত হয়েছিলেন। জানা যায়, চরন সিং

লালদেঙ্গার সাথে আলোচনায় বসার যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। চরন সিংয়ের ভাষায়, তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। ফলে ওই আলোচনা আর চলতে পারেনি। লালদেঙ্গা যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নেন। ভারত সরকার তার ভারতীয় পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। এ অবস্থায় তিনি নিজেকে ট্রাভেল ডকুমেন্টবিহীন হিসেবে দেখেন। তিনি যাতে মিজোদের আন্দোলনের ব্যাপারে সমর্থন আদায়ের জন্য অন্যান্য দেশ সফর করতে পারেন, সেজন্য যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কিছু ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে লালদেঙ্গার জন্য ব্রিটিশ ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করাতে রাজি করান। তারা যুক্তরাজ্যে তার ও তার পরিবারের বসবাস এবং বিভিন্ন দেশ সফরের ব্যয়ভার বহনের জন্য কিছু অর্থও তাকে প্রদান করেন।

১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ফের ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তিনি প্রথম দিকে মিজো সমস্যা সমাধানের প্রতি নজর দিতে পরেননি। তিনি তখন বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পাঞ্জাবের সহিংসতাও তার কিছু সময় কেড়ে নেয়। ১৯৮৩ সালে তিনি মিজোরামের পরিস্থিতির ব্যাপারে অবহিত হন। তিনি কাও'কে অনুরোধ জানান, যাতে তিনি যুক্তরাজ্যে লালদেঙ্গার সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে দিল্লিতে ফিরে এসে (পরলোকগত) জি পার্থ সারথির সাথে আলোচনায় বসতে রাজি করান। ইন্দিরা গান্ধী পার্থ সারথিকে লালদেঙ্গার সাথে আলোচনার জন্য বিশেষ প্রতিনিধির দায়িত্ব দেন। এদিকে কাও অবসর গ্রহণের পর এ সময় ইন্দিরা গান্ধীর সিনিয়র অ্যাডভাইজার হিসেবে পুনরায় কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে যোগদান করেন।

ইন্দিরা গান্ধীর ডাকা এক বৈঠকে লালদেঙ্গার সাথে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত হয়। তবে ওই বৈঠকে তার সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ভারত সরকারের কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তারা উল্লেখ করেন, লালদেঙ্গা ও তার পরিবারের সদস্যরা ব্রিটিশ ট্রাভেল ডকুমেন্টের অধিকারী। এর ফলে কার্যত তিনি ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে গেছেন। তারা প্রশ্ন রাখেন, ভারত সরকার কিভাবে তার ভূখণ্ডের একটি অংশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে বিদেশী ট্রাভেল ডকুমেন্টধারী একজনের সাথে কথা বলতে পারে?

ইন্দিরা গান্ধী তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বলেন, ভারত সরকারই তো তাদের ভারতীয় পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে ব্রিটিশ ট্রাভেল ডকুমেন্ট চাইতে বাধ্য করেছে। তারা তো তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেনি। তিনি আরও বলেন, 'লালদেঙ্গার সাথে আলোচনা ছাড়া মিজোরামে শান্তি এবং রাজনৈতিক সমাধান আসবে না। তার কাছে ট্রাভেল ডকুমেন্ট যেটাই থাকুক না কেন আমাদেরকে তার সাথে আলোচনা করতে হবে।'

১৯৯০ সালেও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সে সময় ইউরোপে বসবাসরত ও বিদেশী ট্রাভেল ডকুমেন্টধারী ভারতীয় একজন কাশ্মীরি নেতা ভারত সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন। ভিপি সিংয়ের মন্ত্রিসভার সদস্য জর্জ ফার্নান্দেজ কাশ্মীর বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন। ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধির তার সাথে কথা বলা উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনার জন্য ফার্নান্দেজ একটি বৈঠক ডাকেন। ওই কাশ্মীরি নেতা বিদেশী ট্রাভেল ডকুমেন্ট ধারণ

করছেন ওই যুক্তিতে কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর বিরোধিতা করেন। ১৯৮৩ সালে লালদেঙ্গার ব্যাপারে এ প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধী যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, আমি সেটার প্রতি ফার্নান্দেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি অনতিবিলম্বে ওই কাশ্মীরি নেতার সাথে দেখা করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তার কাছে কোন্ দেশের ট্রাভেল ডকুমেন্ট রয়েছে সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তবে ওই বৈঠক থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। অথচ লালদেঙ্গার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্তের ফলাফল শুভ হয়েছিল এবং এর ফলে মিজোরামে শান্তি ফিরে এসেছিল।

কাওয়ের অনুরোধে সে সময় জিসি সাকসেনার নেতৃত্বাধীন 'র' লালদেঙ্গার সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তিনটি বৈঠকের পর তাকে দিল্লিতে ফিরে জি পার্থ সারথির সাথে বৈঠকে বসার ব্যাপারে রাজি করানো গিয়েছিল। লালদেঙ্গার দিল্লিতে ফেরার পর ইন্দিরা গান্ধী পাঞ্জাবে সহিংসতা বন্ধের ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন এবং পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেন। এ অভিযান 'অপারেশন ব্লু স্টার' নামে অভিহিত হয়েছিল। এই অভিযানই ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণ হয়। পাঞ্জাবের দিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে তিনি লালদেঙ্গা ও মিজো সমস্যার দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারেননি। ইন্দিরার মৃত্যুর পর পুত্র রাজিব গান্ধী তার স্থলাভিষিক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বিষয় ছিল। ফলে মিজো সমস্যা ও লালদেঙ্গার সাথে আলোচনা তার প্রথম অগ্রাধিকারপূর্ণ বিষয় ছিল না।

এ অবস্থায় লালদেঙ্গা অস্থির হয়ে ওঠেন এবং তিনি মনে করতে থাকেন, তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। তিনি লন্ডন ফিরে যেতে চান। তাকে দিল্লিতে অবস্থান এবং ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। জি পার্থ সারথির সাথে তার আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় এবং মিজো সমস্যার সমাধান হয়। তিনি মিজোরামের স্বাধীনতার দাবি পরিত্যাগ করেন এবং ভারতীয় সংবিধানের আওতায় একটি সমাধান মেনে নেন। লালদেঙ্গা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হন। 'র'-তে আর্মির যে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার লালদেঙ্গার সাথে প্রথম যোগাযোগ করেছিলেন এবং পাকিস্তান থেকে জেনেভায় যেতে সহায়তা করেছিলেন তাকে রাজিব গান্ধী মিজোরামের লে. গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিক– লালদেঙ্গার এটা একান্ত ইচ্ছা ছিল। জেনেভা চলে যাওয়ার পর এই ব্রিগেডিয়ার এবং আইবি'র অপর এক কর্মকর্তা ১৯৭৫ সালে লালদেঙ্গার সাথে প্রথম দিকের অধিকাংশ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তবে ওই ব্রিগেডিয়ার লে. গভর্নর হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি 'র'-এর ২ নম্বর কর্মকর্তা পদে উন্নীত হয়ে ১৯৭৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

এভাবে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ নাগাল্যান্ডে আংশিক শান্তি ও মিজোরামে পূর্ণ শান্তি নিয়ে আসে। এর ফলে অনেকে ভেবেছিলেন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বুঝি শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। আমাদের সে আশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। ১৯৭৫ সালের আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর

একদল সেনা কর্মকর্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেসব সেনা কর্মকর্তার রাজনৈতিক সমর্থকরা ভারতের প্রতি বেশ একটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। ১৯৭১ সালের আগের পূর্ব পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় একশ্রেণীর উপজাতীয় বিদ্রোহীর তৎপরতা এবং আসামে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসামের (উলফা) মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোকে ভারতবিরোধী ব্যক্তিবর্গ ব্যবহার করেন এবং তারা চান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল আবারো অশান্ত হোক।

আমরা যেন ফের ১৯৭১ সালের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলাম। নাগা ও মিজো সংগঠনগুলোর স্থলে ত্রিপুরা ও আসামের বিদ্রোহী গ্রুপগুলো আর্থিক, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সহায়তা পেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের আশ্রয়স্থল থেকে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে সিআইএ ও আইএসআই আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে জিহাদের মদদ জোগায় সে জিহাদের উত্তাপ বাংলাদেশেও লেগেছিল। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনের উত্থান লক্ষ্য করা যায়। এ সময় হরকাত-উল-জিহাদ আল-ইসলামির মতো প্যান-ইসলামিক জিহাদি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তান যেভাবে ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপকদের কাছে উদ্বেগের বিষয় ছিল, ১৯৭৫ সালের পরবর্তী বাংলাদেশও ভারতের জন্য অনুরূপ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ফলাফল দাঁড়ায়, একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন পাকিস্তান এবং ভারতের প্রতি একটি বৈরীভাবাপন্ন বাংলাদেশ। ভারতীয় প্রভাব এবং ভারতের প্রতি বাংলাদেশের শুভেচ্ছার মনোভাব কমার পেছনে কী কারণ রয়েছে? তা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের আনাড়ি ব্যবস্থাপনা? না কি জাতীয় নিরাপত্তা আমলাতন্ত্রের আত্মতুষ্টিপূর্ণ মনোভাব? না কি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা, বিশেষ করে 'র'-এর বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও তার জনগণকে বুঝতে পারার ব্যর্থতা? বাংলাদেশী কাউন্টারপার্টদের প্রতি ভারতীয় কর্মকর্তাদের এক ধরনের হামবড়া মনোভাব? বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের স্পর্শকাতর দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেয়া? না কি এসবের কারণে সৃষ্ট ভারতের কুৎসিত ভাবমূর্তি? সম্ভবত এগুলোর সব কিছুর সংমিশ্রণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে দেশ থেকে যথাশিগগির সম্ভব সৈন্য ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা বড় করে দেখা থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব ইন্দিরা গান্ধী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার জন্য ভারতের কাছে ঋণী, এ ধরনের একটি ধারণা সৃষ্টি করা উচিত হবে না এবং তা করা হলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেবে। কিন্তু ভারতের সশস্ত্র বাহিনী ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এ কথা কেউ বলতে পারবেন না। এমনকি ৩৬ বছর পর আজো আমরা আমাদের ভূমিকাকে বড় করে এবং বাংলাদেশের জনগণের ভূমিকা ও তাদের অনেকের আত্মত্যাগের বিষয়টিকে খাটো করে দেখাতে চাই।

পরিচ্ছেদ : পাঁচ

বিদেশী হাত

'র'-এর ১৯৭১ সালের দু'টি বড় দুর্বলতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এর প্রথমটি ছিল ভারত মহাসাগর এলাকার সামুদ্রিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে দুর্বলতা আর দ্বিতীয়টি ছিল ভারতের বিরুদ্ধে চালানো মার্কিন তৎপরতার মানবিক (হিউমিন্ট) ও কারিগরি (টেকইন্ট) গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সামর্থ্যের অভাব।

তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের ভারতের প্রতি বৈরী মনোভাব, ভারতের বিজয় ঠেকাতে তাদের গোপন উদ্যোগ, চীনের সাথে সহযোগিতা এবং ভারতকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে ড. জগজিৎ সিং চৌহান ও খালিস্তান আন্দোলনের অন্য নেতাদের মদদদানের ঘটনায় ইন্দিরা গান্ধী উপলব্ধি করেন, পাকিস্তান ও চীনের পর 'র'-এর কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইন্দিরা গান্ধী উপলব্ধি করেন যে, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পতনের পরও ভারতের প্রতি মার্কিন বৈরিতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি আরও বুঝতে পারেন, মার্কিন বৈরি মনোভাব শুধু ভারতের প্রতিই নয়, তা একই সাথে ভারতে তার ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রতিও। ইন্দিরা গান্ধী আশঙ্কা করেন, পূর্ব পাকিস্তানে তিনি যা ঘটিয়েছেন তাতে মার্কিন গোয়েন্দারা ভারতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে তাকে শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তিনি লোকসভার নির্বাচনে তাকে পরাজিত করার লক্ষ্যে সর্বত্র সক্রিয় দেখতে পান মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র হাত। এ হাত তিনি দেখতে পান তার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের গণআন্দোলনে, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তার পরাজয়ে, এক ফরাসি তেল কোম্পানি থেকে তার দলের টাকা নেয়ার ব্যাপারে মোরারজী দেশাই সরকারের অভিযোগে, তার এবং পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশাই সরকারের বিভিন্ন তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশে এবং দেশাই ক্ষমতায় আসার পর পাঞ্জাবে হঠাৎ করে সহিংসতা বন্ধের ঘটনায়।

ইন্দিরা গান্ধীর ভয় বা শঙ্কার পুরোটাই কল্পনাপ্রসূত ছিল, এমন না। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ সালে তিনি নিহত হওয়ার সময় পর্যন্ত সিআইএ'র মনোযুদ্ধ বিভাগ ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদার হিসেবে চিত্রিত করার জন্য সবধরনের প্রচারণা জোরদার করে। অনুগত বিদেশী সাংবাদিকদের মাধ্যমে ইন্দিরা সম্পর্কে

ভিত্তিহীন কাহিনী তৈরি করে প্রকাশ করা হয়। এসব কাহিনীতে বলা হয়, ইন্দিরা গান্ধী আন্দামান, নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ও ভিজাগে সোভিয়েত নৌবাহিনীকে ঘাঁটি করতে দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। বিপুল সংখ্যক সোভিয়েত সামরিক কর্মকর্তা বিভিন্নভাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছেন। সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি'র বিশ্লেষকরা ১৯৮৪ সালে অমৃতসরের শিখ স্বর্ণমন্দিরে অবস্থানরত সশস্ত্র ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা অভিযানকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ইত্যাদি।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সিআইএ'র প্রচারাভিযান তুঙ্গে থাকে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় থাকাকালে এ অভিযানে ছেদ পড়ে। তবে এ সময়ও সিআইএ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচার করে। তাতে বলা হয়, জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস পার্টি একটি ফরাসি তেল কোম্পানি থেকে বিপুল অর্থ গ্রহণ করেছে। ইউরোপে বসবাসরত একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার মাধ্যমে দেশাই সরকার এ কাহিনী তৈরি করে। মোরারজী দেশাই সরকার এ বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (সিবিআই) নির্দেশ দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রমাণ করা যায়নি।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার পর অপপ্রচার নতুন করে শুরু হয়। ১৯৭৭ সালের আগে বাংলাদেশে তার কর্মকাণ্ড এবং ১৯৭৪ সালে পোকরানে পারমাণবিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার চলে। ১৯৮০ সালের পর আফগানিস্তান ইস্যুতে মস্কোকে ভারত সহায়তা করছে এবং মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে আফগান গোয়েন্দা সংস্থা খাদ ও কেজিবিকে 'র' সহযোগিতা করছে মর্মে যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহ করাই অপপ্রচারের মূল কারণ ছিল।

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হওয়ার পর শিখ নেতা ড. জগজিৎ সিং চৌহান ভারতে ফিরে আসেন এবং খালিস্তান আন্দোলনকে পরিত্যক্ত করে দেন। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তিনি আবার লন্ডন ফিরে যান এবং খালিস্তান আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৮১ সালে খালিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় সংগঠনগুলো বিস্তৃত হতে শুরু করে। এর বেশ কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে তাদের তৎপরতা পরিচালনা করে। মার্কিন কংগ্রেস এবং এর সদস্যদের কাছে ড. চৌহানের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল এবং তিনি সেখানে শিখদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেন। চৌহান মার্কিনিদের কাছে একই সাথে ভারত-সোভিয়েত সামরিক যোগসূত্রেরও নানা অভিযোগ তুলে ধরেন।

প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান প্রশাসনের সাথে খালিস্তানি ও অন্যান্য ভারতবিরোধী ব্যক্তির দহরম-মহরম বেড়ে যাওয়ায় তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা জর্জ বুশের সাথে সাক্ষাতের জন্য ওয়াশিংটন ডিসি সফরে যান কাও। কাও তখন 'র' থেকে অবসর গ্রহণ করে ইন্দিরা গান্ধীর কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে সিনিয়র উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে জর্জ বুশ সিআইএ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় কাও ব্যক্তিগতভাবে তার

পরিচিত ছিলেন। কাও ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতের আফগান নীতি সম্পর্কে মার্কিন ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন এবং খালিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িতদের সাথে ওয়াশিংটন ডিসির বিশেষ যোগাযোগের ব্যাপারে নয়াদিল্লির উদ্বেগের কথা জানান। বুশের সাথে কাও-এর এ বৈঠকের পর পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি ঘটে এবং খালিস্তান আন্দোলনের নেতারা আগের মতো আর ওয়াশিংটনে সমাদর পাননি। ১৯৮১ সালের অক্টোবরে মেক্সিকোর কানকুনে এবং ১৯৮২ সালের জুলাইয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠক সার্বিক সম্পর্কের পরিবেশকে অনেক উন্নত করে।

এর পরও কংগ্রেসের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সিআইএ'র বৈরী দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটেছে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে দুই শিখ দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা নিহত হওয়ার পেছনেও সিআইএ'র হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়। এক আমেরিকান গবেষককে ইন্দিরা গান্ধী মারা গেলে ভারতে কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা নিয়ে সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয় এ ঘটনা ঘটার আগেই। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পর এটি জানা যায়। এই সমীক্ষাকে ইন্দিরা হত্যার সাথে সিআইএ'র সম্পৃক্ততার প্রমাণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। এ ব্যাপারে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় কিন্তু তাতে এমন কোনো প্রমাণ মিলেনি যে সত্যি সত্যিই সিআইএ ইন্দিরা হত্যায় জড়িত ছিল।

১৯৭১-উত্তর সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সিআইএ'র অপপ্রচার 'র'-এর জন্য একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সিআইএ'র অপারেশনাল ও এনালাইসিস বিভাগ চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'র'-এর সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। কিন্তু আবার একই সময়ে মনোযুদ্ধ বিভাগ ইন্দিরা গান্ধীকে নানাভাবে ছোট করার চেষ্টা করে।

গোয়েন্দা পেশার বাইরের লোকের জন্য এসব বিষয় অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কিন্তু গোয়েন্দা পেশার লোকজন এ ধরনের পরিস্থিতিকে পেশাগত বিড়ম্বনা হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর নেতৃত্বাধীন ফরাসি সরকারের সাথে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধী সরকারের চমৎকার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এ সম্পর্ক সে দেশের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার জন্য 'র' ও আইবি'র বিভিন্ন গোয়েন্দা তৎপরতা সম্পর্কিত বিপুল দলিলপত্র প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে চুরি করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রোনাল্ড রিগ্যান প্রশাসনের সাথে রাজিব গান্ধী সরকারের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক চেন্নাইয়ে 'র' অফিসে ঢুকে সেখান থেকে বহুসংখ্যক ফাইল চুরি করতে সিআইএ'র সামনে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রশাসনের সময় দুই দেশের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে সিআইএ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ইতস্তত বোধ করেনি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় ভারত এবং এর নেতৃবৃন্দের প্রতি শুভ কামনা জানাতে মার্কিন কর্মকর্তারা কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। অথচ প্রধানমন্ত্রীর অফিসেরই অংশ 'র' এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ে

(এনএসসিএস) অনুপ্রবেশে সিআইএ মোটেই ইতস্তত করে না। রবিন্দর সিংয়ের মাধ্যমে সিআইএ এই অফিসে শুধু অনুপ্রবেশই করেনি, অধিকন্তু তিনি যখন প্রায় গ্রেফতার হয়েই যাচ্ছিলেন, তখন ভুয়া নামে আমেরিকান পাসপোর্ট দিয়ে তাকে দেশের বাইরে চলে যেতে সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সরকার এনএসসিএসে সিআইএ'র অনুপ্রবেশের মতো গুরুতর ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। এভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও বৈরিতা পাশাপাশি চলতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্তর্ঘাত সন্ত্রাস সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। পাকিস্তান ছাড়া অন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সাথে ভারতের গোয়েন্দা সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলোর সাথেও ভারতের এ ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল।

জওহর লাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের কার্যকর ও ফলপ্রসূ গোয়েন্দা সহযোগিতা বজায় ছিল। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর তা শিখরে পৌঁছে। এমনকি ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের টানাপড়েনের সময়ও এ ধারার বড় রকম ব্যত্যয় ঘটেনি। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৯০-এর দশকের আগে বহু পদস্থ ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। ১৯৬২ সালের বিপর্যয়ের পর আমেরিকা ও ব্রিটিশ সহায়তা নিয়েই ডিরেক্টর জেনারেল অব সিকিউরিটিজ (ডিজিএস) অফিস পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সিআইএ এবং এমআই-৬ হিসেবে পরিচিত ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (এসআইএস) সাথে 'র'-এর সহযোগিতার সম্পর্ক থেকে ভারত অনেক লাভবান হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আইবি গঠন এবং পরে চীনের মোকাবেলায় 'র'-এর অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুসংহত করার ব্যাপারে সিআইএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অন্যদিকে সিআইএ এবং অন্যান্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা পাকিস্তানকে মোকাবেলার জন্য র'কে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে রাজি ছিল না। তারা সবসময় চীনের মোকাবেলায় সাহায্য-সহযোগিতা করতে তৎপর হয়ে সাড়া দিতো।

এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সহযোগিতার যেসব ইতিবাচক ক্ষেত্র রয়েছে, তা বজায় রাখা হবে আর ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণাকে এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয়া ঠিক হবে না। একই সময় ইন্দিরা গান্ধী ও কাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে বিশেষত ভারত মহাসাগরে মার্কিন রণতরীর গতিবিধি ও তৎপরতার ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য 'র'-এর সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি বলে অনুভব করেন।

ভারতের দ্বীপগুলোতে নতুন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে 'র'-এর নতুন স্টেশন খোলাসহ এ ব্যাপারে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে 'র'-এর লিয়াজোঁ

নেটওয়ার্ক তৈরির সম্ভাব্যতাও যাচাই-বাছাই করা হয়। সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি'র সাথে যোগাযোগ করে সেখান থেকে কিছু উপকরণ আনা হয়, কিন্তু সেগুলো পর্যাপ্ত ছিল না। অন্য যেসব দেশের সাথে র-এর লিয়াজোঁ ছিল তার মধ্যে যুক্তরাজ্য, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, ইসরাইল ও জাপান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষাকারী দেশ। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করবে তা আশা করা হয়নি।

বিভিন্ন বিকল্প সতর্কভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নৌ-গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং ধারণা বিনিময় করার জন্য কাও ফরাসি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা এসডিইসিই'র (বর্তমানে ডিজিএসই হিসেবে পরিচিত) সহযোগিতা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফরাসি ভাষায় এসডিইসিই'র অর্থ দাঁড়ায় বৈদেশিক দলিল-দস্তাবেজ তৈরি ও পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তি সার্ভিস আর ডিজিএসই মানে হলো ডিরেক্টরেট জেনারেল অব এক্সটারনাল সিকিউরিটি।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জেনারেল চার্লস দ্য গলের বিদায় ও তার উত্তরসূরি জর্জ পমপিদোর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট ভ্যালোরি জিসকার্ড দ্য দেস্তাঁর সময় (১৯৭৪-১৯৮১) যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্স সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। প্যারিস আবার ন্যাটোর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে শুরু করে। এরপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফ্রান্সের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বেশ খানিকটা থেকেই যায়। এ কারণে কাও মনে করেন ফ্রান্সের কাছে ভারতকে সহযোগিতা দানের অনুরোধে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে।

এ সময় এসডিইসিই'র নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা লি কম আলেক্সান্ডার। তিনি ছিলেন আধা ফরাসি আধা স্কটিস। তখন প্যারিসে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন বাঙালি। তিনি সামরিক বাহিনী থেকে আসা ভারতীয় ফরেন সার্ভিসের লোক ছিলেন। লুক্সেমবার্গের ফরাসিভাষী স্ত্রী ছিল তার। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী মিসেল পনিয়াটস্কির সাথে ছিল তার নিবিড় সম্পর্ক। রাষ্ট্রদূত এসডিইসিই'র সাথে 'র'-এর লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠায় কাওয়ের আগ্রহের বিষয়টি পনিয়াটস্কিকে জানান।

আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসি তাৎক্ষণিকভাবেই এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেন এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কাওকে প্যারিস সফরের আমন্ত্রণ জানান। কাও প্যারিসে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন। এ সফরকালে ভারত মহাসাগর এলাকায় মার্কিন ও সোভিয়েত নৌবহরের গতিবিধি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ে লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। কাও চান যে এটি 'র' এবং এসডিইসিই'র মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় প্রকল্প হিসেবে থাকুক। কিন্তু আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসি প্রস্তাব করেন যে, শাহ-এর নেতৃত্বাধীন ইরানি গোয়েন্দা সংস্থা সাভাককে অন্তর্ভুক্ত করে এটাকে ত্রিপক্ষীয় করা হোক। প্রস্তাবটি কাও পছন্দ এবং গ্রহণ করেন। এক নাগাড়ে ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে সিআইএ'র কাছে শাহ ঋণী ছিলেন। এরপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক চোখ রাখা প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেন রেজা শাহ। বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটিই বাস্তব যে ইন্দিরা গান্ধীই একমাত্র নেত্রী ছিলেন না যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বস্তিবোধ করতেন না।

মার্কিন মিত্রদের মধ্যে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে নানা কারণে অস্বস্তিবোধ করতেন।

ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'টেকইন্ট' বা কারিগরি গোয়েন্দা কেন্দ্রগুলোর জন্য ফ্রান্স প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, ইরান অর্থকড়ি এবং 'র' জনবল সরবরাহ করবে। আর এই কেন্দ্রের গোয়েন্দা তথ্য তিনটি দেশই পাবে। 'র'-এর মনিটরিং শাখার প্রধান ও সেনাবাহিনীর সিগন্যাল কোরের অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তাকে নতুন প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে তিনি এ ধরনের দায়িত্ব পালন করে সম্মানিত হন।

কাও সিদ্ধান্ত নেন, আমি 'র'-এর পক্ষ থেকে প্যারিসে এসডিআইসিই'র সদর দফতরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করব। তিনি আরও সিদ্ধান্ত নেন, ভারতীয় দূতাবাসের কূটনীতিক পরিচয়ের পরিবর্তে একটি ভারতীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করে আমি এ দায়িত্ব পালন করব। এর আগ পর্যন্ত 'র'-এর কর্মকর্তাদের দেশের বাইরে কূটনীতিকের গোপন পরিচয়ে কাজ করার রীতিই চালু ছিল। অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থায় কূটনীতিক ও অ-কূটনীতিক যেকোনো পরিচয়ে নিজ দেশের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব পালন করার রীতি রয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'র' অ-কূটনীতিক পরিচয়ে কর্মকর্তাদের গোয়েন্দার দায়িত্ব পালনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেনি।

প্যারিসে এ কাজের জন্য আমাকে দু'টি কারণে নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রথমত, ১৯৫৬ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার ওপর আমি একটি কোর্স এবং ১৯৬১ সালে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে যোগদানের ৪ বছর আগে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় সংস্করণে কাজ করেছি। দ্বিতীয়ত, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ৪ বছর নয়াদিল্লিতে অলিয়ঁস ফ্রঁসেজে আমি ফরাসি ভাষা শিখেছি এবং ভাষার ওপর কাজ করার মতো মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করেছি।

আমি প্যারিস সংবাদদাতা হিসেবে পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য কাও চেন্নাইয়ের বহুল পরিচিত জাতীয় দৈনিক 'দি হিন্দু' পত্রিকার পরলোকগত জি পার্থসারথীর সাহায্য চান। তখন চিন্তা ছিল সাংবাদিক হিসেবে প্যারিসের অফিস চালানো, ভ্রমণ ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচপত্র দি হিন্দু থেকে আমাকে পাঠানো হবে এবং 'র' তা পরে দি হিন্দুকে পরিশোধ করবে।

হিন্দু পত্রিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলোচনার পর পার্থসারথী কাওকে জানান, পত্রিকার মালিক পক্ষ নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন তবে তাদের চূড়ান্ত সম্মতি দেয়ার আগে আমার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চান। কাও জানান, আমি চেন্নাইতে সাক্ষাৎকার দিতে যাওয়ার আগে তিনি এ ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর নীতিগত সম্মতি নিয়েছেন।

এর কয়েক দিন পর কাও আমাকে তার অফিসে ডাকেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকের গোপন পরিচয়ে কাজ করার বিষয়টি পছন্দ করছেন না। তাই তোমার বরং কূটনীতিক পরিচয়ে সেখানে যাওয়াই ভালো।

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে আমি 'র'-এর ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ

শেষ করে প্যারিস পৌঁছি এবং দূতাবাসের ইউনেস্কো ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেই। পরে রাষ্ট্রদূত আমার দায়িত্ব ইউনেস্কো ডেস্কের পরিবর্তে কনসুলার সংক্রান্ত ডেস্কে নির্ধারণ করেন। পাসপোর্ট ভিসা সংক্রান্ত কনসুলার শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম সচিব হিসেবে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাসে আমি দায়িত্ব পালন করি।

দূতাবাসে যোগদানের কয়েক সপ্তাহ পর কাও প্যারিস এসে তার প্রতিনিধি হিসেবে এসডিইসিই'র সাথে লিয়াজোঁ করার জন্য আলেক্সান্ডার দ্য ম্যারেঁসির সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। উভয়েই ভারত মহাসাগর এলাকার নৌ-গোয়েন্দা তথ্য এবং ভারত-চীন, চীন, পশ্চিম এশিয়া, উপসাগরীয় দেশগুলো, উত্তর আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের জন্য নেয়া প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করা আমার মূল কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেন।

লিয়াজোঁ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অলিখিত আচরণবিধি ছিল আমার জন্য। এই আচরণবিধি অনুযায়ী এখানে নিযুক্ত কর্মকর্তারা আমন্ত্রিত দেশের ব্যাপারে কোনো গোয়েন্দাবৃত্তি করতে পারবেন না। এ কারণে আমি সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে ফরাসি নাগরিকদের কাছ থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ থেকে বিরত থাকি। প্যারিস ত্যাগের আগে কাও আমাকে অ-ফরাসি সূত্র থেকে পাকিস্তান, চীন ও অন্য দেশের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ তাগিদ দেন। পরে ১৯৭৮ সালে ইরানে শাহবিরোধী ইসলামি আন্দোলন জোরদার হলে ফ্রান্সে প্রবাসী ইরানিদের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ আমার অন্যতম অগ্রাধিকার কাজে পরিণত হয়।

ভারত মহাসাগরের নৌ-গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নে আমার কাজ ছিল 'র' এবং এর সহপক্ষ এসডিইসিই এবং সাভাকের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তাকারীর দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে প্যারিস, তেহরান ও নয়াদিল্লিতে এ ব্যাপারে অনেক বৈঠক হয় এবং বৈঠকে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদনও তৈরি করা হয়। প্রকল্প প্রতিবেদনে ভারতে দু'টি বড় আকারের মনিটরিং স্টেশন খোলার সুপারিশ করা হয়। এর একটি হবে পূর্ব উপকূলে আর অপরটি পশ্চিম উপকূলে। এ ছাড়া বিদেশে দু'টি স্টেশন স্থাপনেরও সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে।

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে স্টেশন স্থাপনের জন্য ফ্রান্স যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ পাঠানো শুরু করে এবং কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই স্টেশন দু'টি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়। সমস্যা দেখা দেয় দু'টি বৈদেশিক স্টেশন স্থাপন নিয়ে। কাওয়ের অনুরোধে দু'টি দেশ তাদের ভূখণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস অঙ্গনে স্টেশন স্থাপনে সম্মতি দেয়। এসব দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে কাওয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কিন্তু এসব দেশের ভারতীয় মিশনের প্রধানরা দূতাবাস অঙ্গনে গোয়েন্দা মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করে সেখান থেকে কাজ করার ব্যাপারে আপত্তি জানান। তাদের আশঙ্কা ছিল যদি কোনো গোয়েন্দা তথ্য ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তা নিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক তাদের বিব্রত করতে পারে। একই সাথে তা সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ককেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

শেষ পর্যন্ত যৌথ প্রকল্প প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত দু'টি বৈদেশিক মনিটরিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হয়নি। ১৯৭৯ সালে ইরানের ক্ষমতা থেকে শাহ্-এর বিদায়ের পর দেশটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে পরিণত হলে প্রকল্প থেকে ইরানকে বাদ দেয়া হয়। এর ফলে প্রকল্পের জন্য ইরানের তহবিল আসা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে ফ্রান্সের এসডিইসিই তাদের জাতীয় বাজেট থেকে কোনো অর্থ ব্যয় হবে না শর্তে প্রকল্প অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়। এ টানাপড়েনে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। প্রকল্প থেকে ভারতের একমাত্র লাভ হয় ফ্রান্স থেকে কিছু মনিটরিংয়ের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম পাওয়া। এ প্রকল্প থেকে কার্যক্ষেত্রে ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত উল্লেখ করার মতো গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যায়নি।

ফ্রান্সের সাথে লিয়াজোঁ খুব একটা না এগোনোর কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে কাও মনে করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়। তার উত্তরসূরি মোরারজি দেশাই 'র'-এর কার্যক্রমের ব্যাপারে নানা ধরনের অসন্তোষ পোষণ করতেন। তিনি 'র'-এর কলেবর ও বাজেট দু'টিই ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিতে চান। ফ্রান্স ও ইরানের সাথে যৌথ গোয়েন্দা প্রকল্পটিতে এ সময় প্রচুর সংখ্যক কারিগরি জনবল নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। মোরারজি দেশাইয়ের সময় এ জনবল নিয়োগের প্রশ্নই তোলা যায়নি।

এর দ্বিতীয় কারণ ছিল কাওয়ের উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফ্রান্সের গোয়েন্দা সহযোগিতার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী ছিলেন না। প্রকল্পটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত না হলেও তা ফ্রান্স-ভারত গোয়েন্দা সহযোগিতার একটি মুখ্য ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব হারায়। কাওয়ের উত্তরসূরির আমলেও দু'দেশের মধ্যে গোয়েন্দা সম্পর্ক বজায় থাকে। তবে তা সীমিত ছিল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও ধারণা বিনিময় পর্যন্ত।

১৯৮১ সালে কাও ইন্দিরা গান্ধীর কেবিনেট বিভাগে ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে ফেরার পর প্রকল্পটির ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে তিনি অপারেশনাল সহযোগিতা সচল করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু এর মধ্যে ১৯৮১-র নির্বাচনে সোস্যালিস্ট নেতা ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসি ফ্রান্সের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের পদে ইস্তফা দেন। নতুন প্রধান হয়ে আসেন এয়ার ফ্রান্সের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পিয়েরে মেরিয়োঁ। তিনি এ প্রকল্পের ব্যাপারে আলেক্সান্ডার মারেঁসির মতো একই রকম গুরুত্ব দিতে চাননি।

ভারত ফ্রান্স গোয়েন্দা সহযোগিতা উদ্যোগের ফলাফলকে একটি বাক্যে প্রকাশ করতে বলা হলে তা হতে পারে, 'অতি উচ্চ প্রত্যাশার নগন্য ফল'।

১৯৭১ সালের পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত মহাসাগরের নৌ-গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সক্ষমতা দুর্বলই থেকে যায়। ড. মনমোহন সিং-এর বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার নিজেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর চাইতে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করে। ফলে এ নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার আছে বলে মনে করে না মনমোহন সরকার।

পরিচ্ছেদ : ছয়

জরুরি অবস্থা

আমাকে আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসির সাথে পরিচয় করাতে কাও প্যারিসে আসার পর কংগ্রেসের (আই) একজন সিনিয়র কাশ্মীরি নেতার পক্ষ থেকে একটি অতি গোপনীয় সাঙ্কেতিক চিঠি পান। কংগ্রেসের এই সিনিয়র নেতার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল বলে সবাই জানত। এই চিঠিটি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে জয় প্রকাশ নারায়ণ এবং অন্যদের বিক্ষোভের ফলে ভারতে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, এসব কিছু ছিল সিআইএ'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা যার উদ্দেশ্য দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং ইন্দিরা গান্ধীকে তার স্বাধীন নীতির জন্য শিক্ষা দেয়া। চিঠিতে তিনি আরও বলেন, তিনি এবং তার সাথে আরও অনেকেই ইন্দিরা গান্ধীকে জরুরি অবস্থা জারি এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী এটি করতে দ্বিধান্বিত। এ বার্তায় আরও বলা হয়, যেহেতু ইন্দিরা গান্ধী কাওয়ের মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন তাই তার উচিত হবে ইন্দিরা গান্ধীকে একই ধরনের পরামর্শ দেয়া।

কাও কংগ্রেসের (আই) সেই নেতাকে জরুরি অবস্থা জারির ব্যাপারে নেতিবাচক মতামত জানিয়ে ফিরতি সঙ্কেতিক চিঠি পাঠান। তিনি জরুরি অবস্থা জারির মতো যেকোনো চটজলদি সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছিলেন এ কারণে যে, এতে করে হিতে বিপরীত হতে পারে এবং তা শেষ পর্যন্ত অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে পাওয়া চিঠি এবং এর জবাব সংবলিত বার্তা তিনি ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও পাঠান। আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসির সাথে আলোচনা শেষে কাও ভারতে ফিরে যান। ১৯৭৫ সালের জুনের ২৭ তারিখ সকালে আমি ফরাসি বেতার থেকে শুনতে পাই যে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছেন। একই সাথে তিনি তার বিরোধী নেতা ও সমালোচকদের ধরপাকড়ের নির্দেশও দিয়েছেন। ইন্দিরা কি জরুরি অবস্থা জারির বিপক্ষে কাও'য়ের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? নাকি দেশে ফিরে কাও নিজেই তার মত পরিবর্তন করে একে সমর্থন করেছিলেন? আমি কখনওই এর উত্তর খুঁজে পাবো না। আমি কাওকে এ ব্যাপারে কোনো দিন প্রশ্ন করিনি এবং কাও নিজেও এ বিষয় নিয়ে আমার সাথে

কথা বলেননি।

জরুরি অবস্থা জারির আগে মূলত ১৯৭২ সাল থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে কাও'য়ের আবির্ভাব নিয়ে কিছু সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তার ক্ষোভ এবং ঈর্ষা ছিল। কিছু কিছু বিষয়ে ক্ষোভ এবং ঈর্ষার প্রকাশ ছিল সহজবোধ্য। যেমন জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে (জেআইসি) 'র' এবং আইবি'র প্রতিবেদনগুলো জেআইসি'র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল। স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত দেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মতবিনিময় ছাড়াই কাও সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীকে তাদের রিপোর্ট ও অভিমত জানাতেন। এটি তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করত। এ ছাড়া 'র'-এর দ্রুত প্রসার লাভকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকর্তা কাওয়ের ওপর ইন্দিরা গান্ধীর আস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমান্তরাল একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করছেন বলে মনে করতেন।

এ ধরনের অস্বস্তির সাথে অবিশ্বাস যুক্ত হয়ে জরুরি অবস্থা জারির পর এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যাতে ইন্দিরা গান্ধী ও তার রাজনৈতিক সহযোগীরা মনে করত, তাদের বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে সবই হচ্ছে সিআইএ'র ইন্ধনে। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধীরা মনে করত, তাদের বিরুদ্ধে ইন্দিরার প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে কাও এবং 'র'-এর হাত রয়েছে। অনেকেই জরুরি অবস্থা জারির পেছনে অশুভ অভিসন্ধি রয়েছে বলে অভিযোগ করত। আরও অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, 'র'-এর মতো একটি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কোচি, ব্যাঙ্গালোরের মতো দেশের ভেতরে এত কর্মকর্তার প্রয়োজন কেন হলো। তারা বুঝতে চেষ্টা করেননি, ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের এবং সন্দেহভাজনদের ওপর নজরদারির জন্য 'র'-এর কর্মকর্তাদের রাখা হয়নি বরং সম্ভাব্য সূত্র হিসেবে বিদেশ থেকে ভারতে আসা ভ্রমণকারীদের দিকে নজর রাখাই ছিল তাদের মূল দায়িত্ব।

এটি ঠিক, ১৯৭১ সালের পর অপ্রয়োজনীয়ভাবে 'র'-এর প্রসার ঘটানো হয়েছে, যা ১৯৭৫ সালে আরও গতি লাভ করে। 'র'-এর এই প্রসার বিদেশে যেমন ছিল তেমনিভাবে নয়াদিল্লিতে সংস্থার সদর দফতরের জনবলকেও বাড়ানো হয়। এই দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে 'র'তে অনেক নতুন কর্মকর্তার অভিষেক হয়। যারা এখানে যোগ দেন তাদের মধ্যে অন্যান্য সার্ভিসের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন কর্মকর্তা যেমন ছিলেন তেমনি আবার অনেকেই সরাসরি এ সংস্থায় যোগ দেন। তাদের অনেকেই কর্মক্ষেত্রে নিজেদের এই পেশার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। এতে করে মাঝারি এবং ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগ্যতা এবং প্রণোদনার ক্ষেত্রে এক ধরনের জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি হয়। এর ফলে আবার প্রতিষ্ঠানের আউটপুট তথা কাজের ক্ষেত্রেও মান এবং গতি এক রকম থাকেনি। 'র'-এর এই দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের বিতর্কও তৈরি করে। এটি মূলত এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল যে, নতুন নিযুক্তদের

মধ্যে এমন অনেককে পাওয়া যায়, যারা 'র'-এর বর্তমান অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজন।

'র'-এর এই দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষেত্রে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধীরা যে ধরনের অভিযোগ করে থাকেন সেরকম অশুভ কোনো উদ্দেশ্য এ সম্প্রসারণের পেছনে ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত ইন্দিরার বিরোধীরা মনে করতেন যে, কোনো ধরনের যুক্তি ছাড়াই ইন্দিরা বিরোধী ও তার সমালোচকদের ওপর নজর রাখতে 'র'-এর এই প্রসার ঘটানো হয়েছিল।

তাদের এই সন্দেহ আরও গুরুতর হয় তখন, যখন তৎকালীন তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা 'র' এবং আইবি'র দু'জন কর্মকর্তাকে তার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। এটি সত্যিই একটি অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল। 'র' ও আইবি'র উচিত ছিল তাদের কর্মকর্তাদের সেখানে পাঠানোর ব্যাপারে রাজি না হওয়া। ঠিক বা বেঠিক যাই হোক না কেন, অনেকেরই ধারণা প্রচার মাধ্যমকে শান্ত করাই ছিল তাদের কাজ।

ইন্দিরা গান্ধীর অনেক সমালোচকই বলতে শুরু করেন যে জরুরি অবস্থা জারির পর 'র' ভারতের কেজিবি'তে পরিণত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় এবং এর পরে বিরোধী দলকে নাজেহাল করা এবং তার সমালোচকদের পেছনে গোয়েন্দাগিরির জন্য ইন্দিরা গান্ধী 'র'-কে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, এ অভিযোগ সত্য ছিল না। কাও কখনওই সঞ্জয় গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন না এবং তার সাথে এক ধরনের দূরত্বই বজায় রাখতেন। সঞ্জয় গান্ধীর কোনো বাড়াবাড়ির সাথে 'র' যে সহযোগিতা করেনি তিনি তা নিশ্চিত করেন। কাওয়ের ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু সঞ্জয়ের সাথে কাওয়ের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির জন্য তিনি কখনও প্রভাব খাটাতেন না।

পুরো জরুরি অবস্থার মধ্যে আমি প্যারিসে কর্মরত ছিলাম। এ সময় আমাকে একটি অস্বস্তিকর কাজের নির্দেশ দেয়া হয় এবং এটি ছিল জর্জ ফার্নান্দেজের স্ত্রী লায়লা ফার্নান্দেজের অবস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। ভারত সরকারের ধারণা ছিল, ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট পার্টি তাকে সে দেশে আশ্রয় দিয়েছে। আমি তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি কিন্তু তার অবস্থান জানতে পারিনি। এর বাইরে সদর দফতর থেকে প্রশ্নসাপেক্ষ কোনো কিছু করতে আমাকে বলা হয়নি। এরপরও জরুরি অবস্থার মধ্যে নানান অপকর্মের সাথে 'র' সম্পৃক্ত ছিল বলে ব্যাপকভাবে ধারণা সৃষ্টি হয়। ফরেন সার্ভিসসহ আমলাদের একটি অংশের মধ্যেও এ ধারণা সৃষ্টি হয়।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা এবং এর পর যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতেও গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'র' ভাবমূর্তি এবং উজ্জ্বলতা হারায়। '৭৫-এর ঘটনার পর বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে দেশটির ওপর ভারতের প্রভাব কমে যায়। 'র'-এর সমালোচকরা এটাকে ভয়ঙ্কর গোয়েন্দা বিপর্যয় হিসেবে সমালোচনা করেন। এ ঘটনার পর প্যারিসে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং কাও'য়ের ব্যক্তিগত বন্ধু 'র'-এর

ব্যাপারে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন। তিনি আমার কাছে জানতে চান, 'র' কিভাবে মুজিববিরোধী এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল?'

আমি কাও'কে এ ব্যাপারে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে 'র'-এর সমালোচনার কথা জানাই। 'র' সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা শুধু দূতাবাসে ছিল এমন নয়, নয়াদিল্লি থেকে প্যারিস সফরে আসা পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যেও একই মতামত পেয়েছি।

মুজিব হত্যার কয়েক সপ্তাহ পর কাও'য়ের জেনেভা সফরের কর্মসূচি ছিল। তিনি আমাকে আমার চিঠির ব্যাপারে কথা বলতে জেনেভায় ডেকে পাঠান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে 'র' কোনোভাবেই ব্যর্থ হয়নি। তার মতে, মুজিবের জনপ্রিয়তা দিন দিন হ্রাস পেয়েছিল। বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীতে তার জনপ্রিয়তা একবারে কমে যায় এবং সেখানে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি প্লট তৈরি হয়। এসব বিষয়ে কাও ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়মিত অবহিত রাখতেন। মুজিবের জীবনের প্রতি হুমকি তৈরির বিষয়টিও ইন্দিরাকে জানানো হয়েছিল। মধ্যবর্তী এক মাধ্যমে ইন্দিরা যখন এসব বিষয় শেখ মুজিবকে জানান তখন মুজিব এ আশঙ্কার ব্যাপারটি উড়িয়ে দেন। তিনি মনে করতেন, তার জনপ্রিয়তা ১৯৭১ সালের মতোই আছে এবং তার জীবনের প্রতি কোনো হুমকি নেই। কাও প্রশ্ন করেন, মুজিব নিজেই যদি এগুলোকে গুরুত্ব না দেন তাহলে 'র' কেন এ ব্যাপারে দায়ী হবে? তিনি আরও উল্লেখ করেন, আমার নিজেকে রক্ষা করে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি আমাকে যা বলেছেন তা তার বন্ধু রাষ্ট্রদূতকেও বলতে বলেছিলেন। আমি ঠিক তাই করেছিলাম।

এত কিছুর পরও 'র'-এর অভ্যন্তরে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, বাংলাদেশের ওপর 'র'-এর প্রভাব নিঃশেষ হতে চলেছে। 'র' এখন আর বাংলাদেশ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত সংস্থা নয়। এর আগে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে যে ধরনের সঠিক তথ্য পাওয়া যেত এখন সে রকম তথ্য 'র' থেকে পাওয়া যায় না। এরপর বহু বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের ব্যাপারে 'র'-এর এসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন বাংলাদেশের চেয়ে বেশি সঠিক প্রমাণ হতো। আমার মনে আছে, বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে 'র' যে প্রতিবেদন তৈরি করে তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। সৌভাগ্যবশত 'র'-এর বাংলাদেশ সংক্রান্ত এই এসেসমেন্ট সম্পর্কে তখনকার 'র' প্রধানের সংশয় থাকায় এ রিপোর্ট তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দেননি। ফলে সংস্থাটি এক বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে বহুমুখী সূত্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা, 'র' ও ভারতের ব্যাপারে দেশটির নিরাপত্তাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরূপ ধারণা, বিশেষ একটি দলের প্রতি ভারতের আনুকূল্য রয়েছে আওয়ামী লীগ-বহির্ভূত বলয়ে এমন সন্দেহ ও বিরূপ মনোভাব এবং বাংলাদেশ বিষয়ক বিশ্লেষণ শাখার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব জরুরি অবস্থা চলাকালে বাংলাদেশে 'র'-এর অবস্থার অবনতি ঘটায়। এরপরও এ ধারা অব্যাহত ছিল।

পরিচ্ছেদ : সাত

মেঘের ঘনঘটা

১৯৭৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা নির্বাচন আহ্বান করেন। একই বছরের মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মার্চ জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয়। ওই নির্বাচনে কংগ্রেসের (আই) চরম পরাজয় ঘটে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্র সঞ্জয় গান্ধী কতটা অজনপ্রিয় হয়েছিল এবং জরুরি অবস্থা চলাকালীন যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল, তার প্রতি মানুষের কী পরিমাণ ক্ষোভ ছিল, এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধী ব্যক্তিগতভাবেও ন্যক্কারজনক পরাজয় বরণ করেন। নির্বাচনে সাবেক কংগ্রেস নেতা মোরারজি দেশাইর নেতৃত্বে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে। মোরারজি দেশাইর মন্ত্রিসভায় চরণ সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অটল বিহারি বাজপেয়ি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নেপালের তৎকালীন রাজা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটি পত্র পাঠান। পত্রে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে সপরিবারে নেপালে চলে আসার পরামর্শ দেন। ইন্দিরা নিজে যেতে ইচ্ছুক না হলেও সঞ্জয় গান্ধী ও রাজিব গান্ধীকে তাদের পরিবারসহ নেপাল পাঠিয়ে দিতে রাজি ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি কাও'য়ের সাথে পরামর্শ করেন। কাও বলেন, এতে তার রাজনৈতিক জীবন এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে, তা আর পূরণ করা যাবে না। ইন্দিরা গান্ধী তার কথা অনুধাবন করেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে বিরোধী দলগুলো অন্যান্য বিষয় ছাড়াও জরুরি অবস্থাকালীন আইবি, 'র' এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) ভূমিকারও কঠোর সমালোচনা করে। বিরোধী দল ও ইন্দিরা গান্ধীর অন্যান্য সমালোচককে দমনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী এসব সংস্থাকে ব্যবহার করেছিলেন– এই অভিযোগে এসব সংস্থা ও তাদের প্রধানদের অভিযুক্ত করা হয়। বলা হয়, তারা নিজেদের ও তাদের সংস্থাকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। নতুন সরকার তাদের সবাইকে সরিয়ে অন্যদের এসব সংস্থার দায়িত্ব দেয়।

কাও'য়ের বর্ধিত মেয়াদের চাকরির মাত্র ক'মাস বাকি ছিল। এ অবস্থায় মোরারজি দেশাই কর্তৃক অপমানিত হওয়ার পর তিনি 'র'-এর চাকরি ছেড়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই কাও'কে তলব করেন দেশাই। সেখানে অপমানিত হয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর 'র'-এর ২ নম্বর ব্যক্তি শঙ্করানান নায়ার তার স্থলাভিষিক্ত হন। নতুন সরকারের একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি

মাসের মাথায় নায়ারও পদত্যাগ করেন। 'র'-এর প্রধানের পদবি তখনও পর্যন্ত ছিল সেক্রেটারির। সরকার সেটিকে আইবি প্রধানের পদবির অনুরূপ ডাইরেক্টর হিসেবে নতুন করে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। নায়ার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এতে 'র' প্রধানের পদমর্যাদা খাটো হতে পারে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। মোরারজি দেশাইর কিছু ঘনিষ্ঠ সিনিয়র কর্মকর্তা এত শীঘ্র পদত্যাগ না করার জন্য তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। জানা যায়, তারা তাকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, এটা নিছক নামের পরিবর্তন। কাও সংস্থার প্রধান হিসেবে যেভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন তিনিও একইভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। কিন্তু তাতেও রাজি হননি নায়ার।

নায়ারের পদত্যাগে 'র'-এর সব শ্রেণীর কর্মকর্তা মর্মাহত হন। তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তিতুল্য অপারেশনাল কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পেশাদার ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা কর্মকর্তা। তিনি সব শ্রেণীর রাজনীতিককে এড়িয়ে চলতেন। তিনি কারো হয়ে কাজ করতেন না। জরুরি অবস্থা জারির আগে ইন্দিরা গান্ধী ডিআইবি হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য তাকে বাছাই করেন। ডিআইবি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে আর কে ধাওয়ানের মাধ্যমে তাকে বাসায় এসে দেখা করার জন্য বার্তা পাঠান সঞ্জয় গান্ধী। নায়ার এর জবাবে তার অপারগতার কথা জানিয়েছিলেন। সঞ্জয় গান্ধী তার মাকে দিয়ে ডিআইবি হিসেবে নায়ারের পোস্টিং বাতিল করিয়েছিলেন। তিনি 'র' থেকে সরিয়ে তাকে তার নিজ রাজ্য ক্যাডারে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কাও এটা মানতে রাজি হননি এবং ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সঞ্জয় গান্ধীর হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জানা যায়, ইন্দিরা গান্ধী সঞ্জয়কে 'র'-এর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন।

নায়ার গোয়েন্দাদের মধ্যে পাকিস্তান ও বাদবাকি ইসলামী দুনিয়ার ব্যাপারে প্রধান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'র' গঠিত হওয়ার আগে আইবি'তে থাকা অবস্থাতেই পাকিস্তানের বিষয় দেখাশোনা করেন। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীতে সোর্সের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অফিসে তার একজন অনুচর ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জানান যে, ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী (পিএএফ) পশ্চিম সেক্টরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর (আইএএফ) ফরোয়ার্ড বেজগুলোতে একটি প্রিয়েমটিভ হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। নায়ার সাথে সাথে বিষয়টি আইএএফকে জানান এবং কাও সেটি ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত করেন। আইএএফ হাই অ্যালার্টের নির্দেশ দিয়ে পাকিস্তানের পরিকল্পিত প্রিয়েমটিভ হামলা প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু ১ ও ২ ডিসেম্বর তেমন কিছুই ঘটেনি। ৩ ডিসেম্বর সকালে আইএএফ সদর দফতর নায়ারকে বলে, তারা আর বেশি সময় পাইলটদের হাই অ্যালার্টে রাখতে পারছেন না। তিনি এ অবস্থা আরও ২৪ ঘণ্টার জন্য বজায় রেখে কোনো কিছু না ঘটলে ৪ ডিসেম্বর সকালের দিকে সতর্কাবস্থাকে ডাউনগ্রেড করার অনুরোধ জানান। তিনি আইএএফ সদর দফতরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, তার সোর্স অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং তার বিবেচনায় প্রাপ্ত তথ্য সঠিক। ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়

পিএএফ তার প্রিয়েমটিভ হামলা চালায়। কিন্তু সে হামলা আইএএফ'র সতর্কাবস্থার কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল নায়ারের।

এদিকে নায়ার পরীক্ষা করে দেখেন তার সোর্স অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার পরও তার দেয়া সময় কিভাবে হেরফের হলো? তিনি দেখেন যে, তাকে দেয়া কোড মেসেজে ৩ ডিসেম্বরের কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু 'র'-এর সদর দফতর সেটাকে ভুলবশত ১ ডিসেম্বর বলে ডিকোড বা ব্যাখ্যা করে।

নায়ার ছিলেন কাও'য়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের বন্ধুত্ব কিংবদন্তিতুল্য। কাও কোনো কিছুই নায়ারের সাথে পরামর্শ ছাড়া করতেন না। আবার নায়ারও কাও'য়ের সাথে পরামর্শ ছাড়া কিছু করতেন না। কাও যতটা 'র'-এর প্রতিষ্ঠাতা জনক, নায়ারও ঠিক ততটাই। বস্তুত ইন্দিরা গান্ধী যখন আইবি'কে বিভক্ত করে 'র' গঠন করে তাকে সেটার প্রধান করার সিদ্ধান্ত কাও'কে জানান তখন একমাত্র নায়ারই তাকে নতুন সংগঠনটি সৃষ্টির ব্যাপারে সাহায্য করেন। কাও এবং নায়ারের নেতৃত্ব ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে 'র'-এর সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। এ সাফল্যের ফলে বাংলাদেশের জন্ম হয়। কাও'য়ের ছিল পরিকল্পনা আর সে পরিকল্পনার বহুলাংশে বাস্তব রূপ দিতেন নায়ার। কাও'য়ের মতো নায়ারও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

মোরারজি দেশাই সরকার ক্ষমতায় এসে ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধী এ সংস্থাটিকে কোনো ধরনের অপব্যবহার করেছে কি না সেটা দেখার জন্য 'র'-এর সব রেকর্ডপত্র চেক করে দেখেন। কিন্তু তারা অপব্যবহারের একটা নজিরও পায়নি। তবে তারা অর্থ মন্ত্রণালয় এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ফাইলগুলোতে একটা প্রশ্নবোধক বিষয় খুঁজে পায়। তারা ভেবেছিল এর মাধ্যমে তারা 'র', কাও ও নায়ারকে ফাঁসাতে পারবে। এটা ছিল জরুরি অবস্থাকালীন একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৬০ লাখ মার্কিন ডলার জমা দেয়ার জন্য নায়ারকে জেনেভায় পাঠানো সংক্রান্ত। মোরারজি দেশাই সন্দেহ করেছিলেন এই অ্যাকাউন্ট সঞ্জয় গান্ধীর হতে পারে।

পরে অনুসন্ধানে দেখা যায়, এ অ্যাকাউন্টের প্রকৃত মালিক ইরানের শাহের বোন আশরাফ পাহলবির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু, রাশিদিয়ান নামক জনৈক ইরানি মিডলম্যানের। ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবার হিন্দুজার সুপারিশে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ভারতের জন্য সহজ শর্তে দু'টি ঋণ মঞ্জুর করার জন্য শাহকে রাজি করাতে আশরাফ পাহলবিকে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে লোকটিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করে। এ ঋণ দু'টির একটি ছিল ভারতের রফতানি বিল পরিশোধ এবং অপরটি ছিল কুন্দারমুখ আইরন ওর প্রকল্পে অর্থ যোগানো সংক্রান্ত। ১৯৭৪ সালে ভারত পোখরানে প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালালে ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ভারত সরকার ইরানের কাছে ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের সহজ শর্তের ঋণ চেয়েছিল। আশরাফ পাহলবির অনুরোধে শাহ ভারতকে সাহায্য করতে রাজি হন। এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় হিন্দুজার সুপারিশ মেনে নেন। হিন্দুজা এই মর্মে সুপারিশ করেছিল যে, শাহের বোনের সহায়তায় ঋণ মঞ্জুর করিয়ে নেয়ার জন্য

রাশিদিয়ানকে কমিশন বাবদ ৬০ লাখ ডলার প্রদান করা হোক। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক নায়ারের কাছে এই অ্যাকাউন্টের একটি ড্রাফট হস্তান্তর করার কথা বলে জেনেভা ব্যাংককে একটি টেলেক্স বার্তা পাঠায়। অর্থ মন্ত্রণালয় এ ড্রাফটটি সংগ্রহ করে তা রাশিদিয়ানের অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার জন্য নায়ারকে জেনেভা পাঠাতে কাও'কে অনুরোধ জানায়। কাও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কথামতো কাজ করেছিলেন।

এসব তথ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর মোরারজি দেশাই আর এ ব্যাপারে অগ্রসর না হয়ে বিষয়টির সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটানোর নির্দেশ দেন। অধিকন্তু হিন্দুজারা সঞ্জয় গান্ধীর চাইতে মোরারজি দেশাই, বাজপেয়ি এবং এল কে আদবানির আরও বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তারা যখন দেখেন, হিন্দুজার কথিত সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কমিশন দিয়েছে, তাই এই নিয়ে তারা আর সামনে অগ্রসর হওয়ার বাসনা ত্যাগ করেন।

নায়ারের 'র' ত্যাগের সিদ্ধান্ত এই সংস্থাটি কিংবা গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের জন্যই শুধু একটি বড় ধরনের আঘাত ছিল না, প্রশাসনে তার যে বিপুল সংখ্যক বন্ধুবান্ধব ও ভক্ত ছিলেন তাদের জন্যও তা সমান আঘাত ছিল। সৌভাগ্যবশত এন এফ সানতুককে 'র'-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দানে মোরারজি দেশাইর বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্তের ফলে ওই আঘাত সামলানো সম্ভব হয়েছিল।

সানতুক ছিলেন ভারত সরকারের জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির (জেইসি) চেয়ারম্যান। তবে সানতুককে 'র' প্রধান করা হয়েছিল ডাইরেক্টরের নয়া পদবিতে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে সানতুক জেআইসিতে ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। 'র'-তে তার অবস্থান ছিল নায়ারের পরে ৩ নম্বরে। সানতুক ইমার্জেন্সি কমিশন্ড অফিসার হিসেবে ভারতীয় নৌ বাহিনীতে চাকরি জীবন শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি ভারতীয় পুলিশ বিভাগে এবং পুলিশ বিভাগ থেকে ইন্ডিয়ান ফ্রন্টিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিসে (আইএফএএস) যোগদান করেন। ওই সময় জওহরলাল নেহরু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় এলাকা এবং আন্দামান ও নিকোবর আইল্যান্ডের প্রশাসন দেখভাল করতেন। সানতুক উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং আন্দামান ও নিকোবর এলাকায় সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। উপজাতীয় এলাকার যেসব লোক তাকে চিনত তারা আজো তাকে আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করেন।

আইএফএএস যেসব প্রতিভাধর কর্মকর্তার জন্ম দিয়েছিল, তন্মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন সানতুক ও উইং কমান্ডার মুরকত রামুনি। উপজাতীয় এলাকার প্রশাসনে তাদের প্রচুর অবদান ছিল। 'র' গঠিত হওয়ার কয়েক মাস পর কাও আগে থেকেই চেনা সানতুককে 'র'-তে যোগদানের জন্য রাজি করান। কাও তাকে প্রশাসন ও আফ্রিকান ডিভিশনের দায়িত্ব দেন। নায়ারের মতো সানতুকও অত্যন্ত পেশাদার এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তবে নায়ারের তুলনায় সানতুক অপারেশনাল ওয়ার্ক খুব কমই করতেন এবং গোয়েন্দাবৃত্তিতে তার জ্ঞান ছিল সীমিত। তবে এই সীমাবদ্ধতা তার 'র' প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি তার দু'নম্বর কর্মকর্তা হিসেবে চারজন বিশিষ্ট কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে বেছে নেন। প্রাথমিকভাবে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার আইএস

হাসানওয়ালিয়াকে বেছে নেন। হাসানওয়ালিয়া আইবি ও পরবর্তী সময়ে 'র'-তে পাকিস্তান অপারেশন ডিভিশনে সানতুকের পরই দ্বিতীয় কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সানতুকের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন। হাসানওয়ালিয়ার অবসর গ্রহণের পর এসপি কার্নিক দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী কার্নিক ছিলেন প্রথমে আইবি'র এবং পরবর্তী সময়ে 'র'-এর চীন বিভাগের একজন কর্মকর্তা। কার্নিকের পর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উড়িষ্যা ক্যাডারের অপর এক আইপিএস অফিসার আইবি'র চৌকস গোয়েন্দা শিববাজ বাহাদুর। সানতুকের দ্বিতীয় কর্মকর্তা হিসেবে বাহাদুরের স্থলাভিষিক্ত হন উত্তর প্রদেশের অধিবাসী আইপিএস কর্মকর্তা জি সি সাক্সেনা। ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে সাক্সেনা 'র' প্রধান হিসেবে সানতুকের স্থলাভিষিক্ত হন। হাসানওয়ালিয়া ও কার্নিক 'র'-এর দু'নম্বর ব্যক্তি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এসে বাহাদুরকে সরিয়ে দেন। এসব কর্মকর্তা এটা লক্ষ্য রাখতেন যে, ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাই 'র'-তে যে পরিবর্তন আনেন তাতে সংস্থাটির কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যাতে কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

অথচ কাও 'র' প্রধান হিসেবে প্রায় ৯ বছর দায়িত্ব পালন করেন। মল্লিকের পর তিনিই গোয়েন্দা সংস্থায় দীর্ঘ দিন কাটিয়েছিলেন। মল্লিক ১৬ বছর ডিআইবিতে কাটান। সানতুক নিরবচ্ছিন্নভাবে ছয় বছর অর্থাৎ তৃতীয় দীর্ঘতম সময় দায়িত্ব পালন করেন। ডিআইবি'তে সানতুকের যে ধরনের রেকর্ড ছিল অনুরূপ রেকর্ড রয়েছে বর্তমান ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এম এ নারায়নানের। তবে নারায়নানের দীর্ঘমেয়াদ ছিল দুই বারে। মল্লিক ও কাও দু'জনই একজন করে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেন। মল্লিক করেছেন জওহর লাল নেহরুর অধীনে আর কাও করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর অধীনে। কিন্তু সানতুকের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি তিন-তিন জন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেছেন, যাদের মেজাজ-মর্জি, মতাদর্শ ও চরিত্রের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। এই তিন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন– মোরারজি দেশাই, চরণ সিং ও ইন্দিরা গান্ধী। মোরারজি দেশাই কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তার চরম প্রতিপক্ষ ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০ সালে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এসে তাকে বাদ দেননি। এতেই প্রমাণিত হয় যে সানতুক কী অসাধারণ গুণে তিন-তিনজন প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। তবে কাও'য়ের সাথে তার বন্ধুত্বের জোরেও তিনি অনেকটা ইন্দিরা গান্ধীর অধীনে কাজ করতে পেরেছিলেন।

সানতুকের মধ্যে নানা ধরনের সৎ গুণ ছিল। তিনি নিজেকে কখনও জাহির করতে চাইতেন না। তার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ছিল লক্ষ্যণীয়। তিনি কখনও তার পূর্বসূরিদের ব্যাপারে কটূক্তি করতেন না। তিনি নিজগুণের পরিবর্তে পূর্বসূরিদের দোষক্রটি বড় করে দেখিয়ে স্বীয় ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করার মতো মানুষ ছিলেন না। তার সম্পর্কে একটিও খারাপ উক্তি করার ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। তিনি মোরারজি দেশাইর কাছে কাও এবং ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে বানোয়াট কাহিনী বলে তার অনুগ্রহভাজন হতে পারতেন। কিংবা তিনি কাও অথবা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতে পারতেন। কিন্তু কখনও তিনি এমনটি

করেননি। তিনি কাও'য়ের প্রতি তার ব্যক্তিগত আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং পাশাপাশি অপমান-অপদস্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

মোরারজি দেশাই, চরণ সিং ও বাজপেয়ি এই ধারণা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন যে, জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধীকে দিয়ে 'র'-কে ব্যবহৃত হতে দেয়ার পেছনে কাওয়ের অবদান ছিল। মোরারজি দেশাই কাওয়ের প্রতি এতটাই আস্থাহীন ছিলেন, নায়ারের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে কাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ধ্বংস করে ফেলেছেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে দেশাই কেবিনেট সচিবকে কাওয়ের অফিসে পাঠান।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ ফাইলপত্রগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই তারা উপলব্ধি করতে পারেন যে তাদের ধারণা ঠিক ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর কাওয়ের ব্যাপারে তিনি যে তদন্ত পরিচালনা করিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে চরণ সিং কাওয়ের সাথে কথা বলার উদ্যোগ নেন। কাওকে চরন সিং বলেছিলেন, তিনি আসলে সততার সাথেই তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো মিথ্যা ছিল। এর কয়েক বছর পর কাও আমার কাছে তার প্রতি চরণ সিংয়ের এ ঔদার্যের কথা স্মরণ করতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

নতুন সরকার 'র'-এর ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। একমাত্র কাও ছাড়া আর কাউকে রাজনৈতিক কারণে চলে যেতে হয়নি। তবে একই কথা কেউ ইন্দিরা গান্ধীর বেলায় বলতে পারবেন না। ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তিনি সংস্থার ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সানতুকের ২ নম্বর ব্যক্তি বাহাদুরসহ ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের চারজন কর্মকর্তাকে মোরারজি দেশাই ও চরণ সিংয়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহে তাদের অনাড়ম্বরে বিদায় জানান। অথচ বদলিকৃত এ চার কর্মকর্তার একজনের সাথে চরণ সিংয়ের সম্পর্ক ছাড়া এ ধরনের কোনো কিছুই ছিল না।

মোরারজি দেশাইর অধীনে 'র'-তে এ ধরনের কিছু না ঘটার কৃতিত্ব বহুলাংশে সানতুকের ওপর বর্তায়। এমনটি যাতে না ঘটতে পারে সানতুক সে ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। অথচ তিনি কিংবা কাও কেউই ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের পর ভিন্নমতের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ঠেকাতে পারেননি।

সানতুক এভাবে একটি পেশাদার ও অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে 'র'-এর সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে তিনি কাঠামো পরিবর্তনে মোরারজি দেশাইর হামলার হাত থেকে সংস্থাটিকে রক্ষা করতে পারেননি। দেশাই সরকার এই ধারণা নিয়ে ক্ষমতায় আসে যে, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে কাও সংস্থাটিকে অতিকায় করে ফেলেছেন এবং এটার এতটা স্ফীতির প্রয়োজন নেই। কাওয়ের অধীনে 'র'-এর দ্রুত বিস্তারকে উদ্বেগ ও ঈর্ষার সাথে প্রত্যক্ষ করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং তার আকার-আকৃতি পরিবর্তনের ব্যাপারে চাপ দিতে থাকে।

'র' অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল না– এটা মোররাজি দেশাই দ্রুত

উপলব্ধি করতে পারলেও তিনি এই মর্মে ব্যাপক সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে, জরুরি অবস্থার সমালোচনা করা প্রবাসী ভারতীয়দের হয়রানি করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী 'র'-কে ব্যবহার করেছিলেন। কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও দেশে ফেরেননি পাশ্চাত্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী 'র'-এর এমন কিছু সাবেক কর্মকর্তার বানোয়াট গল্পের কারণে মোরারজি দেশাইর এই সন্দেহ আরও জোরালো হয়। তারা দেশাই ও নয়া সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তার কাছে 'র'-এর বিদেশে কর্মরত কিছু কর্মকর্তা কর্তৃক হয়রানির শিকার হন বলে অভিযোগ করেন।

এর ফলে মোরারজি দেশাই এই সংস্থাটিকে ব্যাপকভাবে কাটছাঁট করে ফেলার ব্যাপারে অটল থাকেন। প্রথমদিকে তিনি এর বাজেট ৫০ ভাগ কমানোর নির্দেশ দিলে সে মোতাবেক জনবলও কমিয়ে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি ৫০ ভাগ কমানোর ব্যাপারে জোর না দিলেও বড় ধরনের কাটছাঁটের কথা বলেন। তবে তিনি কত কমাতে হবে তা উল্লেখ করেননি।

সানতুক তার নির্দেশে নতুন করে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ, শূন্যপদ ও বিদেশের বহু কেন্দ্র বাতিল এবং সদর দফতরে কাওয়ের সৃষ্ট কিছু শাখা তুলে দেন। তুলে দেয়া এসব শাখার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক শাখা এবং তথ্য শাখা। রাজনৈতিক শাখার কাজ ছিল মুক্ত সোর্সের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশগুলোর পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদি মূল্যায়ন। তথ্য শাখার কাজ ছিল জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত ভারতীয় মিডিয়ার সংবাদ মনিটর করা এবং মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে সেগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করা।

এসব পদক্ষেপের ফলে 'র' ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যেমন ছোট ছিল আবার তেমনটি হয়ে পড়ে।

পরিচ্ছেদ : আট

না থেকে হ্যাঁ

'র'-এর ডাইরেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই সানতুক মোরারজি দেশাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। এই সুসম্পর্কের পেছনে একটি কারণ ছিল। সানতুক ছিলেন গুজরাটি ভাষাভাষী পারসিক এবং মোরারজি দেশাই যখন অবিভক্ত বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সে সময় তিনি বোম্বে রাজ্য পুলিশ বিভাগে তার চাকরি জীবন শুরু করেন। তিনি কত সার্থকতার সাথে মোরারজি দেশাইয়ের কাছে সংস্থাটির উজ্জ্বল ভাবমর্যাদা তুলে ধরেন সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। জরুরি অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব পরলোকগত এলপি সিংয়ের নেতৃত্বে যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটির টার্মস অব রেফারেন্সে শুধু আইবি এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) কার্যক্রম তদন্তের কথা বলা হয়েছিল। 'র'-কে এতে টার্গেট করা হয়নি।

সংস্থাটির ভবিষ্যৎ আকৃতি ও কর্মকাণ্ড কী হবে সে ব্যাপারে নয়া সরকারের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে কোনো মতৈক্য ছিল না। মোরারজি দেশাই চেয়েছিলেন এটিকে ব্যাপকভাবে কাটছাঁট করতে। চরণ সিং আবার এর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, এতে সংস্থাটির পেশাগত দক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে। বাজপেয়ি ওই সব দেশের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ দেয়ার কথা বলেন, যেখানে ভারত থেকে বেশিসংখ্যক লোক অভিবাসী হয়ে গেছে। ফলে সংস্থাটির ভবিষ্যৎ আকৃতি ও দায়দায়িত্বের ব্যাপারে সদর দফতর থেকে আসা নির্দেশে পরিবর্তন আসতে থাকে। ওই সময় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে যার দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেত সে অনুযায়ী সংস্থায় পরিবর্তন হতে থাকে। কাওয়ের ব্যাপারেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা ছিল। মোরারজি দেশাই তার প্রতি শীতল ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন। চরণ সিং প্রথমে তার প্রতি শীতল মনোভাব পোষণ করলেও পরে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। অবসর গ্রহণের অনেক পর কাও আমাকে বলেছিলেন, তার প্রতি বাজপেয়ির মনোভাব ছিল বিদ্বেষপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক। নায়ারের কাছে দায়িত্বভার হস্তান্তর করে কাও যখন বাজপেয়ির সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে যান তখন বাজপেয়ি তাকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে, বিরোধী দলে থাকাকালে কাও তার

বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতেন এবং তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীকে তথ্য দিতেন। তিনি এ অভিযোগের ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানালে বাজপেয়ি তাকে এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলেন, যা তার মনে আঘাত দিয়েছিল। তিনি মোরারজি দেশাইয়ের সাথে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করে সেখানে তার প্রতি বাজপেয়ির আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তার কথা শুনে মোরারজি দেশাই জবাবে বলেছিলেন, ওই ভাষায় কথা বলাটা বাজপেয়ির পক্ষে শোভনীয় ছিল না। তিনি এ নিয়ে বাজপেয়ির সাথে কথা বলার ব্যাপারে কাওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন। বাজপেয়ি আবার কাওকে ডেকে পাঠান এবং মোরারজি দেশাইয়ের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য ভর্ৎসনা করেন।

পরের বছরগুলোতে কাওয়ের প্রতি বাজপেয়ির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি কাওকে বেশ শ্রদ্ধার সাথে দেখতে শুরু করেন। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাজপেয়ি এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কাওয়ের সাথে নিজে থেকে কথা বলার উদ্যোগ নেন। তিনি কাওয়ের সাথে কথা বলেন এবং তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। ১৯৯৯ সালে কারগিল রিভিউ কমিটি (কেআরসি) কারগিল যুদ্ধের আগে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ত্রুটি খুঁজে বের করলে কাও কেআরসি'র নেতিবাচক মন্তব্যগুলোর ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে বাজপেয়ির কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। পত্র পাঠের পর বাজপেয়ি কাওকে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন।

মোরারজি দেশাই একজন মজার লোক ছিলেন। তিনি প্রায়শ কর্মকর্তাদের ধমক দিয়ে কাজ করাতেন। আবার যেসব কর্মকর্তা ধমক খেয়েও তাদের অবস্থানে অনড় থাকতেন তাদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অন্যদিকে যেসব কর্মকর্তা ধমক খেয়ে কাজ করতেন তাদের ব্যাপারে তিনি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সরকারি সফরে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স গিয়েছিলেন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি সেখানে 'র'-এর স্টেশন চিফকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্রিফ করতে বলেন। 'র'-এর সেই কর্মকর্তা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি লিখিত নোট তৈরি করেন এবং সে নোটের সহায়তায় মোরারজি দেশাইকে ব্রিফ করেন। দেশাই নোটটি তার পকেটে রেখে বলেন, তিনি সেটি দেশে ফেরার পথে বিমানে পড়ে দেখবেন। 'র' কর্মকর্তা দেশাইকে বলেন, তার ব্যক্তিগত কাজকর্মসংক্রান্ত এত স্পর্শকাতর ও বিস্তারিত বর্ণনা সংবলিত এই নোট বহন মোরারজি দেশাইয়ের নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে এবং তিনি সেটি তাকে ফেরত দিতে পীড়াপীড়ি করেন। তিনি কূটনৈতিক ব্যাগে করে সানতুকের মাধ্যমে সেটি তাকে পাইয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এতে মোরারজি দেশাই রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'আমার কাছে নিরাপত্তার কথা বলো না। আমি নিরাপত্তা বিষয়ে তোমার চাইতে বেশি জানি। আমি বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী এবং বহু বছর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছি। নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো সবক তোমার কাছ থেকে নেয়ার প্রয়োজন আমার নেই।' তারপরও ওই কর্মকর্তা নোটটি তাকে ফেরত দিয়ে পরে সেটি তার কাছ থেকে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূটনৈতিক ব্যাগে করে

সানতুককে নোটটি পাঠিয়েছিলেন এবং সাথে একটি স্মারক যুক্ত করেন, যাতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কী ব্যাপার ঘটে সেটির বর্ণনা ছিল। তিনি সানতুককে নোটটি প্রধানমন্ত্রীকে দেয়ার অনুরোধ জানান। সানতুক পরে 'র'-এর ওই কর্মকর্তার কাছে লিখেন, মোরারজি দেশাইকে নোটটি হস্তান্তরের পর তিনি তার প্রশংসা করে বলেন, 'সে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ধমকে নতিস্বীকার না করে স্বীয় কর্তব্যে অটল ছিল।'

মোরারজি দেশাই লন্ডন থেকে প্যারিস পৌছার আগে 'র'-এর ওই কর্মকর্তা আমাকে লন্ডন থেকে টেলিফোনে মোরারজি দেশাইয়ের সাথে তার যে ব্যাপারটি ঘটেছিল সেটির বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, 'রমন, তিনি যদি আপনার স্পর্শকাতর অপারেশনের ব্যাপারে আপনাকে ব্রিফ করতে বলেন তাহলে তাকে শুধু মৌখিকভাবে বলবেন। কোনো লিখিত নোট তৈরি করবেন না।' সৌভাগ্যক্রমে দেশাই প্যারিসে মাত্র একদিন ছিলেন। তিনি সেখানকার ভারতীয় কমিউনিটির লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি জিসকার্ডের দেয়া ভোজে অংশগ্রহণ করে ব্যস্ত সময় কাটান। তিনি আমাকে আমার কাজকর্ম সম্পর্কে তাকে ব্রিফ করতে ডাকেননি। তিনি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে অবস্থান করেন।

মোরারজি দেশাই প্যারিস পৌছার আগে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ এলিসি নৈশভোজে তাকে কী খেতে দেবে সে নিয়ে সমস্যায় পড়ে। তারা দেশাইয়ের বিশেষ খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানত। এ ব্যাপারে তারা ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে। দূতাবাস তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও ফল এবং দুধ আর গুড়ের তৈরি মিষ্টি পরিবেশনের পরামর্শ দেয়। এলিসি তাদের জানায়, বাদাম ও ফলের ব্যাপারে তাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যায় পড়েছে গুড়ের মিষ্টি তৈরিতে। রাষ্ট্রদূতের পত্নী এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। তিনি দুধ ও গুড়ের তৈরি মিষ্টি মোরারজি দেশাইকে পরিবেশন করার জন্য এলিসি প্রাসাদে পাঠানোর আশ্বাস দেন। এলিসি প্রাসাদ আরও জানতে চায়, অন্যান্য অতিথিকে মদ ও স্যাম্পেন সমেত অনিরামিষ খাদ্য পরিবেশন করলে দেশাইয়ের কোনো আপত্তি থাকবে কি না। এ ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি থাকবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়। আমাকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে তাতে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে জানান, মোরারজি দেশাই যেভাবে নির্দ্বিধায় বাদাম ও ফল খাচ্ছিলেন এবং তার পাশেই অন্য অতিথিদের মদ ও স্যাম্পেন সমেত সিক্স-কোর্স ডিনার খেতে দেখেও তার মধ্যে সামান্যতম বিব্রতকর ভাবের উদয় না হতে দেখে তারা খুশি হন।

পরের দিন সকালে তাকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়ার জন্য বিদায় জানানোর পর আমি রাষ্ট্রদূত ও তার পত্নীর সাথে তাদের বাসায় যাই। তার বাসা ত্যাগের পর রাষ্ট্রদূত আমাকে পানীয় পান করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। চাপরাসি তা পরিবেশন করতে গেলে রাষ্ট্রদূতের পত্নী চাপরাসিকে বলেন, 'নতুন গ্লাস দিয়েছ তো?' তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার খুব একটা মনে পড়ছে না প্রধানমন্ত্রী কোন গ্লাস ব্যবহার করেন (নিজের প্রস্রাব পানের জন্য)। তাই আমি চাপরাসিকে সব ব্যবহৃত গ্লাস ফেলে দিয়ে নতুন গ্লাস নিয়ে আসার জন্য বলি।

আমার প্যারিস অবস্থানকালে প্যারিস সফরকারী মোরারজি দেশাইয়ের

মন্ত্রিসভার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন বাজপেয়ি। সরকার ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে চীনে বদলি করেন। ফলে পদটি শূন্য ছিল। প্যারিস মিশনের প্রধান ছিলেন একজন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ)। তিনি ছিলেন ভারতীয় ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তা। বাজপেয়ির স্টাফ অফিসার সিডিএকে বলেন, মন্ত্রী সরকারের নীতিমালা ব্যাখ্যা করার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে আগ্রহী। সিডিএ প্রেস কনস্যুলারকে রাষ্ট্রদূতের বাসায় চা-নাস্তা খেতে খেতে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে বলেন। প্যারিসে কয়েকজন ব্রিটিশ, মার্কিন ও ইসরাইলি সাংবাদিকের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় আমাকে প্রেস কনস্যুলারকে সাহায্য করতে বলা হয়। প্রথম দিকে সিনিয়র সাংবাদিকরা আসার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। তারা ভারতকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। আমি তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে আসতে রাজি করাই। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হয়। তাদের সবাই যথাসময়ে আসেন। বেশ জনাকীর্ণ হয় সংবাদ সম্মেলন। কিন্তু বাজপেয়িকে কোথাও দেখা গেল না। তিনি তার হোটেল কক্ষে ছিলেন না। তার ব্যক্তিগত স্টাফের কেউই বলতে পারেননি তিনি কোথায় গেছেন। আমরা সবাই রাত ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তখনও তিনি আসেননি। এটা ছিল একটা চরম বিব্রতকর পরিস্থিতি। আমরা সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সভা ভেঙে দিই। বাজপেয়ি ১০টার দিকে তার হোটেল কক্ষে ফিরে আসেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে না পারার জন্য বাজপেয়ি সাংবাদিক এবং দূতাবাসের স্টাফ কারো কাছেই ক্ষমা চাননি। তাছাড়া কেউ বলতে পারেননি তিনি কেন আসতে পারলেন না। কিংবা কোথায় ছিলেন। তবে একটি জল্পনাকল্পনা ছিল যে, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ইসরাইলি কর্মকর্তার সাথে প্যারিসের বাইরে গোপন বৈঠক করতে গিয়েছিলেন। ওই কর্মকর্তা প্যারিস আসেন বাজপেয়ির সাথে সাক্ষাৎ করতে।

বাজপেয়ি ইন্ডিয়া মিশন ইউনিভার্সিটিতে ভারতীয় প্রবাসীদের সাথেও কথাবার্তা বলেন। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে 'র'-এর কর্মকাণ্ডে ভারত সরকার যেসব পরিবর্তন এনেছে সেগুলোর কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ভবিষ্যতে 'র' কর্মকর্তারা বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের হয়রানি করবে না। তিনি আরও বলেন, আমি জানি এখানকার 'র' কর্মকর্তারা আপনাদের অবশ্যই হয়রানি করে থাকবেন। ভবিষ্যতে আর এরূপ হবে না। এ সময় উপস্থিত লোকজনের অনেকেই 'না' বলে চিৎকার করে ওঠেন। বাজপেয়ি বলেন, আমি বিস্মিত। আমি যেখানেই যাই সেখানেই ভারতীয় প্রবাসীরা আমাকে জরুরি অবস্থানকালীন 'র'-এর আচরণের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এখানে 'র' কর্মকর্তা কে আছেন? আপনারা তার ব্যাপারে অভিযোগ করছেন না কেন? আপনারা কি তার ভয়ে ভীত? আবারো কিছু লোক চিৎকার দিয়ে বললেন, না। বাজপেয়ি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, এখানে ভারতীয় দূতাবাসে 'র'-এর কোনো কর্মকর্তা নেই? আমি বললাম, আমার জানা মতে কেউ নেই। পরদিন বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে বাজপেয়ি কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য চেম্সারিতে আসেন। আমাকে তার কাছে একজন 'র' কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। বাজপেয়ি বলেন, কিন্তু গতকাল তো

আপনি মিটিংয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন প্যারিসে 'র'-এর কোনো কর্মকর্তা নেই। আমি চুপ থাকলাম।

ইরান ও পাকিস্তানের ব্যাপারে দু'টি ঘটনা 'র'-এর প্রতি মোরারজি দেশাইয়ের নেতিবাচক মনোভাবকে ইতিবাচক করতে সহায়তা করে। ইরানের ঘটনাটির সাথে আমার কিছু ভূমিকা ছিল। পাকিস্তানের ব্যাপারটি ছিল এই যে, পাকিস্তান ড. এ কিউ খানের সহায়তায় কাহুতায় গোপনে একটি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প স্থাপন করছিল, যেটি 'র' শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

১৯৭৮ সালে ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী ও ছাত্র এই তিন শক্তি একযোগে ইরানের শাহ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রদের মধ্যে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের অনেকেই তুদেহ পার্টি নামের ইরানি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল। তাদের গ্রেফতার করা সদস্যদের ওপর শাহের গোয়েন্দা সংস্থা সাভাক নির্যাতন করে। আবার কেউ কেউ প্যারিস চলে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়। শাহের সাথে সুসম্পর্ক সত্ত্বেও ফ্রান্স শাহবিরোধী সব ছাত্রকে আশ্রয় দেয়। ওই সময় ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাদ্দাম হোসেন। তিনি ইরাকে বসবাসরত আয়াতুল্লাহ খোমেনি ও তার অনুসারীদের তার দেশ থেকে চলে যেতে বলেন। এ অবস্থায় আয়াতুল্লাহ খোমেনি এবং তার অনুসারীরা ফ্রান্সে যেতে চাইলেও সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়। প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি জিসকার্ড এই আপত্তি অগ্রাহ্য করে খোমেনি ও তার অনুসারীদের নিজ দেশে আশ্রয় দেন। খোমেনি ও তার অনুসারীরা ফ্রান্স পৌঁছে প্যারিসের কাছে নিউফল লি চাটু নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। খোমেনির আগমনের পর ইউরোপের শাহবিরোধীরা তার পাশে সমবেত হয়। আয়াতুল্লাহ খোমেনি ফ্রান্স থেকে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের দিকনির্দেশনা দিতে থাকেন। আয়াতুল্লাহ খোমেনির ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আপত্তি সত্ত্বেও ইরানের তুদেহ পার্টির সমর্থকরা তাকে সমর্থন দেন।

আমি তুদেহ পার্টির সমর্থক ছাত্রদের একজনের সাথে তার এক বন্ধুর বাসায় দেখা করি। ওই ছাত্রের নাম ছিল আলী। আলীর মাধ্যমে আমি প্যারিসে শাহবিরোধী আরও অনেক ইরানি ছাত্রের সাথে পরিচিত হই। আলী মধ্যবিত্ত এক পরিবারের সন্তান। প্যারিসে তিনি হতদরিদ্র অবস্থার মধ্যে ছিলেন। পরে প্রায়শ আমার সাথে আলী খাওয়া-দাওয়া করতেন। এক রাতে তিনি আমাকে ফোন করে বলেন, তার আলসারজনিত অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে ব্যাপক রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি আরও জানান, হাসপাতালে যাওয়ার মতো অর্থ তার কাছে নেই। আমি দেরি না করে তার বাসায় গিয়ে পৌঁছি এবং তাকে আমার গাড়িতে করে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাই। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নেয়ার পর হাসপাতালের সমুদয় বিল আমি পরিশোধ করি। এতে আলী আমার অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তার মাধ্যমে আমি আয়াতল্লাহর অনেক ঘনিষ্ঠ সহচরের সাথে পরিচিত হই। প্যারিসের কূটনীতিক ও সাংবাদিক মহলে এই মর্মে বলাবলি হতো যে, কিছু ইসরাইলি কূটনীতিক ও সাংবাদিক এবং আমিই ছিলাম মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অন্যতম যারা সঠিক পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলেন যে, শাহের দিন ঘনিয়ে এসেছে এবং তার পতন কেবল সময়ের ব্যাপার

মাত্র। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপ অবশ্য তখনও এ রকম কিছু একটা আশা করছিল যে, শাহ কোনো রকমে হলেও ক্ষমতায় থেকে যাবেন এবং ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবেন। আমি নিয়মিত এ সম্পর্কে সানতুকের কাছে আমার প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন পাঠাতাম।

আরও একজন ছিলেন যিনি একই ধরনের মূল্যায়ন করেন। তবে তিনি সেটা করেছিলেন নিজে নিজে। ওই ব্যক্তি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। তিনি ভারতের শিয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আমার রিপোর্ট ও মূল্যায়ন কোনোভাবেই তাকে প্রভাবিত করেনি। তিনি প্রভাবিত হন ভারতে শিয়া নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে নিয়মিত পাওয়া রিপোর্টের দ্বারা। আমি আমার চাকরি জীবনে এবং পরে একটা বিষয় জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে গোয়েন্দাদের চাইতেও অনেক বেশি জানতেন। এ বিষয়ে আমি একাধিক দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি। যেমন ইন্দিরা গান্ধী শ্রীলঙ্কার ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে আইবি এবং 'র'-এর চাইতে বেশি খবর রাখতেন।

১৯৮০-র দশকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আগেই তিনি শ্রীলঙ্কা সরকার ও সিংহলি চরমপন্থীদের এই পরিকল্পনার ব্যাপারে জেনে যান যে, চরমপন্থীদের হাতে নিহত কলম্বোর বিরাট সংখ্যক তামিলের লাশ গোপনে পুড়িয়ে ফেলার পরিকল্পনা চলছে। ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ইউরি আন্দ্রোপভ মারা যাওয়ার পর মস্কো থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়ার আগেই তিনি সেটা জানতে পেরেছিলেন। ১৯৮৮ সালে রাজিব গান্ধী 'র'-এর আগেই জানতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে বহনকারী বিমান বাহিনীর বিমানটি বাহাওয়ালপুর থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয়েছে। ১৯৯০ সালের আগস্টে ভিপি সিং 'র'-এর আগেই জানতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে সে দেশের প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মির্জা আসলাম বেগের ইন্ধনে বরখাস্ত করছেন। চন্দ্র শেখর নেপালের ব্যাপারে 'র'-এর চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

১৯৭৮ সালের শেষ দিকে মোরারজি দেশাই 'র'-এর তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই নিজে নিজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ইরানের ইসলামি বিপ্লব ঠেকানো সম্ভব হবে না। তিনি আয়াতল্লাহ খোমেনির সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাকে ভারত সরকারের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। তিনি ভারতের একজন শিয়া নেতাকে আয়াতল্লাহ ও অশোক মেহতার মধ্যে একটি গোপন বৈঠকের আয়োজন করার জন্য প্যারিস পাঠান। অশোক মেহতা ইন্দিরা গান্ধীর অধীনে পরিকল্পনা কমিশনে ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। খোমেনি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও তিনি এই আলোচনা গোপনে হওয়ার দরকার নেই বলে জোর দেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন, মোরারজি দেশাই নিজেকে গোপন করতে চাইছেন এই ভেবে যে, পাছে আবার শাহ বিপ্লব নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হন কিনা। ওই শিয়া নেতা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোনো ধরনের সাফল্য ছাড়াই

ভারতে ফিরে আসেন।

এর অল্প কিছু দিন পর আমি প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে একটি অতি গোপন চিঠি পাই। চিঠিতে বলা হয়, আশোক মেহতা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা প্যারিসের পথে রয়েছেন এবং আমাকে আয়াতল্লাহর সাথে তার একটা গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের একটি বৈঠকের আয়োজন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না সে ব্যাপারে চিঠিতে কিছু জানতে চাওয়া হয়নি। ধরে নেয়া হয় যে আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ ধরনের স্পর্শকাতর অপারেশনাল নির্দেশনা স্বাভাবিক নিয়মে 'র' প্রধানের মাধ্যমে আসত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সানতুক এ ধরনের একটি চিঠি যে ইস্যু করা হয়েছে সেটাই জানতে পারেননি। আমি এই চিঠির একটি জবাব প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে পাঠাই এবং তার একটি কপি সানতুককে দিই। চিঠিতে আমি এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করি যে, এ ধরনের একটি বৈঠকের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছাড়াই আমার পক্ষে এর আয়োজন করা সম্ভব কি না তা জানতে না চেয়েই আমাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ইতোমধ্যেই অশোক মেহতা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে প্যারিসের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সানতুক আমাকে চিঠির জবাবে বলেন, কাজটি করো। সফল হলে মনে করবে 'র'-কে সাহায্য করতে পারলে।

আমি আলীর সাথে তার বাসায় দেখা করলাম। তাকে আমি বিষয়টি জানালাম এবং বললাম 'এর সাথে আমার ব্যক্তিগত মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। এ কাজে ব্যর্থ হলে আমার সুখ্যাতি-যশ মাঠে মারা যাবে।' আলী সাথে সাথে খোমেনির অবস্থানস্থলে গিয়ে সেখানে তার সিনিয়র উপদেষ্টাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা ফের গোপন বৈঠকের ব্যাপারে তাদের আপত্তির কথা জানান। তখন তিনি খোমেনির সাথে দেখা করে আমি কিভাবে তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছিলাম সে বর্ণনা দেন। এ কথা শুনে খোমেনি তার উপদেষ্টাদের ডেকে অশোক মেহতা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তার সাথে গোপন বৈঠকের আয়োজন করার নির্দেশ দেন। বৈঠক সুন্দরভাবে চলে। আমি নিজে আলোচনায় অংশ নেইনি। কিন্তু আমার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি পুদুচেরির একজন ফরাসি ভাষাভাষী কর্মকর্তা এই আলোচনায় অংশ নেন। অশোক মেহতা পরে আমাকে হোটেল স্যুটে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ কাজে সফল হওয়ায় আমাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, খোমেনি ভারতের ব্যাপারে ইতিবাচক ও পাকিস্তানের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সানতুকের কাছে একটি প্রতিবেদনে কিভাবে আমি এ কাজে সফল হই তার বর্ণনা দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠিতে তার আন্তরিক শুভেচ্ছার কথা জানান এবং এ ঘটনার পর 'র'-এর ব্যাপারে মোরারজি দেশাইর মনোভাবে ব্যাপক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন।

অপর যে ঘটনাটি 'র'-এর ব্যাপারে দেশাইয়ের মনোভাব পরিবর্তনে সহায়তা করে সেটি ছিল 'র'-এর সায়েন্স ও টেকনোলজি ডিভিশন (এসঅ্যান্ডটি) কর্তৃক কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য (টেকইন্ট) সংগ্রহ। এ ডিভিশনের প্রধান ছিলেন ড. সান্তানম। ১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার পরপরই কাও তাকে নিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান

অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন থেকে। কাও তাকে এসঅ্যান্ডটি'র দু'নম্বর ব্যক্তি বানিয়েছিলেন। পরে তিনি এ বিভাগের প্রধান হন। মনিটরিং শাখার সংগ্রহকৃত টেকইন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতেন ড. সান্তানম। তার চমৎকার বিশ্লেষণের কারণেই 'র' পাকিস্তানের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারে। সান্তানমই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ধরতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান তার প্লুটোনিয়াম রিপ্রসেসিং প্লান্টের বাইরেও কাহুতায় গোপনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণ করছে। সান্তানমের নেতৃত্বে এসঅ্যান্ডটি শাখা কাহুতায় প্লান্ট নির্মাণ এবং গোপন সংগ্রহ সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবরসহ পাকিস্তানের সামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে মনিটর করত। সান্তানম এসব বিষয়ে মোরারজি দেশাইকে অবহিত রাখতেন। এর ফলেও 'র'-এর ব্যাপারে মোরারজি দেশাইয়ের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ এবং ক্ষমতা সুদৃঢ় করার আগ পর্যন্ত জেনারেল জিয়াউল হক ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে উত্তেজনা পরিহার করে চলার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তিনি মোরারজি দেশাইয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে ফোনে কথা বলতেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বহু সিনিয়র কর্মকর্তার মতো জিয়াও তোষামোদে ওস্তাদ ছিলেন। তিনি প্রায়ই দেশীয় ওষুধ ও ইউরিন থেরাপির ব্যাপারে কথা বলার ভান করে দেশাইকে ফোন করতেন। তোষামোদে দেশাই বেশ তুষ্ট হতেন। জিয়াউল হক দৃশ্যত আন্তরিক কণ্ঠে দেশাইকে প্রশ্ন করতেন, 'মান্যবর, আচ্ছা বলুন তো একজন লোকের দিনে কয়বার প্রস্রাব সেবন করা উচিত? আর এটা কি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরের প্রস্রাব নাকি দিনের যেকোনো সময়ের হলেই হয়?' একদিন এক অসাবধান মুহূর্তে এরূপ আলোচনাকালে দেশাই জিয়াউল হককে পাকিস্তানের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপারে তার অবহিত থাকার কথা বলে দেন। আর এভাবেই অসাবধান রাজনীতিকরা গোয়েন্দা পেশার জন্য অনিবার্য পেশাগত সমস্যা সৃষ্টি করে থাকেন।

১৯৭৯ সালের শুরুর দিকে সানতুকের নেতৃত্বে 'র' এভাবে সংস্থার ব্যাপারে মোরারজি দেশাইর নেতিবাচক ধারণা দূর করতে সক্ষম হয়। এর পর ক্ষমতাসীন জনতা পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের পর চরণ সিং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইন্দিরা গান্ধী এই পরিস্থিতিকে তার অনুকূলে কাজে লাগান। তিনি সরকারকে ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করেন। ওই নির্বাচনে ফের ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। ইন্দিরা গান্ধী তিন বছরের ব্যবধানে আবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চরণ সিংয়ের সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে 'র'-তে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি।

পরিচ্ছেদ : নয়

ক্ষমতায় আবার ইন্দিরা

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী যে ক্ষমতায় ফিরে আসছেন তা আমি আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম। আমি প্যারিসে থাকাকালে সিবিআই'র একটি তদন্ত টিম জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা এবং তার দল কংগ্রেসের একটি ফরাসি তেল কোম্পানি থেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ তদন্ত করতে প্যারিস আসে। এ তদন্তের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম না, তবে তদন্ত কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তিনি প্যারিসে আমার বাসায় এক দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমরা তখন ইন্দিরার এ মামলার তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আমার মনে আছে বারবার আমি বলছিলাম 'এখানে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই পাওয়া যাবে না। আন্দাজ-অনুমানসর্বস্ব প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তাকে অপদস্ত ও হয়রানি করা ঠিক হচ্ছে না। ইন্দিরা গান্ধী এতে জনগণের সহানুভূতি পাচ্ছেন এবং আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে তা তাকে সাহায্য করবে।' কিন্তু আমার বন্ধু তদন্ত কর্মকর্তা শাস্তি হওয়ার মধ্য দিয়েই ইন্দিরার মামলার সমাপ্তি ঘটবে বলে অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তার (ইন্দিরা) রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে।' তদন্ত কর্মকর্তার এভাবে পছন্দ-অপছন্দের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। এটি তার বস্তুনিষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং তদন্তকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের সমন্বয় ও তদারককারী চরণ সিং এমন সতর্কভাবে তদন্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করেন যাতে তার কর্মকাণ্ডের সমালোচকদের হাতে এ দায়িত্ব যায়। ইন্দিরার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের ব্যাপারে এই অতিমাত্রার আগ্রহ মামলাকে দুর্বল করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত এর সুবিধা ইন্দিরা গান্ধীর হাতেই যায়। জনগণ জরুরি অবস্থা চলাকালে তার বাড়াবাড়ি ভুলে যায় এবং ভোট দিয়ে তাকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ইন্দিরা গান্ধী আইবি ও সিবিআই প্রধান হিসেবে মোরারজি দেশাই মনোনীত দু'জনকে সরিয়ে দিয়ে তার পছন্দের দু'জনকে বসান। আমাদের অনেকের ধারণা ছিল তিনি 'র' প্রধান সানতুককেও সরিয়ে দেবেন। সানতুকও মোরারজি দেশাইয়ের মনোনীত ছিলেন এবং তার সাথে ভালো সমঝোতা তৈরি হয়েছিল। বিস্ময়করভাবে ইন্দিরা তাকে পরিবর্তন করেননি। ১৯৮৩

সালের মার্চ মাসে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি 'র' প্রধান হিসেবে বহাল ছিলেন। এর পেছনে দু'টি কারণ কাজ করতে পারে। প্রথমত, সানতুক ছিলেন একেবারেই রাজনৈতিক পক্ষপাতমুক্ত একজন পেশাদার কর্মকর্তা। তাকে নিয়ে কোনো বিতর্কই ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন কাওয়ের পুরোপুরি আস্থাভাজন কর্মকর্তা। দেশাই সরকারের হাতে অকারণে যাতে কাও হেনস্থা না হন সে বিষয়টি সানতুক নিশ্চিত করেন। ১৯৭৭ সালে 'র' থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮১ সালে কাও কেবিনেট বিভাগের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে ইন্দিরা প্রশাসনে আবার ফিরে আসেন। তবে এরপর তিনি ইন্দিরার অনানুষ্ঠানিক উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেন। 'র'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত কোনো উদ্বেগ দেখা দিলে এ নিয়ে ইন্দিরা কাওয়ের সাথে পরামর্শ করতেন। কাওয়ের নীরব সমর্থন সানতুকের 'র' প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। তবে মোরারজি দেশাইয়ের কাছে যে রকম প্রবেশাধিকার সানতুকের ছিল সে রকম ছিল না ইন্দিরার ক্ষেত্রে। তিনি রুটিন বিষয়গুলোও আদেশের জন্য কাওয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে দ্বিধা করতেন না।

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার আগে জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ি নিয়ে বিচারপতি শাহ কমিশন ও এলপি সিং কমিটির উদ্যোগে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন তদন্ত কার্যক্রম এবং সিবিআই'র নানা ধরনের অনুসন্ধানের সাথে বিভিন্ন বিভাগে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন নতুন করে ক্ষমতায় আসার পর তাদের খুঁজে বের করার কাজ শুরু হয়। এসব তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজের সাথে যুক্ত চাকরিরত কর্মকর্তাদের একটি কালো তালিকা তৈরির ব্যাপারে ইন্দিরা ও তার দলকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে আইবি। ইন্দিরার প্রথম কয়েক মাস পেরিয়ে যায় ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে যারা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে মনে হয়েছে তাদেরকে শায়েস্তা করার কাজে।

'র' প্রধান সানতুক কাওয়ের সহায়তায় যেকোনো বৈরী পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও তার দ্বিতীয় ব্যক্তি পরলোকগত শিব রাজ বাহাদুরসহ চারজন সিনিয়র আইপিএস কর্মকর্তাকে ইন্দিরা গান্ধীর নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তার এবং তার সহযোগীদের কাছে পৌঁছা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে তদন্ত ও অনুসন্ধান কার্যক্রমে ভূমিকা রাখার অনির্ভরযোগ্য তথ্য ও কাহিনী শোনে তাদেরকে 'র' থেকে সরিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়। আইপিএস-এর এবং উড়িষ্যা ক্যাডারের একজন জনপ্রিয় লো-প্রফাইল ও অবিতর্কিত কর্মকর্তা ছিলেন শিব রাজ বাহাদুর। ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণের আগে 'র' প্রধান থাকাকালে কাওয়ের স্টাফ অফিসার হিসেবেও কিছু দিন কাজ করেছিলেন তিনি। কাও সবসময় তার প্রতি সুধারণা পোষণ করতেন। এরপরও তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক অবজ্ঞার হাত থেকে বাহাদুরকে রক্ষা করতে পারেননি। বাহাদুরের প্রতি কাওয়ের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইন্দিরা তাকে উড়িষ্যায় ফেরত না পাঠিয়ে অবসরের আগ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পুলিশের প্রধান পদে বহাল থাকার রেয়াতটুকু অবশ্য দিয়েছিলেন।

১৯৮০ সাল ছিল 'র'-এর জন্য বাজে সময়। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পর সংস্থাটির অনেক প্রতিষ্ঠাতা কর্মকর্তার ব্যাপারে হয় কমিশন গঠন নয়তো বিদায় করে দেয়ার ঘটনা ঘটে। 'র' গঠিত হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী এর নিয়োগ, পদোন্নতি ও বিদেশ ভ্রমণে বরাদ্দ দানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন অব পাবলিক সার্ভিসের (ইউপিএসসি) বিধিবিধান থেকে অব্যাহতি দান করেন। 'র' প্রধানের দু'টি পদবি ছিল। এ সংস্থার প্রধান হিসেবে তিনি সরাসরি নিয়োগ, পদ সৃষ্টি, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে প্রস্তাব পাঠাতে পারতেন আর কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সচিব হিসেবে তিনিই আবার এ প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদন দিতে পারতেন। 'র' বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কার্যকর ও সফল হয় বলে এর কার্যক্রম যাতে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার কবলে পড়ে প্রলম্বিত না হয় তার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়। এই বিশেষ ছাড় প্রদানের সময় আশা করা হয়েছিল, 'র' প্রধান তার ক্ষমতা গভীর দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োগ করবেন। বছর পরিক্রমায় সংস্থাটির নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতমূলকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে বলে মনে হয়েছে। এ ধারণা সৃষ্টির পেছনে একটি বড় কারণ ছিল র'তে প্রত্যক্ষভাবে যেসব কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজন। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব টিএন কাউলের মতো পদস্থ কর্মকর্তাদের আত্মীয়কে নিয়োগ দানের জন্য বিদেশে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনে বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হয়। এসব কারণে শ্লেষের সাথে র'কে আত্মীয় ও সহযোগীদের সংস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

'র'-এর মানব ব্যবস্থাপনাও ছিল বেশ দুর্বল। পদস্থ কর্মকর্তা এবং জুনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল বিভক্তির স্পষ্ট সীমারেখা। 'র' এমন একটি এলিট সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে যেখানে সিনিয়র ও জুনিয়র কর্মকর্তাদের মতবিনিময়ের সুযোগ ছিল একেবারেই সীমিত। জুনিয়ররা মনে করেন তাদের এবং তাদের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন সিনিয়ররা বোধ করেন না। পদোন্নতিতে অস্বচ্ছতার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। কোনো ব্যক্তিকে তিন বছরের বেশি সময় দিন মজুরিতে নিযুক্ত রাখা যাবে না মর্মে সরকারি বিধান লঙ্ঘন করে 'র'তে বহু বছর ধরে লিফট অপারেটর, ক্লিনার, ক্যাফিটেরিয়া বয়ের মতো বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিকদের দিন-বেতনে নিযুক্ত রাখা হয়, যা তাদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং বিদেশী গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও সিকিউরিটি (সিআইএস) বিভাগের ক'দিন পরপরই তল্লাশি চালানোর বিষয়টিও নিম্ন এবং মাঝারি পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অনুপ্রবেশ রোধের নামে এটি করা হয়ে থাকে। দায়িত্বের অংশ হিসেবে সিআইএস বিভিন্ন শাখায় আকস্মিকভাবে তল্লাশিও চালায়। আবার কেউ গোপনে কাগজপত্র সরিয়ে নিচ্ছে কি না তা দেখার জন্য গেটেও আকস্মিকভাবে তল্লাশি চালানো হয়। এ শাখা মাঝে মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনধারার ওপর নজর রাখে যাতে কেউ তার আয় বা স্বাভাবিক সম্পত্তির বাইরে অধিক ব্যয়বহুল জীবনযাপন করছে

কি না তা দেখা যায়। সিআইএস বিভাগের এসব কাজের সমালোচনা নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমেই বাড়তে থাকে। একই ধরনের বিষয় সিনিয়র কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ না করায় কেবল নিচের ও মাঝারি পর্যায়ের কর্মচারীরাই সংস্থা ও দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এ রকম একটি ধারণা পোষণ করার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে করা হয় সিনিয়র কর্মকর্তারা এসব কিছুর অনেক ঊর্ধ্বে।

১৯৭১-উত্তর সময়ে 'র'-এর ভেতরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেকোনোভাবে কিছু পাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়। কাও এবং সিনিয়র কর্মকর্তারাও এটাকে দেখেও না দেখার মতো করে এড়িয়ে যান। বারবার সতর্ক ঘণ্টা বাজার মতো একের পর এক ঘটনাকে আড়াল করে রাখা হয়। প্রতিবেশী একটি দেশে নিযুক্ত একজন সিনিয়র আইপিএস অফিসার স্থানীয় একটি ক্লাবে সেখানকার এক সেনা কর্মকর্তার সাথে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঝগড়ায় লেগে যায় এবং বাড়ি ফেরার পথে তাকে থামিয়ে স্থানীয় সামরিক অফিসারদের একটি দল বেদম মার দিয়ে ফেলে রাখে। এ ঘটনার পর ভারতীয় হাইকমিশনার তাকে প্রত্যাহার করে দেশে ফেরত পাঠান। একই ব্যাচের আরেকজন আইপিএস অফিসার পশ্চিমের একটি দেশের ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (কনসুলার) পদে থাকার সুযোগ নিয়ে এমইএ'র ছাড়পত্র ছাড়াই সাধারণ পাসপোর্টে তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ওই দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা গ্রহণ করেন। এই কর্মকর্তা তার কাজের মেয়াদ শেষ করার পর 'র' ও আইপিএস থেকে ইস্তফা দেন এবং সে দেশেই অভিবাসন গ্রহণ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর ছুটিতে গিয়ে পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। তারা দেশত্যাগের আগে সিআইএস বিভাগ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এই কর্মকর্তা তার অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন এবং তার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু তার বিদেশযাত্রা ঠেকানোর জন্য এরপরও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ইউরোপে পোস্টিং পাওয়া একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা একজন মাদকাসক্ত ও জুয়াড়িতে পরিণত হন এবং তার চেয়ে অনেক কম বয়সের এক মার্কিন তরুণীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই মার্কিন তরুণীকে সিআইএ'র চর বলে সন্দেহ করা হয়। দিনের পর দিন এই কর্মকর্তা অফিসে অনুপস্থিত থাকেন এবং 'র' সদর দফতর থেকে একের পর এক পাঠানো অপারেশনাল সাঙ্কেতিক বার্তার কোনো জবাব তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কাও এই স্টেশনটি পরিদর্শনে গেলে এ কর্মকর্তার স্ত্রী গোপনে তার সাথে দেখা করেন এবং স্বামীকে বদলি করে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি অভিযোগ করেন, স্বামীর ইউরোপে পোস্টিং তাদের দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় নিয়ে গেছে। এই কর্মকর্তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে অব্যাহতি দেয়া হয়। অন্য দুই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাকে ট্রেনিং বিভাগে তাদের কর্মদক্ষতা সংক্রান্ত নেতিবাচক রিপোর্টকে উপেক্ষা করে বিদেশে নিয়োগ দিয়ে পাঠানো হয়। মাদকাসক্তির কারণে তাদের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়েছিল। এ দুই সামরিক কর্মকর্তার একজন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে। এ দু'জন

পরে বিদেশে থেকে 'র'-এর জন্য যথেষ্ট বদনাম কুড়িয়েছেন। ফলে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে অব্যাহতি দেয়া হয়। 'র' প্রধান কাওয়ের একজন স্টাফ অফিসারকে যুক্তরাষ্ট্রে পোস্টিং দেয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই কর্মকর্তা চাকরির মেয়াদ শেষে আর ফিরে আসেননি। সঙ্করণ নায়ারের একজন স্টাফকে যুক্তরাজ্যে পোস্টিং দেয়ার পর তিনি সেখানেই থেকে যান। আরেকজন জুনিয়র সদস্য তার কাজের মেয়াদ শেষ করার পর পশ্চিম ইউরোপের অভিবাসী হয়ে যান। 'র'-এর নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের এসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বহীন থাকার কারণে কড়া কোনো ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেয়া হয়নি। আর এতে এসব কাজে পরোক্ষভাবে অনুমোদন দেয়ার মতো এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একই সাথে এটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামনে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ইমেজকেও ম্লান করে। আর সেই সাথে শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড উৎসাহিত হয়।

এসবের সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় 'র'-এর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নিজম সৃষ্টি হয় এবং ১৯৮০ সালে এর কর্মচারীদের একটি অংশ ধর্মঘটে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সিআইএস স্টাফদের নিরাপত্তা তল্লাশির বিরুদ্ধে একটি শাখা ধর্মঘট শুরু করে। এ শাখার সদস্যরা সিআইএস প্রধানসহ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান। শেষ পর্যন্ত সংস্থাকে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য দিল্লি পুলিশের সাহায্য চাইতে হয়। পুলিশ এসে ঘেরাও থেকে অবরুদ্ধ কর্মচারীদের উদ্ধার করে। বেশ কিছু দিনের জন্য ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। এ সময় গেটের বাইরে মিছিল-সমাবেশ বিক্ষোভ চলতে থাকে যেখানে 'র'-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করে বক্তব্য রাখা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে সমন্বয়কের ভূমিকা রাখে 'র'-এর কর্মচারীদের একটি সংগঠন।

যে কেউ ভাবতে পারেন এসব ঘটনা 'র'-প্রধান হিসেবে সানতুকের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীকে সংশয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। কর্মচারীদের এই শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা শুধু 'র'-তে সীমিত ছিল এমন নয়। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং সিবিআইতেও এর প্রভাব পড়ে। তবে এ দু'টি সংস্থার অবস্থা 'র'-এর মতো ততটা মারাত্মক ছিল না। কাও'য়ের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী বিশৃঙ্খলা দমন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সানতুকের উদ্যোগে কড়া সমর্থন জোগান। 'লাঠি ও গাজর' নীতির মাধ্যমে সানতুকের পরিস্থিতি মোকাবেলার চতুর কৌশল শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতিকে ধর্মঘটের মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টির দিকে ঠেলে দেয়। সানতুক সংস্থার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যারা বঞ্চিত তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টার পাশাপাশি বিশৃঙ্খলার মূল নায়কদের চাকরিচ্যুত করেন। 'র' এবং আইবি যৌথভাবে গোয়েন্দা সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

মোরারজি দেশাইয়ের সময় সানতুক 'র'-এর ইমেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং এর অবকাঠামো সুরক্ষার জন্য সময় দেন বেশি। 'র'-এর মতো সংস্থার প্রয়োজন নেই এমন এক চিন্তা নিয়ে দেশাই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সানতুকের বেশ কয়েক মাস লেগে যায় তার মধ্যে 'র'-এর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উপলব্ধি সৃষ্টি

করতে। তিনি সংস্থাকে সঙ্কুচিত করার মতো দেশাইয়ের বেশ কয়েকটি আদেশকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রদ করতে সক্ষম হন। এর ফলে নতুন অপারেশনাল উদ্যোগ এ সময়ে নেয়া সম্ভব হয়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় ফিরে আসার পর এক পর্যায়ে সানতুক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মঘটের মোকাবেলা করে স্থির হয়ে বসতে সক্ষম হন। তিনি চাকরি জীবনের বাকি আড়াই বছরে তার কাজে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন এবং সংস্থার অপারেশনাল কাজ আবার শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীবিরোধী অসন্তোষ বিশেষত জুলফিকার আলী ভুট্টো নিহত হওয়ার পর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের প্রতি বৈরী শক্তিগুলোর মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে সক্ষম হন। এ নেটওয়ার্কে ভারতের পক্ষের লোক ছাড়াও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন লোকজনকেও নিয়ে আসা হয়। কাও এবং ইন্দিরা গান্ধীর উৎসাহে ১৯৭১ পূর্ব সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আইবি এবং 'র'-এর যে ধরনের ক্ষমতা ছিল তার মতো করেই পাকিস্তানে গোপন কার্যক্রম চালানোর মতো সক্ষমতা তৈরি করা হয়। সানতুক 'র'-এর কারিগরি ক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেন এবং মনিটরিং শাখা হিসেবে পরিচিত টেকইন্ট শাখাকে আরও সুসংহত করেন। পাকিস্তানের সামরিক পারমাণবিক কর্মসূচিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারার কৃতিত্ব সানতুক ও সান্তানমেরই পাওয়া উচিত।

সানতুক অন্য যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন তা হলো আফ্রিকা। তিনি ছিলেন 'র'-এর আফ্রিকা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ১৯৬৮ সালের আগেও এক বা দু'টি স্বাধীন আফ্রিকান দেশের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা অর্জনের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা গঠনে আইবি সহযোগিতা করে। ঘানার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ড. কাওয়াম নক্রুমার অনুরোধে সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা তৈরিতে সাহায্য করতে কাও এবং সঙ্করণ নায়ার দেশটিতে বেশ কয়েক মাস সময় কাটান। ইন্দিরা গান্ধী চাইতেন এ ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক আফ্রিকাতে চলতে থাকুক। তার উৎসাহে ভারতে অনেক আফ্রিকান দেশের গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে 'র'। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি) এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নামিবিয়ার সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশনকে (সোয়াপো) সহায়তা করতে 'র'-কে উদ্বুদ্ধ করেন। সানতুকের সময় ভারতে অথবা সেসব দেশের সীমান্ত এলাকার গোপন শিবিরে তাদের অনেক ক্যাডারকে 'র' ট্রেনিং দিয়েছে। কয়েকটি আফ্রিকান দেশের গোয়েন্দা সংস্থার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ দানের জন্য 'র'-এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়। সানতুকের পর আর কোন 'র'-প্রধান আফ্রিকার ব্যাপারে সে রকম আগ্রহ দেখাননি। তিনি আফ্রিকান দেশগুলোতে 'র'-এর জন্য ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে বিরল সুনাম নিয়ে আসা বাংলাদেশ একটি বিব্রতকর স্থানে পরিণত হয় 'র'-এর জন্য। 'র'-এর জন্য সেখানে অসহায়ভাবে বিস্মিত হয়ে দেখার মতো ঘটনা ঘটতে থাকে একের পর এক। বাংলাদেশ আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের

জন্য ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশের আশ্রয়স্থল থেকে ত্রিপুরা ও আসামে অন্তর্ঘাত ছড়িয়ে পড়ে। একটি উদার দেশ হিসেবে ভারতের ভাবমর্যাদা সুসংহত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ রকম একটি ধারণা তৈরি হয় যে, ছোট হোক বা বড় হোক যেকোনো প্রতিবেশী শক্তি অর্জন করে ভারতের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এ ধরনের সম্পর্কের জন্য 'র'-কে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতা দেশটির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের দুর্বল ইমেজ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের সামনে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে আছে ভারতে থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে না। বাংলাদেশের মতো এ ধরনের সমস্যার মুখে পাকিস্তানে পড়তে হয় না। বাংলাদেশে এখনো বিপুল সংখ্যক হিন্দু এবং ভারতের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেকোনো অযৌক্তিক ও অন্যায় শক্তি প্রয়োগ হিন্দু ও ভারতপন্থী জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ কারণে বড় ধরনের শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে ভারতের অনীহার সুযোগে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের মধ্যকার ভারতবিরোধী শক্তি নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে তৎপরতাকে আরও বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হয়। আমরা এখনো সেই দুষ্টচক্রকে ভাঙতে পারিনি।

এ সময় ত্রিপুরায় অন্তর্ঘাত ছড়িয়ে পড়া, আসামে গোলযোগপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে ভারতবিরোধী লোকজনের সমর্থন পাওয়ার পাশাপাশি অন্য তিনটি বিষয় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপকদের সামনে বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ বলে মনে হয়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের অনুপ্রবেশ এবং সিআইএ'র পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে আইএসআই'র সহায়তায় সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ। দ্বিতীয়টি ছিল পাঞ্জাবে খালিস্তান আন্দোলনের বিস্তার। আর তৃতীয়টি হলো শ্রীলঙ্কায় তামিলদের মধ্যে অসন্তোষ এবং তা মোকাবেলায় ভারতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারার মত শ্রীলঙ্কা সরকারের কিছু নীতি পদক্ষেপ। ইন্দিরা গান্ধী এমনটি মনে করতেন।

আফগানিস্তানের ঘটনার কারণে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে প্যান ইসলামিক জিহাদ চাঙ্গা হয় এবং পরে ভারতের অন্যান্য অংশেও তা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের সহিংসতা দুই শিখ দেহরক্ষীর হাতে ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ইন্দিরা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং প্রায় ১১ বছর ধরে তা সেখানে রক্তপাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীলঙ্কার ঘটনা লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) জন্ম দেয়। যার কারণে ১৯৯১ সালের মে মাসে রাজিব গান্ধী নিহত হন। আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের সৃষ্ট পরিস্থিতির পেছনে আইএসআই'র ভূমিকা সক্রিয় ছিল। অন্যদিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে আইএসআই'র সমর্থনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ভূমিকার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ছিল।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ভারত ও ইন্দিরা গান্ধীর জন্য উভয় সঙ্কট ডেকে আনে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় ভারতের সাথে

সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল সে রকম যদি আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে ভারত করতে যায় তাহলে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতির সমালোচনা থেকে নয়াদিল্লিকে বিরত থাকতে হয়। অন্যদিকে আফগান জনগণের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হলে ভারত কোনোভাবে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। অতীতে ভারতের ভূমিকা সব সময় আফগান জনগণের প্রতি বন্ধুত্বসুলভই ছিল। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার মস্কোবিরোধী সরকারকে উৎখাত করে সোভিয়েতপন্থী সরকার বসানোর সময় জওহরলাল নেহরু যে ধরনের উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন আফগানিস্তান ইস্যুকে কেন্দ্র করে তেমন এক পরিস্থিতিতে ভারত পড়ে। সোভিয়েতপন্থী সরকার টিকিয়ে রাখতে তখন রুশ সেনাবাহিনীকে হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে মোতায়েন রাখা হয়।

আইএসআই'র সহায়তায় সিআইএ আফগানিস্তানে অস্থিরতা সৃষ্টি এবং আফগান ভূখণ্ডকে ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রে অস্থিরতা তৈরির জন্য যে চেষ্টা করছিল সে সম্পর্কে 'র'-এর মাধ্যমে নিয়মিত খবর রাখতেন ইন্দিরা গান্ধী। এই উদ্যোগ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সিআইএ পাকিস্তানের উষ্ণ পানির বন্দরে পৌঁছার দীর্ঘমেয়াদি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রুশরা আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে বলে যে প্রচারণা চালানো হয় বাস্তবে তা সঠিক ছিল না। ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উপলব্ধি করতেন এবং চরণ সিং সরকারের সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিপক্ষে অবস্থানের সমর্থক ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম কাজ ছিল আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ভুল ধারণা দূর করা।

ইন্দিরা গান্ধী একই সময়ে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতি হবে স্বল্পকালীন এবং দেশটিতে সৃষ্ট অস্থিরতা দূর হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই সোভিয়েত সৈন্য সেখান থেকে প্রত্যাহার করা হবে। এ সময় মস্কো নিজেই দ্রুততম সময়ে রুশ সৈন্য আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করে। বাস্তবে কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।

১৯৮১ সালের ২৮ জানুয়ারি রোনাল্ড রিগান প্রশাসনে সিআইএ'র নতুন প্রধান হিসেবে উইলিয়াম জে কেসি দায়িত্ব গ্রহণের পর ফ্রান্সের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা এসডিইসিই'র প্রধান লি কোঁতে আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসি ১৯৮১ সালের শুরুতে ওয়াশিংটন ডিসি সফরে যান। এসডিইসিই'র প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার কয়েক বছর পর তিনি দাবি করেন, ওয়াশিংটনের বৈঠকে মি. কেসির কাছে তিনি প্রস্তাব দেন যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের নতিস্বীকার ও পরাভূত করার জন্য সেখানে সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সোভিয়েত সরকার নিজেই আফগানিস্তান থেকে

রুশ সৈন্যদের গুটিয়ে নেয়। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের যুদ্ধক্ষমতার অবনতি ঘটানোর জন্য যেসব পদ্ধতির পরামর্শ আলেক্সান্ডার মারেঁসি কেসিকে তখন দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল রুশ সৈন্যদের হেরোইনে আসক্ত করে তোলা। আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসির এ পরামর্শে কেসি এতটাই উৎসাহিত হন যে তিনি মারেঁসিকে প্রেসিডেন্ট রিগানের কাছে নিয়ে যান। রিগান সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তানে পরাজিত করার জন্য সিআইএ'র পুরো গোপন পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেন। এরপর সিআইএ'র সেই নোংরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। এর বিস্তৃতির ফল যে পরে পৃথিবীর অনেক দেশকে পেতে হয়েছে এমন নয় খোদ যুক্তরাষ্ট্রকেও এর প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বরে।

লি মারেঁসির মতে, তিনি চেয়েছিলেন এই অপরেশনের নাম দেয়া হবে 'অপারেশন মস্কিটো' (মশা)। পরে এই অপারেশনের নাম কী দেয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মশার মতো ছড়িয়ে পড়ার জন্য আইএসআই'র সহায়তায় মুসলিম দেশগুলো থেকে জিহাদিদের এনে ট্রেনিং দেয়া হয় সিআইএ'র পৃষ্ঠপোষকতায়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা এর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে। লি মারেঁসি দাবি করেন, এই অপারেশনে হেরোইনের ব্যবহার প্রেসিডেন্ট রিগান অনুমোদন করেননি। তবে বাস্তবে দেখা গেছে, এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ অপারেশন শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যে ১৯৮১ সালে জিসকার্ড দ্য স্তাঁই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হলে লি কোঁতে মারেঁসি এসডিইসিই'র মহাপরিচালকের পদে ইস্তফা দেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে ফ্রান্স সোস্যালিস্ট নেতা ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি এসডিইসি'র প্রধান হিসেবে পিয়েরে মারিয়ঁকে নিয়োগ দান করেন। প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ লি মারেঁসির এই অপারেশনে অংশ নেয়ার বাজে পরামর্শকে গ্রহণ করেননি এবং এই অপারেশন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেন। এরপর এই অপারেশন সিআইএ'র তত্ত্বাবধানে সৌদি গোয়েন্দা ও আইএসআই'র গোপন সমর্থনপুষ্ট হয়ে চলতে থাকে।

অপারেশনের দায়িত্ব বণ্টন অনুযায়ী সিআইএ ও সৌদি গোয়েন্দা বিভাগ অর্থের যোগান দিত। সিআইএ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র-গোলাবারুদের ব্যবস্থা করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র ও ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের (আইইডি) কেমিক্যাল টাইমার ছাড়া অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সেখান থেকে পাওয়া অথবা চোরাই অস্ত্রবাজার থেকে কেনা চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি। আইএসআই'র হাতে ছেড়ে দেয়া হয় আফগান ও পাকিস্তানি মুজাহিদ সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণের কাজ। আরব স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োগের কাজ করে সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা। আইএসআই'র ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সিআইএ অর্থ ও অস্ত্র-গোলাবারুদ আইএসআইকে দেয় আর কিভাবে তা বিতরণ করা হবে তার এখতিয়ার তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য এর একটি অংশ নিজের হাতে রেখে দেয় এবং বাকিটা জিহাদিদের মধ্যে বিতরণ করে আইএসআই। এ

সময় হেজবে ইসলামির গোলবুদ্দীন হেকমাতিয়ারের পশতু অনুসারীদের প্রতি আহমদ শাহ মাসুদের তাজিক অনুসারীদের বিপরীতে ভালোরকম পক্ষপাতিত্ব করা হয়।

সিআইএ'র পৃষ্ঠপোষকতায় আইএসআই কত সংখ্যক পাকিস্তানি ও আফগান মুজাহিদকে সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। আফগান গোয়েন্দা সংস্থা খাদ 'র'-কে জানিয়েছিল আফগান ও পাকিস্তানি মুজাহিদদের সংখ্যা হবে ৮০ হাজার আর ৫ হাজারের মতো ছিল আরব মুজাহিদ। তাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র-গোলাবারুদ দেয়া হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পর সোভিয়েত সমর্থিত নাজিবুল্লাহ সরকার ১৯৯২ সালের এপ্রিলে ভেঙে পড়ে। এ যুদ্ধের পর অবশিষ্ট আরব মুজাহিদরা আল কায়েদা এবং আফগান ও পাকিস্তানি মুজাহিদরা ১৯৯৮ সালে ওসামা বিন লাদেন প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টের (আইআইএফ) মূল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ক্রুসেডার ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই ফ্রন্ট গঠন করা হয়। ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশের জন্য তা পরে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব গোয়েন্দাদের মধ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইএ'র উইলিয়াম কেসি এবং ফ্রান্সের এসডিইসিই'র লি কোঁতে আলেক্সান্ডার দ্য মারেঁসির চিন্তার ফসল ছিল এই দু'টি। ১৯৮০'র দশকে পাকিস্তানের মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মাদ্রাসায় গোপন সফরে উইলিয়াম কেসি প্রশিক্ষণার্থীদের 'আমার ছেলে' হিসেবে সম্বোধন করেন। রিগানের দ্বিতীয় মেয়াদের সময় কেসি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার 'ছেলে' ও সহযোগীদের হাতে ১১ সেপ্টেম্বর তার স্বদেশী ৩ হাজারসহ যে হাজার হাজার লোক নিহত হন সে দৃশ্য কেসি দেখে যেতে পারেননি। ওই সময়ে অবসরপ্রাপ্ত সিআইএ কর্মকর্তাদের কেউ কেউ ছিলেন আল কায়েদা সৃষ্টির মূল উৎস। তাদের কেউ কেউ এখন আল কায়েদাকে পর্যবেক্ষণে নেতৃত্ব দিতে বিশ্বব্যাপী ঘুরছেন এবং অর্থকড়িও কামাচ্ছেন।

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর আফগানিস্তানের ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখনো হয়নি। ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে 'র' এবং আইবিতে তা প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন ও আফগানিস্তানের সহিংসতা বিস্তৃত হয়ে তা নয়াদিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে গেলে বাস্তব উপলব্ধি কিছুটা সৃষ্টি হয়। আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময় আফগান মুজাহিদ ও আরব সহযোগীদের জন্য সিআইএ'র দেয়া অস্ত্রশস্ত্রের একটি অংশ আইএসআই খালিস্তানিদের দিয়েছে। ভারতীয় পাঞ্জাবকে অস্থির করে জম্মু ও কাশ্মীরের (জেঅ্যান্ডকে) মতো আরেকটি গোরস্তানতুল্য পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পাঞ্জাব আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোকে আইএসআই ব্যবহার করে।

পরিচ্ছেদ : দশ

খালিস্তান সহিংসতা

ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রথম কয়েক বছর পর পর্যন্ত যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পাঞ্জাব থেকে অভিবাসন করা শিখরাই ছিল ভারতের একক বৃহত্তম সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে একটি অংশ ব্রিটিশ আমলেই অভিবাসন গ্রহণ করে। বিশেষভাবে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার স' মিলগুলোতে কাজ করার জন্য তাদের একটি অংশ সে দেশে অভিবাসী হয়েছিল। অন্যরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর সেখানে যায়। শিখ অভিবাসীদের অধিকাংশই গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা এবং যুক্তরাজ্যে তাদের বড় অংশ পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের গণপরিবহনে ড্রাইভার বা কন্ডাক্টর হিসেবে কর্মরত। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী কিছু কৃষিজীবী শিখ ক্যালিফোর্নিয়ায় ফলমূলের আবাদ করে বেশ সচ্ছলতা অর্জন করে। ক্যালিফোনিয়ার ইউবা শহরে শিখ কৃষকদের বেশ সচ্ছল এক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। কানাডায় যেসব শিখ অভিবাসন গ্রহণ করেছে তারা মূলত মিলকারখানা ও গণপরিবহনে কাজ করে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোয় বসবাস করলেও শিখরা নিজেদের ধর্মীয় বিধিনিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলেন। পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে তারা ভারতে তাদের আত্মীয়স্বজনকে দেখতে এবং অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দিরে প্রার্থনা করতে যান। ১৯৫০-এর দশকের শেষ ও ১৯৬০ -এর দশকের শুরুর দিকে বিদেশে শিখরা তাদের সাথে ছুরি বহন ও পাগড়ি পরিধান নিয়ে জটিলতায় পড়ে। নিয়োগকারী কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের ছুরি বহন ও পাগড়ি পরিধান থেকে বিরত থাকতে বলে। যুক্তরাজ্যের গণপরিবহনে কর্মরত শিখদের ওপর এ বিধিনিষেধ বিশেষভাবে আরোপিত হয়। অধিকন্তু পাশ্চাত্যে শিখ অভিবাসীরা তাদের উপাসনার জন্য গুরুদুয়ারা নির্মাণ ও জমি কেনার ক্ষেত্রে পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতেও সমস্যার সম্মুখীন হয়।

যুক্তরাজ্যে সমস্যার সম্মুখিন অনেক শিখ তাদের বিষয়টি দেখা এবং এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু হাইকমিশন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের সমস্যা বা বঞ্চনার কিছু থাকলে সেটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে পরামর্শ দেয়। তখনকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরু বিদেশে ভারতীয় অভিবাসীদের ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি এসব অভিবাসীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের কাছে কোনো বিষয়ে দেন-দরবার করার বিরোধী ছিলেন। সরকারি নীতি অনুসারে প্রবাসীদের বলা হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করেই যেন তারা নিজেদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত শিখরা তাদের সমস্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের ভূমিকা এবং ইহুদি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে ইসরাইল সরকারের ভূমিকার মধ্যে তুলনা করতে শুরু করে। শিখদের বক্তব্য অনুযায়ী ইহুদিরা যে দেশে বসবাস করুক অথবা যে জাতীয়তার হোক না কেন ইসরাইল সরকার ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে একটি নৈতিক দায়িত্ববোধ পোষণ করে। অধিকন্তু ইসরাইলি নাগরিকত্ব আইনে দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন করা হয়। অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও তার ইসরাইলি নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। অথচ শিখ অভিবাসীরা অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে হয়। এ ছাড়া শিখদের আরেকটি দাবি ছিল ভারত সরকার যাতে দেশের ভেতর ও বাইরে বসবাসকারী শিখদের জন্য পাকিস্তানে অবস্থিত নানকানা সাহিব গুরুদুয়ারার মতো পবিত্র স্থান পরিদর্শন এবং সে দেশে থাকা স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য পাকিস্তানে আসা-যাওয়ার একটি ব্যবস্থা করে।

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত শিখদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ভারত সরকারের উদাসীনতায় তাদের মধ্যে এ রকম একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, শিখদের জন্য স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেই তাদের ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। যুক্তরাজ্যে চরণ সিং পাঞ্চির নেতৃত্বে একদল শিখ ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর শিখ স্বশাসন আন্দোলন নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সচ্ছল শিখ কৃষক সেখানে 'ইউনাইটেড শিখ আপিল' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। তারা ইহুদিদের বিভিন্ন অধিকার আদায় এবং স্বাধীন ইসরাইলের পক্ষে কাজ করার জন্য তৈরি 'ইউনাইটেড জিইয়িস আপিল'-এর অনুকরণে নতুন সংগঠনটি সৃষ্টি করে। অবশ্য পশ্চিমা দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ শিখ এসব সংগঠনের বাইরেই থেকে যায়। তারা একটি স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাকে সমর্থন করেনি।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ড. জগজিৎ সিং চৌহান লন্ডন যান এবং শিখ স্বশাসন আন্দোলনে যোগ দিয়ে এর নাম পরিবর্তন করে খালিস্তান আন্দোলন করেন। ড. জগজিৎ সিং ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাব বিধান সভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন এবং পরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাঞ্জাবে খালিস্তান নামে একটি শিখ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। ড. চৌহানের আগমনের আগে থেকেই যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান হাইকমিশন ও মার্কিন দূতাবাস শিখ স্বশাসন আন্দোলনের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। তারা ড. চৌহান লন্ডন আসার পর তার সাথে যোগাযোগ করে এবং ইন্দিরা গান্ধীকে বিব্রত করার জন্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার প্রোপাগান্ডাকে উৎসাহিত করে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান। ড. চৌহান সাদরে তা গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের

ধার্মিক অনুসারী না হলেও চৌহানকে ভারতের শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পাকিস্তান সফরকালে ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ ড. চৌহানকে পাকিস্তানে শিখ গুরুদুয়ারায় রক্ষিত শিখদের পবিত্র স্মারক উপহার দেয়। তিনি এ নিদর্শন লন্ডনে তার সাথে নিয়ে যান এবং শিখদের ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এটাকে কাজে লাগান।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিণামে ভারতের ওপর শরণার্থীর বোঝা চেপে বসার ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে। সিআইএ ও আইএসআই এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারতে শিখদের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিদেশে বসবাসকারী শিখদের প্রতি নয়াদিল্লির বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনে একইভাবে মনোযুদ্ধ শুরু করে।

ড. চৌহান নিউইয়র্ক সফর করেন এবং স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সামনে খালিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ড. হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ের কিছু কর্মকর্তা গোপনে এসব সভার আয়োজনে সহযোগিতা করেন।

১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর চৌহান নিউইয়র্ক টাইমস-এ স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরুর ঘোষণা সংবলিত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। 'র'-এর তদন্তে জানা যায়, এই বিজ্ঞাপনের অর্থ পরিশোধ করা হয় ওয়াশিংটন ডিসি'র পাকিস্তান দূতাবাস থেকে।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত শিখদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে ভারত ও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে মনোযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের পর মোরারজি দেশাই নতুন সরকার গঠন করলে সিআইএ ও আইএসআই আকস্মিকভাবে এই প্রচারাভিযান বন্ধ করে দেয়। ড. চৌহান ভারতে ফিরে আসেন এবং কথিত খালিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচারাভিযানে যবনিকা টানেন।

এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শিখ যুবকরা বেশ কয়েকটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এসব সংগঠনের অন্যতম হলো ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশন (আইএসওয়াইএফ), দল খালসা, বাবর খালসা ইত্যাদি। তারা খালিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চৌহানের নেতৃত্ব অস্বীকার করে সহিংস আন্দোলনের প্রচারাভিযান আরম্ভ করে। চৌহান সহিংস আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে আইএসআই ড. চৌহানের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং নতুন সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করতে শুরু করে।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলে চৌহান আবার লন্ডন ফিরে যান এবং নতুনভাবে খালিস্তান আন্দোলন শুরু করেন। প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে তিনি কানাডায় স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রের নামে ডাক টিকিট ও টাকার নোট ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেন। তিনি কানাডার রাজধানী অটোয়া গিয়ে সেখানে চীনা কূটনীতিকের সাথে সাক্ষাৎ করে তার আন্দোলনে চীনা সমর্থন কামনা করেন। কিন্তু চীনারা তাকে সহায়তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপরও তিনি বারবার হংকং সফর করেন এবং

বেইজিংয়ে চীনা নেতাদের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন। চীনা নেতারা তাকে চীনে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৮০ সালের পর চীনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং পাকিস্তানের দ্বারা অবমূল্যায়িত হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বার্থে চৌহানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তিনি বারবার ওয়াশিংটন ডিসি সফরে যেতে থাকেন এবং মার্কিন কর্মকর্তা ও কংগ্রেস সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কংগ্রেস কমিটির কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের সম্পর্ক, ভারতে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নতুন শিখ সংগঠনগুলো সহিংস আন্দোলনের পক্ষে প্রচারণা চালানোর কারণে সিআইএ শিখ যুবকদের এসব আন্দোলনের সাথে একটি দূরত্ব বজায় রাখে। তবে সাংবাদিক এবং অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে তাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকে সিআইএ।

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার পর যুক্তরাষ্ট্রে নতুন এক শিখ নেতার অভ্যুদয় ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাস শুরু করার আগে গঙ্গা সিং ধিলন নামের এ ব্যক্তি পাঞ্জাব পুলিশের একজন জুনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর গঙ্গা সিং কেনীয় বংশোদ্ভূত এক শিখ মেয়েকে বিয়ে করেন। এ মেয়েটি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন। বেগম জিয়াউল হকও ছিলেন এক কেনীয় বংশোদ্ভূত পরিবারের মেয়ে। স্ত্রীর সহযোগিতায় গঙ্গা সিং জিয়াউল হকের সাথে পরিচিত হয়ে তার একজন বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হন। গঙ্গা সিং ওয়াশিংটন ডিসিতে 'নানখানা সাহিব ফাউন্ডেশন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন এবং এর মাধ্যমে ঘন ঘন পাকিস্তান সফর করেন। গঙ্গা ও জিয়া পরিবারের মধ্যে এতটাই ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় যে, জিয়াউল হক ওয়াশিংটন ডিসি সফরে গেলে তার প্রতিবন্ধী মেয়েকে গঙ্গার বাসায় রেখে যেতেন এবং স্ত্রীসহ তিনি তার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা হোটেলে থাকতেন। পরে গঙ্গা সিং ধিলন ইন্দিরা গান্ধীর একজন কড়া সমালোচকে পরিণত হন এবং যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত ইন্দিরা-বিরোধী প্রোপাগান্ডায় নানাভাবে সহায়তা করেন।

'র'-প্রধান সানতুক এসব তৎপরতার কারণে ১৯৮০ সালের শেষ দিকে বিদেশে বসবাসরত চরমপন্থী শিখদের কার্যক্রম এবং আইএসআই'র সাথে তাদের যোগাযোগ মনিটরিং ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য 'র'-তে একটি বিশেষ শাখা সৃষ্টি করেন। আমাকে এই শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি এসংক্রান্ত অতীতের সব দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করি এবং এর সমন্বয় করে একটি বিস্তারিত ব্যাকগ্রাউন্ড নোট তৈরি করি। এ শাখার ডাটাবেজ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই এটি করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব একদিন আমাকে ফোন করে জানতে চান, দেশের বাইরে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে শিখ চরমপন্থীদের কার্যক্রম সম্পর্কে র-এর কাছে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নোট রয়েছে কি না। আমার তৈরি করা বিস্তারিত ব্যাকগ্রাউন্ড নোটের কয়েকটি কপি আমি তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

ইন্দিরা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিমা রাও এর কয়েক দিন পর আমাকে

টেলিফোন করে বলেন, তিনি শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। রাও চান যে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং যুক্তরাষ্ট্রে খালিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তানের সাথে তাদের যোগসূত্র নিয়ে তাকে ব্রিফ করি। তিনি আমার তৈরি করা ব্যাকগ্রাউন্ড নোটের একটি কপি দেখিয়ে বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা এটি একটি ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড নোট। তিনি প্রশ্ন করেন, র কেন এ ধরনের কিছু একটা তৈরি করে না। জবাবে আমি বলি, বস্তুত র-এর কিছু কাগজপত্র ও ফাইল দেখেই এটি তৈরি করা হয়েছে এবং এর কয়েকটি কপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। রাও বিস্মিত হয়ে বললেন, যুগ্ম সচিব যে বললেন এটি তিনিই তৈরি করেছেন।

১৯৮১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন কেবিনেট সচিব নয়াদিল্লি বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে এ মর্মে একটি বার্তা পান যে, কিছু অজ্ঞাত সন্ত্রাসী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোরে অবতরণ করেছে। সরকারের সঙ্কট ব্যবস্থাপনা কমিটি কালক্ষেপণ না করেই কেবিনেট সচিবের অফিসে বৈঠকে বসে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টই ১৯৭১ সালের মতো আবার বিমানটি ছিনতাই করেছে। কেবিনেট সচিব আমাকে তলব করেন। তখন পর্যন্ত ছিনতাইকারীরা তাদের পরিচয় প্রকাশ করেনি। কেবিনেট সচিব এ ব্যাপারে আমার ধারণা জানতে চান। আমি কমিটির প্রাথমিক ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলি, এটি সম্ভবত জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের কাজ নয়। আমার মনে হয় গজেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বাধীন দল খালসা নামের শিখ চরমপন্থী সংগঠনের সদস্যরা এটি ঘটিয়েছে। আমার মতামতকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। কারণ তখনও নিরানকারিস নামে একটি গোষ্ঠীর কিছু লোকের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানো ছাড়া শিখ চরমপন্থীরা তেমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়নি।

আমি অফিসে ফিরে আসার পর ব্যক্তিগত সহকারী জানান, কেবিনেট সচিবের অফিস থেকে বারবার আমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তারা চান আমি যেন আবার কেবিনেট সচিবের অফিসে যাই। কেবিনেট সচিবের অফিসে যাওয়ার পর একজন কর্মকর্তা আমাকে জানান, ছিনতাইকারীরা তাদের পরিচয় প্রকাশ করেছে। গজেন্দ্র সিংয়ের দল খালসার কিছু সদস্য বিমানটি ছিনতাই করেছে। তিনি আমার কাছে জানতে চান, ছিনতাইকারীরা নিজেদের পরিচয় জানানোর আগে আমি কী করে তাদের চিহ্নিত করলাম। আমি জবাবে বললাম, কয়েক দিন আগে নিউইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিক নয়াদিল্লি ও অমৃতসর স্বর্ণমন্দির সফরে এসে দল খালসার কিছু সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি দল খালসার প্রধান গজেন্দ্র সিংয়ের একটি সাক্ষাৎকার নেন এবং জানতে চান শিখদের সমস্যা কোথায়। সেই সাক্ষাৎকারে গজেন্দ্র সিং বলেন, 'দল খালসার জন্য ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার মতো আন্দোলন শুরু করার সময় এসেছে।' কর্মকর্তারা জানতে চান, এ সাক্ষাৎকার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশ হয়েছে কি না। আমি বললাম জানি না, এরপর থেকে পত্রিকাটি আমার হাতে আসেনি। তিনি প্রশ্ন করেন, তাই যদি হবে

তবে কিভাবে আমি জানলাম পত্রিকাটির নয়াদিল্লি সংবাদদাতা গজেন্দ্র সিংয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। জবাবে আমি বললাম, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর জন্য নয়াদিল্লি থেকে বিদেশী পত্রিকার সংবাদদাতাদের পাঠানো সব রিপোর্টকে ইন্টারসেপ্ট (আড়ি পেতে সংগ্রহ) করে। এর মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনগুলোর কপি এর সাথে সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা হয়। গজেন্দ্র সিং ও দল খালসার অন্য সদস্যদের সাথে নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতার সাক্ষাৎকারের টেলেক্স বার্তা আইবি ইন্টারসেপ্ট করে। এর একটি কপি আমিও পাই।

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ লাহোরে ছিনতাইকারীদের আত্মসমর্পণ এবং যাত্রীদের ছেড়ে দেয়ার জন্য বলে। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং বিমানটি ভারতে ফেরত যায়। গজেন্দ্র সিংসহ আত্মসমর্পণকারি ছিনতাইকারীদের নানখানা সাহেব গুরুদুয়ারায় থাকতে দেয়া হয়। জিয়াউল হক সরকার তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারের জন্য ভারত সরকারের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে পাকিস্তান সরকার অঙ্গীকার করে, এ ব্যাপারে তদন্ত করে পাকিস্তানের আদালতে ছিনতাইকারীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। পাকিস্তানে তাদের বিচার এবং জেল হয়, কিন্তু তাদের কারাগারে পাঠানোর পরিবর্তে নানখানা গুরুদুয়ারায় থাকতে দেয়া হয়। ভারত ও ভারতের বাইরের শিখরা নানখানা সাহেব গুরুদুয়ারা পরিদর্শনে গেলে এসব শিখ তীর্থযাত্রীর সাথে গজেন্দ্র সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত হন। এ ব্যাপারে নয়াদিল্লির প্রতিবাদ পাকিস্তান সরকার কানে নেয়নি।

এর পর আরও তিন দফা বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সে দেশে এসব বিমানকে অবতরণ করার সুযোগ দেয়। ছিনতাইকারীদের সাথে মিডিয়ার কথা বলার সুযোগও করে দেয়া হয়। এতে মিডিয়ায় ভারত সরকার ও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ছিনতাইকারীদের বক্তব্য প্রচার পায়। আলোচনার মাধ্যমে বিমান ও এর যাত্রীদের ভারতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এসব ক্ষেত্রেও ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পরে তাদের জেলে না পাঠিয়ে গুরুদুয়ারায় থাকাতে দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালের ২৪ আগস্ট শেষ এবং পঞ্চম ছিনতাইয়ের ঘটনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কিছু সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়নি। লাহোরে বিমানটি অবতরণের পর আইএসআই কর্মকর্তারা দেখেন যে বিমানটি খেলনা পিস্তল দিয়ে ছিনতাই করে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর তারা সন্ত্রাসীদের একটি রিভলবার দিয়ে বিমানটি দুবাই নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে। দুবাই অবতরণ করার পর সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ ছিনতাইকারীদের ভারতের হাতে তুলে না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিনতাই নাটকের অবসান ঘটায়। ছিনতাইকারীরা বিমান ও যাত্রীদের মুক্ত করে দেয় এবং তাদের ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। রিভলবারটি হস্তান্তর করা হয় দুবাই কর্তৃপক্ষের হাতে। ছিনতাইকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি চায়। তাদের দৃঢ় আস্থা ছিল মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবে না।

ছিনতাইকৃত বিমানটির লাহোর ছেড়ে দুবাই যাওয়ার কথা জানার পর পরই ভারত সরকার আইবি, 'র', পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি টিম দুবাই পাঠায়। ছিনতাইয়ের ঘটনা শেষ হওয়ার পর তারা আমিরাত কর্তৃপক্ষের প্রতি ছিনতাইকারী ও রিভলবারটি ফেরত দেয়ার জন্য আহ্বান জানায়। প্রাথমিকভাবে এ আবেদনে সাড়া দিতে আমিরাত কর্তৃপক্ষ ইতস্তত করে। ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব রমেশ ভান্ডারীকে দায়িত্ব দেন। ভান্ডারির সাথে আমিরাতের পদস্থ আমলা ও শাসক পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রমেশ ভান্ডারির মিশন শেষ পর্যন্ত সফল হয়। পশ্চিমা এক বিমান কোম্পানির একটি ভাড়া করা বিমান দিয়ে আইবি, 'র' কেন্দ্রীয় আধা মিলিশিয়া বাহিনীর একজন প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টিম দুবাই পাঠানো হয়। এ টিমের প্রধান ছিলেন একজন 'র' কর্মকর্তা। তখন নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ও বিদেশে ভারতীয় মিশনগুলোর দায়িত্ব দিয়ে তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দুবাইয়ে বিমানটি অবতরণ করার পর ভারতীয় টিমের সবাই সেখানে ছিলেন, কিন্তু ছিনতাইকারীদের বিমানের কাছে দেখা যায়নি।

বিমানটি অবতরণের পর দুবাই কর্তৃপক্ষ জানায়, ছিনতাইকারীরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদেরকে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পরে একটি বিশেষ মার্কিন বিমান যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে তাদের গ্রহণ করে। এরপর মার্কিন বিমানে তাদেরকে তুলে নিয়ে ভারতীয় নিরাপত্তা টিমের কাছে রিভলবারসহ ছিনতাইকারীদের হস্তান্তর করা হয়। তখনই ছিনতাইকারীরা বুঝতে পারে, তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং ছিনতাইকারীদের আসলে ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে তাদের কিছু করার মতো সময় পার হয়ে গেছে। পাইলট ও বিমানের অন্য ক্রুরাও বিস্মিত হয়ে যায়। তারা জানত না ছিনতাইকারীদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যই ভারতীয় বিমান বাহিনী মার্কিন বিমানটি ভাড়া করেছেন। তারা প্রথমে কিছুটা আপত্তি করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিমানটি ছিনতাইকারীদের নিয়ে দিল্লি ফিরে যায়।

এটি ছিল ভারতের জন্য এক চমৎকার সফল অপারেশন, যা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগিতায় সম্ভব হয়। পররাষ্ট্র সচিব রমেশ ভান্ডারির সাথে সরকারিভাবে উপসাগরীয় দেশগুলোর, বিশেষভাবে আরব আমিরাতের বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ক এবং একজন 'র' কর্মকর্তার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় নিরাপত্তা টিমের পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতার কারণে এ অপারেশন সফল করা সম্ভব হয়। এত কিছুর পরও ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাপারে আরব আমিরাতের উচ্চ সম্মানবোধ না থাকলে তা সম্ভব হতো না। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের হরকত-উল-মোজাহেদীনের সদস্যরা কাঠমান্ডু থেকে একটি বিমান ছিনতাই করে প্রথম লাহোর এবং পরে সেখান থেকে দুবাই এবং সর্বশেষ কান্দাহারে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি আরব আমিরাতে ইন্দিরা গান্ধী যে সহায়তা পেয়েছিলেন তা পাননি। আমিরাত কর্তৃপক্ষ শুধু বিমানটিকে কান্দাহারে যাওয়ার জন্য জ্বালানি নেয়ার অনুমতি দিয়েছিল। বিমানটিকে দুবাইয়ে রেখে ঘটনার

পরিসমাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে বাজপেয়ি সরকারের ব্যর্থতার পেছনে কিছুটা ভূমিকা রেখেছে আরব আমিরাত সরকারের সাথে নয়াদিল্লির হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ঘাটতি এবং বাকি ভূমিকা ছিল উপমহাসাগরীয় দেশগুলোতে অটল বিহারি বাজপেয়ির মুসলিমবিরোধী ভাবমূর্তি। অধিকন্তু ১৯৯৯ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন কোনো পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন না যার সাথে রমেশ ভান্ডারির মতো আমিরাতের শাসক পরিবারের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

রমেশের যোগাযোগ শুধু উপমহাসাগরীয় দেশগুলোতে সীমিত ছিল না। একই ধরনের যোগাযোগ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর শাসকদের সাথেও। একসময় 'র'-এর কাছে খবর আসে, খালিস্তানপন্থীরা ফিলিপাইনে আশ্রয় লাভ করছে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যাপারে রমেশ ভান্ডারির সহায়তা চাওয়া হয়। তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক গ্রেফতার ছাড়াই তাদের ম্যানিলা থেকে ধরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য গণমাধ্যমে প্রচার না করে খালিস্তানপন্থীদের ধরে এনে ফিলিপাইনের বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ঘাঁটিতে আটকে রাখা হয়। এআরসি'র একটি বিমান সে ঘাঁটি থেকে তাদের ভারতে নিয়ে আসে। এ ধরনের রাজনৈতিক ও আমলা পর্যায়ের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। যে কারো মনে হতে পারে অটল বিহারি বাজপেয়ি ছয় বছর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এ ধরনের কোনো নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারেননি।

বিমান ছিনতাই করে দুবাই যাওয়ার আগে লাহোরে যে রিভলবার আইএসআই ছিনতাইকারীদের দিয়েছিল সেটি ছিল জার্মানির তৈরি। পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দা সংস্থার কাছে 'র' রিভলবারটির বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে কোন কোম্পানি কার কাছে সেটি বিক্রি করেছে তা জানানোর জন্য সহায়তা চায়। প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে জার্মান গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ জানায়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে রিভলবারের যে চালানটি বিক্রি করা হয়েছিল এটি তারই একটি। ভারত সরকার তাৎক্ষণিকভাবে এ তথ্য যুক্তরাষ্ট্রকে জানায় এবং উল্লেখ করে যে, এটি পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মদদদাতা হিসেবে ঘোষণা করার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভারতের এ বক্তব্যের সাথে একমত হয়নি। তারা উল্লেখ করে, এই রিভলবারটি যে পাকিস্তানি কর্মকর্তারাই ছিনতাইকারীদের দিয়েছে তার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। ছিনতাইকৃত বিমানের এক যাত্রীর কাছ থেকেই জানা যায়, এক পাকিস্তানি কর্মকর্তাই ছিনতাইকারীর হাতে এ রিভলবারটি দিয়েছে। এই যাত্রী নিজ চোখে তা দেখেছে বলে উল্লেখ করে। জিজ্ঞাসাবাদকালে ছিনতাইকারীরাও স্বীকার করে, তারা পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এটি পেয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা এ ধরনের কোনো মৌখিক সাক্ষ্যকে পাকিস্তানের মতো দেশের বিপক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

ভারতীয়দের হাতে দুবাই কর্তৃপক্ষের ছিনতাইকারী ও রিভলবার হস্তান্তরের ফলে খালিস্তানপন্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং এ ঘটনা আইএসআই'র

মধ্যেও হতাশা সৃষ্টি করে। এর ফলে খালিস্তানিদের দ্বারা বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা এরপর আর ঘটেনি। দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা এরপরও ঘটেছে, তবে তা ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ের উদ্যোগ, যার সাথে খালিস্তান আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

খালিস্তান আন্দোলনকারীদের উদ্দীপনা ও সঙ্কল্প সম্পর্কে জানার পর আইএসআই তাদেরকে পাঞ্জাবে অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করে তারা খালিস্তানপন্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও অস্ত্র সরবরাহ করে। দল খালসার বিমান ছিনতাইকারী দলের নেতা গজেন্দ্র সিংকে এসব ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্ব দেয়া হয়। ভ্যাঙ্কুবারের বাবর খালসার তলবিন্দর সিং পারমার, কানাডার ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশনের মঞ্জিত সিং ওরফে লাল সিং, যুক্তরাজ্যের ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশনের গুরুদিপ সিং সিভিয়াকে পাকিস্তানি ভূখণ্ডে তৈরি এসব ক্যাম্প পরিদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়। তলবিন্দর সিং পাঞ্জাবের নিরানকারিসের ধ্বংসযজ্ঞে জড়িত ছিলেন। এ সময় বহু খালিস্তানপন্থীকে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে যাবার অনুমতি এবং তাদের সেখানে নিরাপদ আস্তানা তৈরির সুযোগ দেয়া হয়। এ সময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের লড়াইয়ের জন্য সৌদি ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আইএসআই প্রচুর অর্থকড়ি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-গোলাবারুদ পায়। ১৯৮৮-৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত এ সরবরাহ অব্যাহত থাকে। আইএসআই এই তহবিল ও অস্ত্রশস্ত্রের একটি অংশ খালিস্তান আন্দোলনকারীদের দেয়।

খালিস্তানপন্থীরা ছিনতাইকে হাতিয়ার হিসেবে পাওয়ার পর পাঞ্জাব ও দিল্লিতে তাদের সহিংস কার্যকলাপকে সুসংহত করে। প্রাথমিকভাবে আইএসআই'র দেয়া হস্তচালিত অস্ত্র দিয়ে তারা অনেক সহিংস ঘটনা ঘটায়। এরপর তারা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরকের (আইইডি) মতো মেয়াদি ও দূরনিয়ন্ত্রণ বিস্ফোরক ব্যবহার শুরু করে। বিস্ফোরক, ডেটোনেটর ও টাইমার সরবরাহ করে আইএসআই। খালিস্তানিরা ভারতের অন্য এলাকায় রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও কৃষি শ্রমিকের মতো নিরীহ মানুষের ওপর টার্গেটেড হত্যাকাণ্ড চালায়।

পাকিস্তানে প্রশিক্ষণকালে আইএসআই তাদের বোঝায় যে, পাঞ্জাবের সেচ খাল এবং ভারতের অন্য এলাকা থেকে আসা কৃষি শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাঞ্জাবের অর্থনীতিকে দুর্বল করার প্রয়োজন রয়েছে। একই সাথে তাদের অপারেশনকে দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং ভারতের অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। ভারতের পাঞ্জাবে আইএসআই'র পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এই সন্ত্রাসের ব্যাপারে পশ্চিমা দেশের সরকারগুলো কদাচিৎ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারত যে ভূমিকা রেখেছে, খালিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে পরিচালিত অপারেশনকে ঠিক

তার জবাব হিসেবে দেখতে থাকে আইএসআই। সংস্থাটি আরও মনে করে যে, পাঞ্জাবে অস্থিরতা চলতে থাকলে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে। এতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে জম্মু ও কাশ্মীর ফ্রন্টে সহায়তার জন্য রাখা যাবে। আইএসআই এই অপারেশনের নাম দেয় অপারেশন কে কে (খালিস্তান-কাশ্মীর)।

প্রাথমিকভাবে খালিস্তানপন্থীরা পাঞ্জাবে সাধারণ মানুষের সমর্থন তেমন পায়নি। কিন্তু ১৯৮২ সালের ১৯ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এশিয়ান গেমসের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। নয়াদিল্লিতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে লন্ডনে বসবাসরত জগজিৎ সিং চৌহান পাঞ্জাবের খালিস্তানবাদীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যাংককে যান এবং সেখান থেকে যান কাঠমান্ডুতে। 'র' কর্মকর্তারা তাদের সোর্সের মাধ্যমে চৌহানের ব্যাংকক উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। তারা ব্যাংকক ও কাঠমান্ডুতে তার কার্যক্রমকে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখে। ড. চৌহানকে ধরে ভারতীয় পুলিশের হাতে সোপর্দ করার জন্য ভারত সরকার নেপালি পুলিশকে অনুরোধ করে। কিন্তু এ অনুরোধে সাড়া দেয়নি নেপাল। নেপাল চৌহানকে ধরেছে ঠিকই তবে তাকে ভারতের কাছে হস্তান্তর না করে ব্যাংককের ফ্লাইটে উঠিয়ে দেয়। থাই কর্তৃপক্ষও তার ব্যাপারে ভারতকে তেমন সহায়তা করেনি। তারাও চৌহানকে একইভাবে লন্ডনের ফ্লাইটে উঠিয়ে দেয়।

এশিয়ান গেমস শুরু হওয়ার আগে আইবি ও 'র' হুঁশিয়ারি পেতে থাকে যে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ব্যবহার করে খালিস্তানি সন্ত্রাসীরা গেমসকে বানচাল করার পরিকল্পনা করছে। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী গেমসের নিরাপত্তার ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দিল্লিমুখী সব রাস্তায় তল্লাশি প্রহরা বসানো হয়। কার ও বাস থামিয়ে শিখ আরওহীদের তল্লাশি করে দেখা হয় তাদের সাথে কোনো বিস্ফোরক আছে কিনা। পাঞ্জাব ও দিল্লিতে এ পদক্ষেপের ফলে বহু শিখ অপদস্থ ও অপমানিত হয়। এটাকে পাঞ্জাবের খালিস্তান সন্ত্রাসীরা হাতিয়ারে পরিণত করে।

খালিস্তানপন্থীরা তাদের অপারেশন চালানোর জন্য অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরকে নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ২৬ এপ্রিল পাঞ্জাবের উপ-পুলিশ প্রধান এ এস আতওয়াল স্বর্ণমন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিংয়ের (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট) ভুল পরামর্শে সন্ত জার্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালেকে ব্যবহার করে খালিস্তান আন্দোলনে বিভক্তি আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খালিস্তান আন্দোলনকে দুর্বল করার পরিবর্তে ভিন্দ্রানওয়ালে তাদের নেতায় পরিণত হন। তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করে শিখ কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খালিস্তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করে তোলেন। তিনি ও তার অনুসারীরা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে অভিযান চালানো শুরু করেন।

সন্ত্রাস ক্রমেই বাড়তে থাকে। পাঞ্জাব ও দিল্লিতে একের পর এক রক্তক্ষয়ী

ঘটনা ঘটতে থাকে। আইবি ও 'র'-এর সোর্সগুলো খবর দেয়, খালিস্তানপন্থীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক ও বর্তমান কিছু সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে। এ খবরে সরকারের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এমন রিপোর্টও আসে যে কিছু পাকিস্তানি দুর্বৃত্ত স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়েছে এবং ভিন্দ্রানওয়ালে ও অন্য শিখ নেতাদের নির্দেশে তারা কাজ করছে।

এসব ঘটনা ও খবর পাওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবারের মতো খালিস্তানপন্থী সন্ত্রাসী ও তাদের সমর্থকদের ধরে আনার জন্য স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে সেনা প্রেরণের বিষয়ে ভাবতে শুরু করেন। এ পদক্ষেপ নেয়ার আগে তিনি সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান এবং আকালি দলের মাধ্যমে ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার সহযোগীদের স্বর্ণমন্দির থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেন। নয়াদিল্লিতে 'র'-এর অতিথি ভবনে রাজিব গান্ধী ও তার দুই সহযোগী আকালি দলের নেতাদের সাথে কয়েক দফা গোপন বৈঠকে মিলিত হন। আমাকে এসব বৈঠকের আয়োজন, আলোচনার কার্যবিবরণী তৈরি এবং ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত করার লক্ষ্যে কাওয়ের জন্য ব্রিফ তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। এসব বৈঠকে খালিস্তান আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে স্বর্ণমন্দির থেকে বের করে আনতে সরকারকে সহযোগিতা দেয়ার ব্যাপারে আকালি দলের নেতাদের রাজি করানো সম্ভব হয়নি। এসব বৈঠকের কার্যবিবরণী 'র'-এর অতি গোপন আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে, যার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। স্বর্ণমন্দিরে সেনা পাঠানোর বিষয়টি এড়িয়ে যেতে ইন্দিরা গান্ধী কতভাবেই না চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ এতে পাওয়া যায়। এসব দলিলপত্র এখনো নিরাপদে রক্ষিত আছে এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসবিদদের তা কাজে লাগাবে।

একই সাথে ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার খালিস্তানি সহযোগীদের স্বর্ণমন্দির থেকে বের করে আনার ব্যাপারে বিদেশভিত্তিক খালিস্তান আন্দোলনের নেতাদের সহায়তার জন্য কাওকে দেশের বাইরে পাঠান ইন্দিরা গান্ধী। 'র'-এর দু'জন কর্মকর্তা ও আমি তার সহযাত্রী হই। আবারো আমার ওপর ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত করার লক্ষ্যে কাওয়ের জন্য গোপন আলোচনাগুলোর বিবরণী তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খালিস্তানি আন্দোলনের এক নেতা জুরিখে কাওকে বলেন, তাকে স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে ভিন্দ্রানওয়ালের সাথে দেখার করার অনুমতি দেয়া হলে তিনি সরকারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। সদিচ্ছার প্রমাণ হিসেবে এ নেতা দাবি করেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে খালিস্তানপন্থীরা 'র' কর্মকর্তাদের হত্যার চক্রান্ত করেছিলেন। এ কাজ থেকে তিনি খালিস্তানপন্থীদের বিরত রাখেন। তার এ দাবির সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না। আমি জেনেছি, ইন্দিরা গান্ধী তাকে স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে যেতে অনুমতি দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করেন, এ লোকটি স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করে যদি ভিন্দ্রানওয়ালের সাথে যোগ দেয় তাহলে ভারত সরকারের জন্য জটিলতা আরও বাড়বে।

এরপর নানা ঘটনা পরম্পরায় ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার সহযোগী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে সেনা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রস্তাবিত প্রতিরোধ কার্যক্রমের বাইরে অন্য কিছু করার সুযোগ গোয়েন্দাদের ছিল

না। যে কেউ মনে করতে পারেন, তাড়াহুড়া করে বড় রকমের বৈরী ফল নিয়ে আসতে পারে এমন যেকোনো পদক্ষেপ না নিয়ে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করা যেত। অথবা তাৎক্ষণিক অপারেশন চালাতেই হলে সেই অভিযানে সেনাবাহিনীর পরিবর্তে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় আধা মিলিশিয়া বাহিনী ব্যবহার করা যেত। কাও এ মতের পক্ষে ছিলেন বলে অনেকের ধারণা। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ পুলিশের চাইতে বেশ খানিকটা আলাদা ধরনের। সেনাবাহিনীকে একবার কাজে নামানো হলে অভিযান অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এ ধরনের পরিবেশে পুলিশের অ্যাকশনে পরিমিতিবোধ থাকে অনেক বেশি। পুলিশ তাদের কার্যক্রমকে যেকোনো পরিস্থিতিতে মানানসই করে নিতে পারে। তারা যদি মনে করে যে প্রতিরোধ হবে অনেক ব্যাপক এবং উচ্চপর্যায়ের তখন বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রস্তুত থাকে আর যখন কম জীবন ক্ষয় করে কাজ করার সুযোগ থাকে তখন নিজেদের প্রত্যাহার বা অপেক্ষা করতে তারা দ্বিধা করে না।

আমাকে জানানো হয় যে কাও'য়ের অনুরোধে ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিসের (এমআই-৫) দু'জন কর্মকর্তা পর্যটক পরিচয়ে স্বর্ণমন্দির পরিদর্শন করে ইন্দিরা গান্ধীকে একই ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, ধৈর্যহারা না হয়ে চরম পদক্ষেপ এড়াতে অথবা প্রয়োজন হলে পুলিশ ব্যবহার করতে।

গোয়েন্দাদের আরেকটি উদ্বেগ ছিল, স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানে সশস্ত্র বাহি-নীতে থাকা বিপুল সংখ্যক শিখ সৈন্যের মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় কিনা। কিন্তু পদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের আস্থা ছিল, শিখ সৈন্যদের মাঝে এ অভিযানে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে না। অবশ্য অভিযান পরিচালিত হওয়ার পর সেনা কর্মকর্তাদের ধারণা ভুল এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উদ্বেগের বিষয়টি যথার্থ প্রমাণিত হয়। শিখ সৈন্যদের আপত্তি বা প্রতিবাদ খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে দেখা যায়। এমনকি এক স্থানে এর সহিংস প্রকাশও ঘটে যায়। অবশ্য প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা হলেও এসব পরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

১৯৮৪ সালের ৩ থেকে ৬ জুন 'অপারেশন ব্লু স্টার' নামে স্বর্ণমন্দিরে এই সেনা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানের পুরোটাই সহজসাধ্য হয়নি। ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার অনুসারী ও স্বর্ণমন্দিরে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে যে ধরনের প্রতিরোধ আশা করা হয়েছিল বাস্তব প্রতিরোধ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে গুলিবিনিময় চলতে থাকে। ভিন্দ্রানওয়ালে নিহত হন এবং ভয়ানকভাবে রক্তাক্ত হয় আকাল তখত। পাঞ্জাব এবং দেশের অন্য কয়েকটি স্থানে শিখ সহিংসতা সৃষ্টি হয়। এ অভিযান ভারতে ও বিদেশে অবস্থানরত শিখদের মনে ব্যাপক ক্ষত সৃষ্টি করে। এরপর আরও ১১ বছর ধরে এর জের চলতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দিল্লি পুলিশের সদস্য দুই শিখ দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধীর নিহত হওয়ার নির্মম ঘটনাটি।

স্বর্ণমন্দির অভিযানের সমন্বয়কারী লে. জেনারেল সুন্দরজী অগোছালো অপারেশনের জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তাকে দেয়া তথ্য ও ধারণাকে দায়ী

করেন। তার মতে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দেয়া ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক এবং অধিক অস্ত্রসজ্জিত ছিল খালিস্তানপন্থীরা। দুর্বল গোয়েন্দা তথ্যের কারণে প্রতিরোধ ভেঙে স্বর্ণমন্দিরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সেনাবাহিনীর অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যায় বলে তিনি গোয়েন্দাদের দোষারোপ করেন।

একটি অতি জটিল ও স্পর্শকাতর অভিযানের আগে সাফল্যের ক্ষমতা সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আস্থা এবং অভিযানে নেমে এ আস্থায় চিড় ধরার পর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতি দোষারোপের প্রবণতাই প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় লে. জেনারেল সুন্দরজীর বক্তব্যে। অপারেশন ব্লু স্টার চলাকালে, এরপর এবং তার সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর (আইপিকেএফ) শ্রীলঙ্কা যাত্রার ঘটনায় যে কেউ তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরখ করে দেখতে পারেন।

স্বর্ণমন্দির অভিযানের সময় আইএসআই প্রশিক্ষিত অনেক খালিস্তানি সন্ত্রাসী আটক হয়। আইএসআই'র সরবরাহ করা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। তবে পাকিস্তানি বর্তমান বা সাবেক একজন ভাড়াটে সৈন্যকেও মন্দিরের অভ্যন্তরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে আইবি এবং 'র'-এর রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত হয়। এসব রিপোর্টের অনেকগুলোই চোরাচালানিদের মতো সীমান্তপারের সূত্র থেকে আসা। কোনো কোনো সোর্স প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই-বাছাই না করেই তা আইবি অথবা সেনা গোয়েন্দা সংস্থায় পাঠিয়ে দেয়। বিদেশের অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক তথ্য ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ক্রমাগত দুদর্শার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অধিকন্তু সামরিক অভিযানের কারণে বিপুল জীবন ক্ষয় এবং আকাল তখত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা শিখদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেসের কিছু শিখ নেতা আকাল তখত সংস্কারের জন্য একটি 'করসেবা' (স্বেচ্ছায় ধর্মীয় কাজ সন্ধানে) কর্মসূচির আয়োজন করে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক শিখের মনে যে প্রচণ্ড আঘাত এই অভিযানে লেগেছিল তা নিরাময় এতটা সহজ ছিল না। তাই খালিস্তানি সন্ত্রাস আরও অবনতির দিকে যায় এবং একই বছর ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ঘটে। আর ১৯৯৬ সালে অভিযান চলাকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল এ এস বৈদ্যকে পুনায় হত্যার ঘটনা ঘটে। জেনারেল বৈদ্য চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পুনায় বসবাস করছিলেন।

পরিচ্ছেদ : এগার

ইন্দিরা হত্যাকাণ্ড

১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী দিল্লি অবস্থানকালে অথবা দেশের ভেতরে বা সফরে গেলে তার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) ওপর। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট 'ব্লু-বুক' নির্দেশনাকে সময় সময় হালনাগাদ করা, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংবলিত প্রজ্ঞাপন জারি, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য হুমকিগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা, দিল্লি পুলিশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৈহিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন, দেশে-বিদেশে সফরকালে রাজ্য এজেন্সি এবং বিদেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করা ইত্যাদি আইবি'র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ সদস্যদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাজের সমন্বয় এবং তদারকিও করত আইবি। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের মতো প্রধানমন্ত্রীর দৈহিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সংস্থা ভারতে ছিল না।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আইবি'র যে বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি দেখাশোনা করত সেটি ছিল একেবারেই ক্ষুদ্রাকৃতির। এর মধ্যে ছিলেন শুধু তিনজন কর্মকর্তা যার মধ্যে পুলিশের আইজি পদমর্যাদার যুগ্ম পরিচালক থাকতেন টিমের প্রধান। পুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার একজন উপ-পরিচালক এবং এসপি পদমর্যাদার একজন সহকারী পরিচালক এ টিমের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল আনন্দমার্গের হুমকির কারণে এ বিভাগকে আরও সম্প্রসারণ করা হয়। আনন্দমার্গের এক নেতাকে আটকাদেশ দেয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে তারা সহিংসতা সৃষ্টি করে। দেশের বাইরেও আনন্দমার্গের শাখা ও সদস্য থাকায় এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম ইউরোপেও আনন্দমার্গের অনুসারীরা নানাধরনের সহিংসতার আশ্রয় নেয়। এরপর আনন্দমার্গকে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আইবি'র পাশাপাশি ভারতের রাজ্য পুলিশ থেকেও চৌকস কর্মকর্তাদের এ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি তাদের জন্য ভারতের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে অথবা সফরসঙ্গী হিসেবে

বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ ছিল এ অফিসের একটি বিশেষ আকর্ষণ।

১৯৭৫ সালের আগে যখনই প্রধানমন্ত্রী কোনো দেশ সফরে যেতেন তখন অগ্রবর্তী দল হিসেবে উপ-পরিচালক বা সহকারী পরিচালক সংশ্লিষ্ট দেশ ভ্রমণ করতেন। তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর থাকা বা সফর করার স্থানগুলো পরিদর্শন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পন্ন করতেন। এসব কর্মকর্তা দিল্লি ফিরে আসার পর যুগ্ম পরিচালক প্রধানমন্ত্রীর সাথে যেতেন। প্রধানমন্ত্রীর দৈহিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দিল্লি পুলিশের কিছু কর্মকর্তাও একই সাথে যেতেন।

১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার পর কাও এই সংস্থায় একটি ভিআইপি নিরাপত্তা শাখা গঠন করেন। এ শাখার কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য বিদেশভিত্তিক নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা। ১৯৭৫ সালের পর থেকে কাওয়ের অনুরোধে এ শাখার একজনকে আইবি কর্মকর্তাদের অগ্রবর্তী নিরাপত্তা দলের সদস্য করে পাঠানো শুরু হয়। পরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে প্রটোকলসংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে এ টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে সম্ভাব্য নিরাপত্তা হুমকি সম্পর্কে তথ্য দেয়া এবং যোগাযোগসংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইবি'র নিরাপত্তা টিমের সদস্য হিসেবে 'র' কর্মকর্তারাও যেতে শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সোনিয়া গান্ধী ও তার সন্তানরা সফরে গেলে দিল্লি পুলিশ থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত মহিলা কর্মকর্তাদের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। আইবি'র ভিআইপি নিরাপত্তা শাখার ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় এবং এর আগে বড় পরিসরের নিরাপত্তা টিম থাকায় সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের মানগত ক্ষেত্রে জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি হয়। কেনাকাটা করা এবং শুল্ক ছাড়া ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য সামগ্রী আনার সুযোগ দেয়ার পর পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা টিমের সদস্য হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

এতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিতদের মধ্যে বিদেশী পণ্য চোরাচালানের একটি চক্র তৈরি হয়ে যায়। দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর বিমান থামতে না থামতেই প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা তাদের গাড়িতে উঠে বসেন। এরপর নিরাপত্তা কর্মীদের কেনা ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য সরঞ্জাম ওঠানোর জন্য আইবি'র একটি এবং দিল্লি পুলিশের একটি গাড়ি টারমাকে যায়। তারা এসব পণ্যের কোনো ঘোষণা না দিয়েই বিমানবন্দর ত্যাগ করে। বিদেশে যাওয়ার সময় তাদের ব্যাগগুলো ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক আচরণটুকুও তারা করে না। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনা জেনেও আমলে নিত না।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ইন্দিরা গান্ধী নিউইয়র্ক যান। এশিয়ান গেমসকে সামনে রেখে এর আগের বছর রঙিন সম্প্রচার শুরু করে দূরদর্শন। ভারতে সর্বস্তরে তখন বিদেশী রঙিন টেলিভিশনের ব্যাপারে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয়। যারা বিদেশে যায় তাদের

অনেকেই একটি রঙিন টিভি সেট নিয়ে ফিরে আসেন। নিউইয়র্ক সফরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ১৫ জনের মতো পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। এর মধ্যে তিনজন ছিলেন 'র' কর্মকর্তা এবং বাকিরা আইবি ও দিল্লি পুলিশের।

নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তাদের মধ্যে একজন সিনিয়র 'র' কর্মকর্তা ছাড়া বাকি সবাই রঙিন টিভি সেট ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী কিনেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরটা ছাড়া আত্মীয়স্বজনের জন্যও টিভি কেনেন।

নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে বিমান ছাড়তে কিছুটা দেরি হয়। ইন্দিরা গান্ধী আসন নেয়ার পর দেখা যায়, বিমানের দরজা তখনও খোলা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তিনি দেখতে পান টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রীর সারি সারি কার্টন বিমানে তোলা হচ্ছে। তিনি সফরসঙ্গী কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেন– এসব কার সাথে যাচ্ছে। জবাবে তাকে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা টিমের সদস্যরা এগুলো নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর তিনি আর কিছু বলেননি। বিমান যখন দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে তখন তিনি বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে কাস্টমসের কাছে একটি বার্তা পাঠান। এতে তিনি বলেন, তার সফরসঙ্গী সবার মালামাল যেন কাস্টমস চেকিংয়ের মাধ্যমে যায় এবং সবকিছুর শুল্ক নেয়া হয়।

বিমানটি অবতরণের পর প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে উঠে চলে যান। আইবি ও দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা টারমাকে পৌঁছেন এবং নিউইয়র্ক থেকে কেনা টিভি ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী গাড়িতে উঠাতে শুরু করেন। এর মধ্যে শুল্ক কর্মকর্তাদের একটি দল সেখানে এসে পৌঁছে এবং তাদের বলেন, সবকিছুই শুল্ক তল্লাশির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তারা এ-ও বলেন, যা কিছু করছেন তা খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই।

মুহূর্তের মধ্যে সেখানে এক ধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কর্মকর্তারা তাদের জিনিসপত্রের মালিকানার কথা জানিয়ে পরে শুল্ক দিয়ে তা ছাড় করিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেন। যারা একটার বেশি টিভি সেট কিনেছিলেন তারা কেবল একটারই মালিকানা দাবি করেন এবং বলেন, বাকিটার মালিক কে তা তারা জানেন না।

এক দিন বাড়তি ছুটি কাটানোর জন্য নিউইয়র্কে থেকে যাওয়া আইবি'র একজন সিনিয়র কর্মকর্তা তার স্টাফের মাধ্যমে টিভি সেট কিনে পাঠিয়েছিলেন। এভাবে কিছু পাঠানো ছিল বিমানের নিরাপত্তাবিধির বরখেলাপ। বিধি অনুযায়ী বিমান শুধু তার যাত্রীদের ব্যাগেজ বা মালপত্রই বহন করতে পারে। পরে যখন তিনি দিল্লি ফিরে আসেন তখন নিজের টিভির মালিকানার কথা বেমালুম অস্বীকার করেন। পুরো বিষয়টি এক বিব্রতকর কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়। একটি জাতীয় দৈনিক শুল্ক কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এ কেলেঙ্কারির বিস্তৃত প্রতিবেদন গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে।

সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের হোটেল ভাড়া ও খাওয়ার খরচ সংশ্লিষ্ট দেশের ভারতীয় দূতাবাস পরিশোধ করে থাকে। এরপর তারা দৈনিক ভাতার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্য হন। এই অর্থ কেনাকাটার জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। কেবিনেট সচিবালয় থেকে আদেশ জারি হয়, যেসব জিনিস তারা কিনেছেন তার অর্থ কোত্থেকে

পেয়েছেন এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। অধিকাংশই এর সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যান তারা।

এ ধরনের ঘটনা ছিল রাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগজনক। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য যাওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার জন্য এটি ছিল উপযুক্ত বিষয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাও ছিলেন এক দরাজদিল ব্যক্তি। তিনি অভিযুক্তদের চাকরি থেকে বাদ না দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডে কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে চাকরির কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেন।

এটি ছিল এমন এক এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা, যা ঘটেছিল প্রধানমন্ত্রীর মতো ভিআইপি নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের মধ্যে। এ ধরনের উদারতা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা তদারকির গুণগত মানকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা ছিল অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে ভিন্দ্রানওয়ালে ও খালিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানে আকাল তখত ধ্বংস এবং ভিদ্রানওয়ালে নিহত হওয়ার ঘটনার কারণে ইন্দিরা গান্ধীর ওপর প্রতিশোধমূলক আঘাত আসতে পারে। তাদের ধারণা ছিল, এ ঘটনার কারণে শুধু খালিস্তান আন্দোলনকারীরাই নয়, একই সাথে এ আন্দোলনের বাইরের শিখদের অনেকেই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীর সফরসঙ্গী শিখ নিরাপত্তা কর্মীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রতিশোধমুলক হামলা হওয়ার বিষয়টিকেও আমলে আনা হয়।

'র'-এর নতুন নতুন স্টেশন খুলে এবং বিদ্যমান স্টেশনে জনবল বাড়িয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে জোরদার করার প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়া হয় এ ব্যাপারে। এ ক্ষেত্রে সহায়তা দানের জন্য বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিও অনুরোধ জানানো হয়। খালিস্তানি সংগঠনগুলোর টেলিফোন ও অন্যান্য যোগাযোগের ওপর অধিক নজরদারির জন্য 'র'-এর মনিটরিং ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ভেতর থেকে যেকোনো হুমকির আশঙ্কাকে সামনে রেখে ইন্দিরা গান্ধীর পুরো দৈহিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে পর্যালোচনা ও বিন্যাস করা হয়।

গৃহীত এসব ব্যবস্থার পর গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্তি পরিমাণগতভাবে অনেক বেড়ে যায় কিন্তু এর মধ্যে তথ্যের সারবস্তু খুব বেশি ছিল না। সাধারণ ধরনের গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সংখ্যাই অনেক বেশি হারে আসতে থাকে। বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও সহায়তা নিয়ে খুব একটা এগিয়ে আসেনি। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক শিখের বসবাস রয়েছে। এসব দেশের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা খালিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে তথ্য দিয়ে তাদের বৈরী করতে চায়নি। পশ্চিম জার্মানির একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় আমরা কী ধরনের অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ১৯৮১ সালের পর থেকে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের চাকরিচ্যুত স' মিল শ্রমিক ও বাবর খালসার সাথে জড়িত শিখ সদস্য তলবিন্দর সিং পারমার ইন্দিরা গান্ধীকে হুমকি দিয়ে বিবৃতি দিয়ে আসছিল। অপারেশন ব্লু স্টারের অনেক আগেই ইন্দিরা গান্ধীর যেকোনো বিদেশ সফরের সময় এ লোক তাকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে বলে 'র' উদ্বিগ্ন ছিল। নিরানকারিস হত্যাযজ্ঞ এবং অন্যান্য মামলায় বিচারের জন্য ভারতে তলবিন্দর সিংকে খোঁজা

হচ্ছিল। আমরা পশ্চিমা এজেন্সিগুলোকে বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলাম তাকে যেন গ্রেফতার করে বিচারের জন্য ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা আমাদের কথায় কোনো সাড়া দেয়নি।

আমাদের অনুরোধে ফ্রান্সভিত্তিক আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল সব সদস্য দেশের প্রতি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ইস্যু করে বলে যে, তাদের ভূখণ্ডে তলবিন্দরকে পাওয়া গেলে তাকে যেন গ্রেফতার করে ভারতীয় পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পশ্চিম জার্মানির এক পুলিশ কনস্টেবল ইন্টারপোলের দেয়া এ বিবরণীর সাথে মিলে যাওয়ায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর জার্মান কর্তৃপক্ষ ইন্টারপোলের মাধ্যমে এ সম্পর্কে ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (সিবিআই) জানায়।

সিবিআই তাৎক্ষণিকভাবে চলমান একটি মামলায় বিচারের জন্য তলবিন্দর সিংকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে অনুরোধ জানায়। জার্মান কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এবং এ ব্যাপারে প্রাপ্ত প্রমাণাদি সরবরাহের আহ্বান জানায়। এর জবাবে জানানো হয়, সিবিআই'র একটি দল বিস্তারিত তথ্য প্রমাণসহ বন রওনা হচ্ছে এবং তারা না পৌঁছা পর্যন্ত যেন তাকে আটক রাখা হয়। বনের উদ্দেশ্যে সিবিআই টিম রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বার্তা পাঠায়। এ বার্তায় ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় কনসাল জেনারেল উল্লেখ করেন, স্থানীয় এক গুরুদুয়ারার ধর্মীয় সমাবেশে তলবিন্দর সিং পারমার বক্তব্য রেখেছেন। এ বক্তব্যে পারমার ইন্দিরা গান্ধীকে চরমভাবে হুমকি দিয়ে কথা বলেছেন। এ বার্তাটি নিয়ে সিবিআই টিম পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়ার পর তারা জানায়, আটক লোকটিকে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ আদালত সিবিআই টিম আসতে দেরি হওয়ায় আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে সম্মত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সিবিআই টিমের বন যেতে তেমন কোনো বিলম্বই হয়নি। পশ্চিম জার্মানিতে পারমার গ্রেফতার হয়েছে এবং তাকে আটকাদেশ দেয়া হয়েছে শুনে স্থানীয় শিখ নেতারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে কানাডা ফিরে যেতে অনুমতি দেয়ার দাবি জানায়। এ দাবি মেনে নিয়ে জার্মান সরকার পারমারকে ভ্যাঙ্কুভারে ফিরে যেতে দেয়। এর দুই বছর পর তলবিন্দর সিং বিমান ছিনতাইয়ের এক ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ ষড়যন্ত্রের ফলে আইরিস উপকূলে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৩০০ জন যাত্রী মারা যায়। এসব যাত্রীর অধিকাংশই ছিল কানাডীয় নাগরিক। এ মর্মান্তিক ঘটনার দায় পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

'র'-এর মনিটরিং বা তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ভারত ও বাইরের বিপুলসংখ্যক খালিস্তানপন্থীর টেলিফোন ইন্টারসেপ (আড়িপাতা) করা সম্ভব হয়। তারা ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত সমালোচনামুখর ও বিদ্বেষপরায়ণ। তবে আইবি এবং 'র' এমন কোনো টেলিফোন সংলাপ আড়ি পেতে পায়নি যেখানে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য রয়েছে। ধারণা করা হয়, এ ব্যাপারে খালিস্তান আন্দোলনকারীরা টেলিফোন বা ওয়্যারলেস

আলাপ করলে আইবি এবং 'র' সে সম্পর্কে জানতে পারত। গোয়েন্দাদের ধারণা, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্ণমন্দিরে অভিযানের ফলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার মাধ্যমে আইএসআই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকার প্রতিশোধ নিতে পারে। এরপর থেকে আইএসআই'র সাথে সংশ্লিষ্ট টেলিফোনগুলো নিবিড় মনিটরিংয়ে নিয়ে আসা হয়। আমরা 'হিউমিন্ট' কাভারেজের মধ্যে আইএসআইকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেই। কিন্তু সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে এমন কিছু পাওয়া যায়নি। কংগ্রেস (আই)-এর কিছু নেতা ধারণা করেন, সিআইএ শিখদের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে আইবি এবং আন্তর্জাতিকভাবে 'র' সিআইএ'র সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে নিবিড় নজরদারিতে রাখে। জাতীয় নিরাপত্তা আমলাদের একটি শঙ্কা ছিল কিছু শিখ কোথাও না কোথাও স্বর্ণমন্দিরে অভিযানের প্রতিশোধ নিতে ইন্দিরাকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে। তবে কে কখন কোথায় এবং কিভাবে এ উদ্যোগ নেবে তার কোনো উত্তরসংবলিত সারসংক্ষেপ এই সাধারণ গোয়েন্দা তথ্যে ছিল না। কাও তার নেতৃত্বে নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। এতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সিনিয়র সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইন্দিরার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করতে এ কমিটি প্রতিদিন বৈঠকে বসে। কমিটি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার দৈনন্দিন কর্মসূচিসংক্রান্ত সব গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা করত। সে সময় সরকারের কোনো পদে অধিষ্ঠিত না থাকলেও রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা জোরদার করার জন্যও পদক্ষেপ নেয়া হয়। তার ইচ্ছা অনুসারে তার ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তিগত উপদেষ্টা এ বৈঠকে উপস্থিত থেকে তাদের পরামর্শ দিতেন। তারা বৈঠকের আলোচনা ও গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে রাজীব গান্ধীকে অবহিত রাখতেন। এসব উপদেষ্টা সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনার বৈঠকে তাদের উপস্থিত থাকার এখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও গোপন বৈঠকে তারা অংশ নিতেন। ইন্দিরা গান্ধীর দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজীব গান্ধীকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হয়েছে। অবশ্য কাও নিরাপত্তা ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও দুই উপদেষ্টার বৈঠকে উপস্থিত থাকা অনুমোদন করলেও বৈঠকের কার্যবিবরণীতে তাদের নাম রাখতেন না।

এ কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইন্দিরার নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৈরি সেটআপে শিখ সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, যাতে তাদের পক্ষ থেকে কোনো হুমকি সৃষ্টি না হয়। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর কোনো বিশেষ প্রটেকশন গ্রুপ (এমপিজি) ছিল না। তার হত্যাকাণ্ডের পর এমপিজি গঠন করা হয়। দিল্লি পুলিশ থেকে বিশেষভাবে বাছাইকৃত পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে দৈহিক নিরাপত্তার জন্য নিবিড় প্রটেকশন গ্রুপ গঠন করা হয়। এ গ্রুপের দায়িত্ব ছিল ইন্দিরা গান্ধী নিজ আবাসস্থলে এবং দিল্লিতে থাকাকালে তার নিরাপত্তা বিধান করা। আইবি'র ভিআইপি নিরাপত্তা শাখার প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দিল্লি পুলিশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা এ গ্রুপের সমন্বয় করেন। আইবি'র ভিআইপি নিরাপত্তা শাখার প্রধান

নিজেও একজন সিনিয়র আইপিএস কর্মকর্তা ছিলেন। এ শাখায় আরও একজন সিনিয়র আইপিএস কর্মকর্তা রয়েছেন, যিনি রাজীব গান্ধী ও তার পরিবারের নিরাপত্তার বিষয় দেখাশোনা করতেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের কোনো দায়িত্ব 'র'-এর ছিল না। 'র' শুধু ইন্দিরা, রাজীব ও তার পরিবারের নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিদেশের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এ জন্য 'র'-তে দু'টি শাখা ছিল। এর একটির নাম ছিল ভিআইপি নিরাপত্তা শাখা আর অপরটি পরিচিত ছিল শিখ বহির্বিভাগ হিসেবে। আমি ছিলাম শিখ বহির্বিভাগের প্রধান। আর একজন সিনিয়র আইপিএস কর্মকর্তা ভিআইপি নিরাপত্তা শাখার প্রধান ছিলেন। বিষয় অনুসারে এসব কর্মকর্তা আইবি'র পরিচালক অথবা 'র'-এর পরিচালক অথবা দিল্লি পুলিশ প্রধানের মাধ্যমে কাওয়ের কাছে রিপোর্ট করতেন। আর কে ধাওয়ান ও এম এল ফোতেদারের মতো ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে দিল্লি পুলিশের কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত রাজীব গান্ধীর সহযোগীরাও দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগ করতেন। বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের কারণে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত এবং ফোনের আলাপে তা জানাজানিও হয়ে যেত।

অপারেশন ব্লু স্টারের পর একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কোনো শিখ কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর নিবিড় নিরাপত্তা টিমে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন না। এ সিদ্ধান্তের পর তার বাসভবনে নিয়োজিত সব শিখ কর্মকর্তাকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল কোনো কিছু ছিল না। সরকার প্রধানের নিরাপত্তা টিমে সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কোনো সদস্যকে নিযুক্ত না রাখা বিশ্বের বহু দেশেই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হিসেবেই অনুসরণ করা হয়। বহু বছর ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের বডিগার্ড হিসেবে আফ্রো-আমেরিকান কোনো কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয় না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে উত্তর আয়ারল্যান্ডের কোনো ক্যাথলিক পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতে গৃহীত এ সিদ্ধান্তকে অনাহূত সাম্প্রদায়িক রঙ ছড়িয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করে ফেলা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিবিড় নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে শিখ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের বিষয়টি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পৌঁছে। কেউ কেউ বলেন, এটি এমনিতেই তার দৃষ্টিতে আসে। অন্য কারো মতে, প্রধানমন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী কাওয়ের নির্দেশের বিষয়টি তার দৃষ্টিতে আনেন। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি নিজের অসন্তোষের কথা জানান। এরপর প্রত্যাহারকৃত শিখ কর্মকর্তারা আবার তার বাসভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বে ফিরে আসে। এরপরও কাওয়ের নির্দেশনা ছিল কোনো শিখ পুলিশ কর্মকর্তা এককভাবে প্রধানমন্ত্রীর নিবিড় নিরাপত্তা দায়িত্বে যেন না থাকেন। সব সময় একজন শিখ কর্মকর্তার সাথে একজন অ-শিখ পুলিশ কর্মকর্তাকেও রাখতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধীর দৈহিক নিরাপত্তা জোরদারের জন্য আরও বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে ছিল দিল্লিতে তার বাসভবনে বিস্ফোরকবিরোধী তল্লাশি

ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা এবং দিল্লিতে ও বাইরে তার যাতায়াতের জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করা। দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে 'র'-এর কোনো দায়িত্ব না থাকলেও এ ব্যাপারে সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভারতের কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারক বা গ্যারেজের বুলেটপ্রুফ গাড়ি নির্মাণের দক্ষতা তখন ছিল না। স্থানীয়ভাবে বুলেটপ্রুফ গাড়ি নির্মাণের আগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ থেকে একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি নিয়ে আসা ছিল খুবই সহজ। বুলেটপ্রুফ গাড়ির নির্মাতা পশ্চিম জার্মানির মার্সেডিজ বেঞ্জ কোম্পানির কাছে এ ধরনের একটি গাড়ির জন্য অর্ডার দেয়া যেত। বহু দেশের নিরাপত্তা এজেন্সি তাদের দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বুলেটপ্রুফ মডেলের মার্সেডিজ বেঞ্জ গাড়ি আনার ব্যবস্থা করে। রাজীব গান্ধী ছাড়া তার পূর্বসূরি বা উত্তরসূরিদের মতো ইন্দিরা গান্ধীও বিদেশী গাড়িতে চড়া চরমভাবে অপছন্দ করতেন। তারা ভারতীয় অ্যামবেসেডর গাড়িই নিজের জন্য পছন্দ করতেন। এ কারণে নিজস্বভাবে বুলেটপ্রুফ গাড়ি উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য 'র' একটি অ্যামবেসেডর গাড়ি কিনে তা পশ্চিম জার্মানিতে পাঠায় যাতে এটাকে বুলেটপ্রুফ করে দেয়া হয়। কাও এর সমন্বয় করার জন্য 'র'-কে এ কারণে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, 'র' প্রধান কেবিনেট সচিব হিসেবে গাড়ি আনার জন্য আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদনের ক্ষমতা রাখতেন। এর ফলে দ্রুত কাজ সম্পন্ন হয়।

ইন্দিরার নিরাপত্তা নিয়ে কাওয়ের আরও দু'টি সিদ্ধান্ত ছিল উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে একটি ছিল দক্ষ ডাক্তার ও নার্সসহ একটি অ্যাম্বুলেন্স সব সময় ইন্দিরা গান্ধীর কনভয়ের কাছাকাছি রাখা। এটি যেন তার অবস্থানের বাইরে কাছাকাছি কোথায়ও থাকে যাতে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সটি কনভয়ে যোগ দিতে পারে। ইন্দিরা তার বাড়ির অদূরে যা কনভয়ের সাথে একটি অ্যাম্বুলেন্স দেখতে চরমভাবে অপছন্দ করতেন। তার অপছন্দ সত্ত্বেও কাও অ্যাম্বুলেন্সটি সেখানে রাখার ব্যাপারে জোর দেন। তবে ইন্দিরা গান্ধীর অপছন্দের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে অ্যাম্বুলেন্সটিকে এমন স্থানে রাখতে বলা হয় যাতে এটি তার দৃষ্টিতে না পড়ে।

দ্বিতীয়টি ছিল বুলেটপ্রুফ অন্তর্বাস পরিধান। এ বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপনের আগে কাও যুক্তরাজ্য থেকে একটি বুলেটপ্রুফ অন্তর্বাস আনার সিদ্ধান্ত নেন। ইন্দিরার কাছে তার অন্তর্বাসের মাপ জানতে চাওয়ার সাহস কারো হচ্ছিল না। কাও ইন্দিরার একইরকম শারীরিক গড়নের একজনের ব্লাউজ নেন এবং তিনটি বুলেটপ্রুফ অন্তর্বাস ব্রিটেন থেকে বানিয়ে আনতে র-কে দায়িত্ব দেন। বলা হয়, এর একটি হবে হুবহু ব্লাউজের সমান মাপের এবং অন্য দু'টির একটি হবে সামান্য বড় অপরটি সামান্য ছোট। ইংল্যান্ড থেকে অন্তর্বাস আসার পর কাও এমএল ফোতেদারকে ফোন করেন এবং তাকে জানান, আমার মাধ্যমেই অন্তর্বাসগুলো তার কাছে পাঠানো হচ্ছে। তিনি ফোতেদারকে এর মধ্যে সুবিধাজনক সাইজের অন্তর্বাসটি পরতে শুরু করতে ইন্দিরার প্রতি অনুরোধ জানানোর জন্য বলেন। ফোতেদার এ বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপনের ব্যাপারে ইতস্তত করেন। তিনি মনে করেন, ইন্দিরা গান্ধী এগুলো পরতে চাইবেন না। কাও তা পরার প্রয়োজনের ওপর কঠোরভাবে জোর দেন। তিনি ফোতেদারকে তার বাসার নিরাপত্তা কর্মীদের বলতে

বলেন, 'আমি একটি প্যাকেট নিয়ে যাচ্ছি এবং নিরাপত্তা কর্মীরা যেন তা খুলে দেখাতে না বলে।' আমি অন্তর্বাসগুলোর প্যাকেট দেখানোর পর নতুন করে প্যাকিং করে তা ইন্দিরা গান্ধীর বাসায় নিয়ে যাই। এগুলো নিয়ে মেটাল ডিটেক্টরের দরজা পার হওয়ার সময় সতর্ক ঘণ্টা বেজে ওঠে। ফোতেদার নিরাপত্তা প্রহরীদের আগে থেকেই বলে রাখার কারণে তারা আমাকে প্যাকেট খোলার জন্য বলেনি। নিরাপত্তা কর্মীদের একজন আমাকে ফোতেদারের কক্ষে নিয়ে যান এবং আমি আসার বিষয়টি তাকে জানান। ফোতেদার এসে বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লাহ্ ইন্দিরার সাথে রয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমাকে তিনি অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি বাইরে একটি চেয়ার দেয়ার জন্য নিরাপত্তা প্রহরীদের বলেন।

আব্দুল্লাহ্ বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এক ঘণ্টা আমি সেখানে অপেক্ষা করি। আমি লক্ষ করি, তল্লাশি অথবা সাথে নিরাপত্তা প্রহরী ছাড়াই বাসার চাকররা বাড়ির পুরো আঙিনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিচিত একটি কোম্পানির কোমল পানীয়ের মিনি পরিবহন ভ্যান বিস্ফোরক প্রতিরোধক তল্লাশি ছাড়াই বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করে। এ কোমল পানীয়ের মালিক কংগ্রেসের (আই) একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এই কোমল পানীয়ের ভ্যানের সাথে কোম্পানির লোক ছাড়া কোনো নিরাপত্তা কর্মীই ছিল না। কোম্পানির দু'জন কর্মচারী রুমে রুমে ঢুকে ব্যবহার করা বোতল পাল্টে নতুন পানীয় দিয়ে যাচ্ছে। এ দু'জনের একজনকেও নিরাপত্তা তল্লাশি করা হয়নি। বোতল রাখার বাক্সে কোনো বিস্ফোরক ডিভাইস লুকানো আছে কিনা তাও তল্লাশি করে দেখা হয়নি। পুরো এলাকা ঘুরে বেড়ানোর সময় কোম্পানির লোকদের সাথে নিরাপত্তা প্রহরীরা থাকেনি।

প্রায় ১ ঘণ্টা পর ফারুক আব্দুল্লাহ্ বেরিয়ে যান। ফোতেদার আসেন। আমার কাছ থেকে অন্তর্বাসের প্যাকেটটি নেন এবং বলেন কাও নিজে কেন এটি দিলেন না? কেন তিনি এটি দেয়ার জন্য আমাকে বেছে নিলেন? আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি অন্তর্বাসের কোনটি ইন্দিরার গায়ে লেগেছিল অথবা বুলেটপ্রুফ কোনো অন্তর্বাস আদৌ তার ফিট হয়েছিল কিনা। এক দিন শুনেছিলাম তিনি দুয়েকবার তা পরার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়ার কারণে এগুলো পরতে বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। অনিয়মিতভাবে এসব বুলেটপ্রুফ অন্তর্বাস তিনি পরিধান করতেন। আমি কাওয়ের কাছে ফিরে গিয়ে আমার দেখা পুরো বিষয় খুলে বলি। আমি তাকে বলি যে ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ির ভেতরে যে বাহ্যিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তা একেবারেই ভঙ্গুর। তিনি বলেন, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলবেন। আমি শুনেছিলাম পরদিনই কাও তা করেছিলেন এবং তারা কোনো শৈথিল্য থাকার কথা অস্বীকার করেন।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর সকাল ৮টার দিকে স্বাভাবিক নিয়মে আমি অফিসে যাই। কিছুক্ষণ পর তখনকার র প্রধান জি সি স্যাক্সেনার একটি ফোন পাই। তিনি বলেন, 'রমন, প্রধানমন্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, আমি তার বাসায় আছি। অফিসে আসতে আমার দেরি হবে। তুমি সবকিছুর প্রতি খেয়াল রেখো।' বিস্তারিত কিছু

জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি ফোন রেখে দেন। আমি ছিলাম সাক্সেনার স্টাফ অফিসার। ইন্দিরা গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক মিলিশিয়ার বার্ষিক কুচকাওয়াজে ছিলেন অনেক পদস্থ কর্মকর্তা। ইন্দিরার চীন সফরের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তার পরামর্শে কাও চীনা নেতা ও কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বেইজিং যান। এ সময় আমি ধাওয়ানের কাছ থেকে একটি ফোন পাই। তিনি বলেন, আমি অব্যাহতভাবে কাওয়ের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। তিনি কোথায়? আমি ধাওয়ানকে জানাই কাও বেইজিংয়ে। তিনি বলেন, কাওকে জানান প্রধানমন্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি যেন জরুরিভাবে দেশে ফিরে আসেন। আমি তাকে বললাম, বার্তাটি আমি এখনই সাক্সেনার কাছে পৌঁছাচ্ছি। আমি সাথে সাথেই তার বার্তাটি পৌঁছাই।

এর মধ্যে অন্যান্য সূত্র থেকে আমি বিস্তারিত তথ্য পেতে শুরু করি। এ দিন ইন্দিরা গান্ধী তার সব সরকারি কর্মসূচি বাতিল করে নাতীদের সাথে সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দুই শিখ দেহরক্ষীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন। পরিকল্পিতভাবে দিন পরিবর্তন করে তারা একই দিন ডিউটিতে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। হত্যার ঘটনা ঘটার পরপরই দুই হত্যাকারী অন্য নিরাপত্তা রক্ষীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়। একজন সাথে সাথেই মারা যায়। এতে ধারণা করা হয় যে, নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে অনেকেই এ ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। ষড়যন্ত্র যাতে উদঘাটিত হতে না পারে তার জন্য পুলিশের কেউ একজন হত্যাকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে গুলি করে মেরে ফেলে। আগে থেকেই নির্দেশনা ছিল দুই শিখ নিরাপত্তা কর্মী একই সাথে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে না। নিরাপত্তা দায়িত্বে একজন শিখ সদস্য থাকলে সাথে একজন অ-শিখ সদস্যও থাকবে। এ নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী দিনটি বাড়িতে কাটাবেন বলে বুলেটপ্রুফ অন্তর্বাসও পরেননি। ভালো চিকিৎসক এবং ওষুধসহ উন্নত মানের অ্যাম্বুলেন্সও সেখানে ছিল না যাতে দ্রুত রক্ত দেয়া সম্ভব হয়। সোনিয়া গান্ধী হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। অবশ্য ভারতে সরকারিভাবে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর খবর অনেক দেরিতে প্রকাশ করা হয়। বিবিসি এর অনেক আগেই মৃত্যুর খবরটি প্রচার করে।

অপারেশন ব্লু স্টার পরিচালিত হওয়ার পর সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষার ব্যাপারে সব ধরনের নিরাপত্তা প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধীর এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আইবি'র ডাইরেক্টরসহ আইবি ও দিল্লি পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেয়া হয়। আইবি'র ভিআইপি নিরাপত্তা বিভাগের প্রধানকে তার নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়। এক দু'জন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার জন্য বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজিব গান্ধী হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন।

এ সময় ভারতীয় গোয়েন্দা ও দিল্লি পুলিশের সুনাম ধুলায় মিশে যায়। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান যেটি হওয়ার কথা সেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিজ নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে এতটা সহজ হত্যাকাণ্ডের শিকার ইন্দিরা গান্ধী হয়ে

গেলেন। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনগণকে যারপরনাই মর্মাহত করে। পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের এমন কেউ ছিল না লজ্জায় যার মাথা হেঁট হয়ে পড়েনি। স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে এর নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার আদেশ দিয়ে সাহসের সাথে সর্বোত্তমভাবে ইন্দিরা গান্ধী তার কর্তব্য পালন করে গেছেন। তিনি তার নিজ নিরাপত্তার জন্য আমাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। আমরা সে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি। এটি ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায়।

ইন্দিরার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে গুজব এবং ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব অগ্নিশিখার মতো ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়, খালিস্তানি ও আইএসআই'র দাবার ঘুঁটি হিসেবে কাজ করেছে ঘাতক শিখ দেহরক্ষীরা। বলা হয়– একজন চক্রান্তকারী ছুটিতে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে তার গ্রামে যায় এবং সেখান থেকে গোপনে আইএসআই কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য পাকিস্তান যায়। আবার বলা হয়– এই হত্যাকাণ্ড আইএসআই ও সিআইএ'র যৌথ প্রযোজনায় সংঘটিত হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস আগে এক আমেরিকান একাডেমিক ব্যক্তিত্ব ইন্দিরার মৃত্যুর পর ভারতে কী ঘটতে পারে মর্মে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এ বিষয়টি গুজবের ডালপালা ছড়াতে সাহায্য করে। বিস্ময়করভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মার্কিন অধ্যাপকের এই সমীক্ষার ব্যাপারে একেবারে বেখবর ছিলেন। এ শিক্ষাবিদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কেও তাদের খুব সামান্যই জানা ছিল।

যে বিচারপতিকে তদন্ত চালানোর জন্য বাছাই করা হয়েছিল সেটি মোটেই ভালো বাছাই ছিল না। সুনির্দিষ্ট অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক তদন্তের পরিবর্তে যে রিপোর্টটি তার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাতে ছিল ঘটনার যোগসূত্রের আতিশয্য এবং অনুমাননির্ভর উপসংহার টানা হয় এতে। খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে দিল্লির গুরুদুয়ারা এবং দিল্লি পুলিশের শিখ কর্মকর্তারা এ ষড়যন্ত্র করেছেন এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ ছিল না। সন্ত্রাসীরা নিজ উদ্যোগেই হয়তো তাদের ষড়যন্ত্রের বিস্তার ঘটিয়েছে। দিল্লি পুলিশ এবং গুরুদুয়ারার কিছু শিখের সংশ্লিষ্টতাও এতে থাকতে পারে। শিখ পুলিশ কর্মকর্তারা হয়তো সফল হয়েছে যেখানে সন্ত্রাসীরা সাফল্য পেত না। পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে তারা জানত যোগাযোগের নিরাপত্তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে তারা একজনের সাথে অন্যজনের যোগাযোগের জন্য টেলিফোন পরিহার করেছে। এ কারণে ষড়যন্ত্রের আসন্ন বাস্তবায়ন সম্পর্কে কিছু কোনো কারিগরি ব্যবস্থায় বা টেকইন্টে ধরা পড়েনি। শুধু এ সম্পর্কে জানা যেত যদি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট শিখ পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর তারা দিল্লিতে থাকা এবং বাইরে যাওয়ার সর্বাবস্থায় নিবিড় মানব নজরদারিতে তথা হিউমিন্টের আওতায় তাদেরকে আনা হতো। বাস্তবে এটি করা হয়নি। পদস্থ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতেও শৈথিল্য ছিল।

কে এই হত্যাকাণ্ড থেকে সুবিধা তুলে নিয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই পাকিস্তান। যুক্তরাষ্ট্রও সম্ভবত। এ ঘটনায় তাদের যুক্ত থাকার প্রমাণ না থাকার মানে এই নয় যে, তারা এর সাথে যুক্ত ছিল না। তারা যদি সত্যি সত্যিই যুক্ত থেকে থাকে

তবে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তারা সব লিংক বা যুগসূত্র গোপন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাস এ ঘটনায় বিদেশী সংশ্লিষ্টতা ছিল কিনা তার জবাব নাও পেতে পারে।

ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার খবর প্রকাশের পর শিখবিরোধী দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। র-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বহুসংখ্যক শিখ কর্মরত ছিল। দাঙ্গার খবর শোনার পর সাক্সেনা আমাকে বলেন, সব শিখ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে আমি যেন তাদের পরিবার-পরিজনসহ র অফিসে চলে এসে দাঙ্গা না থামা পর্যন্ত সেখানে থাকতে বলি। আমি তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করি। জুনিয়র পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে র অফিসে চলে আসেন। কেউ কেউ তাদের আত্মীয়-পরিজনের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যরা তাদের বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং র-কে পরিবার-পরিজন ও তাদের জন্য বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। দিল্লি পুলিশের সহায়তায় আমরা সেটি করেছিলাম।

কাও ইন্দিরা নিহত হওয়ার পরবর্তী তাৎক্ষণিক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে জেনেছিলেন। বেইজিং সফর সংক্ষিপ্ত করে দিল্লি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এয়ার ইন্ডিয়ার টোকিও থেকে হংকং হয়ে দিল্লি আসার একটি ফ্লাইট ছিল। কিন্তু এ ফ্লাইট ধরার মতো বেইজিং থেকে হংকং পর্যন্ত কোনো ফ্লাইট ছিল না। কাওয়ের এ সমস্যার কথা জানতে পেরে চীনা কর্তৃপক্ষ হংকং এসে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি ধরার জন্য একটি বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেয়। কাও এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী মধ্যরাতে দিল্লি পৌঁছেন। বিমানবন্দরে সাক্সেনা তাকে অভ্যর্থনা জানান। আমিও তার সাথে যাই। সাক্সেনা কাওয়ের সাথে তার বাসা পর্যন্ত যান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। এ ব্রিফিংয়ের সময় আমি থাকিনি। ইন্দিরার শেষকৃত্যের এক দিন পর কাও রাজিব গান্ধীর সাথে দেখা করেন এবং কেবিনেট সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র উপদেষ্টার পদ থেকে তার ইস্তফা দানের ইচ্ছার কথা জানান। রাজিব গান্ধী তার অনুরোধ গ্রহণ করেন।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কাওয়ের জন্য দু'টি কারণে অত্যন্ত বেদনার ছিল। প্রথমত, আইবি ও দিল্লি পুলিশের যেসব কর্মকর্তার ওপর তারা ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হবেন বলে তিনি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাদেরই দায়িত্ব অবহেলা এবং তদারকির শৈথিল্যের কারণে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইন্দিরা গান্ধীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এমন এক সময় ঘটে যখন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার ওপর। ইন্দিরা দীর্ঘ তিন দশক ধরে কাওকে জানতেন এবং তার বিচার-বুদ্ধি ও পরামর্শের প্রতি ছিল অগাধ আস্থা। তার এ বেদনার বিষয়টি কোনোদিন কাও নিজের চেহারায় ফুটে উঠতে দেননি। ইন্দিরাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় হৃদয়ে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার সেই অনুভূতি একান্ত ঘনিষ্ঠ কারো সাথে কোনোদিন আলোচনাও করেননি কাও।

পরিচ্ছেদ : বার

সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাও

অবসর নেয়ার পর ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কাও ইন্দিরা গান্ধীর সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে দায়িত্ব পালন করেন। তবে তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত 'র'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান হিসেবে যে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছেন, সে ধরনের কোনো তৎপরতা এ সময়ে প্রদর্শন করতে পারেননি। সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে তার প্রধান কাজ ছিল জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত সব বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে পরামর্শ দেয়া এবং গোয়েন্দা সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন করা। জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে তিনি যে সব পরামর্শ দিতেন সেগুলো শ্রদ্ধার সাথে শোনা হতো এবং এতে ইন্দিরা গান্ধী ও তার সিনিয়র কর্মকর্তারা বেশ লাভবান হতেন। আফগান পরিস্থিতি, পাঞ্জাবে সহিংসতা, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক এবং শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যাসংক্রান্ত বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন। ওয়াশিংটন ডিসি'র সাথে তার উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগের ফলে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি রিগ্যান প্রশাসনের বৈরী মনোভাব অনেকটা দূর হয়। তবে গোয়েন্দা সমন্বয়কারী হিসেবে তিনি ততটা সফল ছিলেন না। কেননা আইবি'র কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। তারা মনে করতেন গোয়েন্দা সমন্বয়কারীর দায়িত্ব তার জন্য মানানসই নয়।

১৯৪০ সালে ভারতীয় পুলিশে যোগদানকারী কাও ১৯৪৭ সালে আইবি'তে যোগদানের আগে প্রথম দিকে উত্তর প্রদেশে কাজ করতেন। 'র'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি প্রায় দুই দশক আইবি'তে কাটান। আইবি'তে শুরুর বছরগুলোতে তার কাজ ছিল বাহ্যিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়াদি দেখভাল করা। এই কাজের অংশ হিসেবে তাকে ১৯৫৫ সালের ১১ এপ্রিল কাশ্মীরের প্রিন্সকে বহনকারী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করতে হয়েছিল। দুর্ঘটনাকবলিত ওই বিমানে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে আফ্রো-এশিয়ান শীর্ষ বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে চীনা ও পূর্ব ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল ও সাংবাদিকরা ছিলেন। বিমানটি হংকং থেকে জাকার্তা যাচ্ছিল। বিমানের মধ্যে একটি বিস্ফোরণের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনার জন্য

কেএমটি গোয়েন্দাদের সন্দেহ করা হয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর কাও মার্কিন গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় ডাইরেক্টর জেনারেল অব সিকিউরিটির (ডিজিঅ্যান্ডএস) অংশ হিসেবে অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টারকে (এআরসি) গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। তিনি এআরসি'র ডাইরেক্টর ছিলেন। এ সুবাদে তিনি মার্কিন গোয়েন্দাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়ে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যা পরবর্তী সময়ে 'র'-এর জন্য বেশ উপকারী হয়েছিল। তবে আইবি'তে গোয়েন্দা বিশ্লেষণ ও অপারেশনাল ওয়ার্কে তার ভূমিকা সীমিত ছিল। ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক 'র'-এর প্রথম প্রধান নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার আগে কাও বৈদেশিক গোয়েন্দা এবং ভারতে কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ড দেখাশোনার জন্য জয়েন্ট ডাইরেক্টরের পদমর্যাদায় চার বছরের জন্য বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ ও অপারেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

পরলোকগত এম এম এল হোজ্জার নেতৃত্বে একদল আইবি কর্মকর্তা আইবি'কে খণ্ডিত করে 'র' সৃষ্টির জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ সময় হোজ্জা ডিআইবি ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে 'র' গঠন করার পর কাও'কে 'র'-এর প্রথম প্রধান করার সিদ্ধান্তেও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আইবিতে অ্যানালাইসিস ও অপারেশনাল ওয়ার্কে সীমিত ভূমিকা ছিল বিধায় তারা কাও'কে ওই পদের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। কাও 'র' প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজকর্মে তারা বাধার সৃষ্টি করেন। তারা আইবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখাসংক্রান্ত সব কাগজপত্র তাকে দিতেন না। মোট কথা তারা তাকে চরম অসহযোগিতা করেন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা যারা আইবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখায় ছিলাম তাদের স্মৃতিশক্তির সহযোগিতায় কাও 'র'কে বলতে গেলে শূন্য থেকে দাঁড় করিয়েছিলেন।

আমরা ভাড়া করার মতো বেসরকারি বাড়ি খুঁজে বের করার আগেই আইবি'র লোকেরা আমাদের কাউকে কাউকে অযৌক্তিকভাবে তাদের অফিস ছেড়ে দিতে পর্যন্ত বলতেন। কাও আমাদের কাউকে কাউকে ফিল্ডে কর্মরত আইবি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য আইবি'র প্রতিষ্ঠিত সীমান্ত ফাঁড়িতে পাঠাতেন। আমাকে দীর্ঘ সফরে উত্তর-পূর্বে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার আইবি কর্মকর্তারা ভদ্র ছিলেন। তবে তারা আমাদেরকে তেমন তথ্য সরবরাহ করতেন না। হোজ্জা এবং তার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তারা আইবি'র মনিটরিং শাখার সম্পদ ভাগাভাগির ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করতেন। আইবি'র মনিটরিং শাখার কাজ ছিল কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য বা টেকইন্ট সংগ্রহ করা।

বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে লিয়াজোঁ স্থাপনকাজে ব্যবহৃত আইবি'র লিয়াজোঁ শাখা এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব সিকিউরিটিকে (ডিজিএস) ডিআইবি'র অধীনে রাখার ব্যাপারে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী এতে রাজি না হয়ে সেগুলোকে কাও'য়ের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেন। লিয়াজোঁ শাখা 'র'-এর অংশ হয়ে গেলেও ডিজিএস একটি পৃথক সত্তা হিসেবে বজায় থাকে। তবে কাও তার প্রধান থাকেন। এভাবে কাও 'র' এবং ডিজিএস দুটোরই প্রধান হিসেবে দায়িত্ব

পালন করছিলেন। তখন থেকেই এই ধারা চলে আসছে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে কাওয়ের চমৎকার সাফল্য, নীতিনির্ধারক মহলে তার প্রভাব এবং ইন্দিরা গান্ধীর একজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে তার আবির্ভাব হোজ্জার সাথে ঘনিষ্ঠ আইবি কর্মকর্তাদের ঈর্ষাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। হোজ্জার অনুগত এসব কর্মকর্তা যত দিন আইবিতে চাকরি করেন ততদিন আইবিকে খণ্ডিত করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর পদক্ষেপের যৌক্তিকতার প্রতি তাদের যে মানসিক আপত্তি ছিল সেটা কাও এবং 'র'-এর প্রতি তাদের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে থাকে। তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যে, যেহেতু ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যার অনেকগুলোই আন্তঃসীমান্তের সাথে যুক্ত এবং এগুলোর উদ্ভব ঘটছে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক থেকে, তাই ওই সংস্থারই উচিত অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করা।

অবসর গ্রহণের বেশ পর আমি একবার ঘটনাক্রমে তখনকার আইবি প্রধানের সাথে একই বিমানে করে কোথাও যাচ্ছিলাম। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সমস্যাসংক্রান্ত এক আলাপচারিতায় তিনি বলেন, এসব সমস্যার অনেগুলোই আইবিকে খণ্ডিত করে ইন্দিরা গান্ধী যে আদি পাপ করেছিলেন সেটারই ফল। তিনি এ দুটো সংস্থাকে আবার এক করার পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করেন।

কাও এবং 'র'-এর ব্যাপারে হোজ্জার আমলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত আইবি'র কিছু সি-নয়র কর্মকর্তার নেতিবাচক মনোভাব ১৯৮১ সালে সিনিয়র অ্যাডভাইজারের দায়িত্ব গ্রহণের পর কাওকে সহযোগিতা করার প্রশ্নে অবশ্যই প্রভাব ফেলে। তিনি সব স্তরের 'র' কর্মকর্তাদের কাছ থেকে চমৎকার সহযোগিতা পেলেও আইবি'র ব্যাপারে কেউ সে কথা বলতে পারবেন না। এমন কিছু কর্মকর্তা ছিলেন যারা আইবি'তে কাওয়ের অধীনে চাকরি করেছিলেন। কেবল তারাই তাকে প্রভূত সম্মান করতেন। তারা তার প্রতি সর্বান্তকরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আবার এমন কিছু কর্মকর্তাও ছিলেন যারা তার প্রতি হোজ্জার মতো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ফলে তাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি।

১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত 'র' প্রধান হিসেবে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্য সিনিয়র উপদেষ্টা থাকাকালে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ণ আস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হন। ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে তার খ্যাতির ফলে যেসব বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে 'র'-এর লিয়াজোঁ ছিল, তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই তাকে তাদের সদর দফতরে আলোচনার আমন্ত্রণ জানাত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী তৎকালীন 'র'-প্রধানের পরিবর্তে কাওকে দিয়ে কাজ করাতে পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে আফগানিস্তান প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধীর নীতির প্রতি রিগ্যান প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য কাওকে ওয়াশিংটন ডিসি ও বেইজিং পাঠানোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে কাওকে পাঠানোর লক্ষ্য ছিল চীনে ইন্দিরা গান্ধীর সম্ভাব্য সফরের আগে যুগোশ্লাভ গোয়েন্দাদের সহায়তায় চীনা কর্মকর্তাদের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর নিহত হবার কারণে আর সেই চীন সফর অনুষ্ঠিত হয়নি। এ

ব্যাপারে আরও একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী লালদেঙ্গার সাথে সংলাপের সূচনা এবং জুরিখে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একজন শিখ নেতার সাথে আলোচনার জন্য 'র' প্রধানের পরিবর্তে কাওকে বেছে নিয়েছিলেন। তবে এসব আলোচনা চলাকালে 'র' প্রধানের কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে কাও সতর্ক ছিলেন।

কাও ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা থাকাকালে 'র'-এর দু'জন প্রধান ছিলেন। ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাই কর্তৃক প্রধান নিযুক্ত হওয়া সানতুক ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে অবসর গ্রহন পর্যন্ত সংস্থাটির প্রধান থেকে যান। এরপর জিসি সাক্সেনা তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৮৬ সালে অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি 'র'-এর পরিচালক (র-প্রধানের নতুন পদবি) পদে বহাল ছিলেন। তাদের দু'জনের সাথে কাওয়ের চমৎকার সম্পর্ক ছিল বলে তাকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কাও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন যে, তিনি যাতে কোনোভাবেই তাদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার পথে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ান।

ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে মোরারজি দেশাই এবং চরণ সিংয়ের আমলে স্থগিত রাখা গোপন তৎপরতা চালানোর ক্ষমতাকে সানতুক পুনরুজ্জীবিত করেন। ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন যে, 'র' তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানের আহ্বানে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিক। সানতুক ও সাক্সেনার অধীনে 'র' মালদ্বীপ, উগান্ডা, মোজাম্বিক, বতসোয়ানা, মালাবি, জাম্বিয়া, জিম্বাবি, মরিশাস এবং সিসিলির গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। 'র' দক্ষিণ আফ্রিকার এএনসি এবং নাবিবিয়ার সোয়াপো ক্যাডারদেরও প্রশিক্ষণ দেয়। পুলিশ ও বিমান বাহিনী থেকে নেয়া 'র'-এর দু'জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ইন্টেলিজেন্স ইন্সট্রাক্টর হিসেবে জাম্বিয়া পাঠানো হয়। অন্যান্য কাজ ছাড়াও এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। এই প্রশিক্ষণের সুবাদে আমি এসব দেশ বেশ ক'বার সফর করি। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি এসব দেশের নেতাদের অগাধ শ্রদ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তারা ভারত বলতে ইন্দিরা গান্ধীর দেশ বুঝাত। ইন্দিরা গান্ধী তার নানা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ততা সত্ত্বেও এসব দেশের নেতাদের সাহায্যের আবেদনের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে সময় বের করে নিতেন। ইদি আমিনের স্থলাভিষিক্ত উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ড. মিল্টন ওবোতে ইন্দিরা গান্ধীর পরম ভক্ত ছিলেন। ইদি আমিনের শাসনামলে যেসব সিন্ধি ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত অন্যান্য ব্যবসায়ী উগান্ডা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, ভারত যাতে তাদেরকে পুনরায় ব্যবসা করতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে দেশে পাঠায়, সে ব্যাপারে মিল্টন বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি এটাও চেয়েছিলেন যে, ভারতীয়রা তার দেশে পর্যটন ও হোটেল ব্যবসা করুক। দুর্ভাগ্যজনক হলো এই যে, কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ীই আর সে দেশে ফিরে যেতে রাজি হননি।

সানতুক 'র' প্রধান থাকাকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো এমন অভিযোগ উত্থাপন করে যে, বিদেশে কর্মরত 'র' কর্মকর্তারা অস্বাভাবিক রকমের

জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করছেন। তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব (পরলোকগত) আরডি শেঠ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কর্মরত একজন র-কর্মকর্তা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে সানতুককে চিঠি লেখেন। এতে শেঠ বলেন, অত্যন্ত ব্যয়বহুল মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ি কেনার অর্থ তিনি কোথা থেকে জোগাড় করলেন? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উত্তর আমেরিকায় কর্মরত অপর এক 'র' কর্মকর্তার ব্যাপারে অনুরূপ চিঠি পাঠিয়েছিল। ওই কর্মকর্তা তাদের ভাষায় একটি ব্যয়বহুল মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ি কেনার আদেশ দেন এবং বিদেশে চাকরির উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগের আগেই তার মূল্য পরিশোধ করেন। চিঠিতে তারা জানতে চায়, ওই কর্মকর্তা ভারতে থেকে কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছেন? নরসিমা রাও আমাকে বলেছিলেন, বিদেশ সফরকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত 'র' এবং আইবি কর্মকর্তারা সবচেয়ে বড় ও দামি গাড়ি ব্যবহার করছেন। তিনি প্রশ্ন করেন, তারা এত টাকা পায় কোথায়? তিনি আরও উল্লেখ করেন, এসব দামি গাড়ির কারণে সিআইএ ও অন্যান্য বিদেশী গোয়েন্দারা সহজে ভারতীয় গোয়েন্দাদের শনাক্ত করে ফেলবে, কেননা অন্য কোনো কর্মকর্তা এ ধরনের দামি গাড়ি ব্যবহার করেন না। মুষ্টিমেয়সংখ্যক হলেও 'র' কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ সংস্থাটির জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সানতুক অনেক কষ্টে পররাষ্ট্র সচিবকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, এই সংস্থার মধ্যে বেশিরভাগ কর্মকর্তাই সৎ এবং তারা কোনোরকমে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করেন। তবে এর মধ্যেও দু-একটা পচা ডিম থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১৯৮৩ সালের ৩১ মার্চ অবসরে যাওয়ার ঠিক আগে ভারতের এক চিরাচরিত মিত্র একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা চায়। মুষ্টিমেয়সংখ্যক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এক অতি গোপন বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনার পর ইন্দিরা গান্ধী কাওয়ের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি ওই দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সাথে আবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে সানতুককে পাঠানোর পরামর্শ দেন। তিনি ১৯৮৩ সালের ৩১ মার্চের পর সে দেশ সফর করে ফিরে আসেন। ফলে তিনি ওই দিন 'র' প্রধান হিসেবে সাক্সেনার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেননি। ওই দিন তার সম্মানে স্থানীয় একটি হোটেলে সংস্থার লোকজন যে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, সেটা কোনোরূপ কারণ দর্শানো ছাড়াই স্থগিত করে দেয়া হয়। এতে করে সানতুকের অবস্থান সম্পর্কে কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। ১৯৮০ সালের ধর্মঘটে অংশ নেয়ার কারণে মিনিস্ট্রিরিয়াল ক্যাডারের একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ওই অসন্তুষ্ট কর্মকর্তা কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি শীর্ষ দৈনিকের দিল্লি সংবাদদাতাকে 'র' এর মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলে জানান। বলা হয়, সানতুক সাক্সেনার কাছে যথাযথভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর না করেই যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গেছেন এবং সাথে করে সংস্থাটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে গেছেন। এ সংক্রান্ত সংবাদ পত্রিকাটি তার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলামে ছেপেছিল। সংস্থার একজন ক্ষুব্ধ ও বৈরী কর্মকর্তার দেয়া মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এ সংবাদের প্রতিবাদ দেয়ার জন্য আমরা সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। আমরা দাবি করেছিলাম পত্রিকাটিকে এই মিথ্যা প্রতিবেদন

ছাপার জন্য 'র' এর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। সরকার পরে বিষয়টি প্রেস কাউন্সিলে উত্থাপন করে। প্রেস কাউন্সিল মিথ্যা খবর ছাপা এবং পরে আমাদের প্রতিবাদ ছাপতে অস্বীকৃতি ও ক্ষমা না চাওয়ার জন্য পত্রিকাটিকে ভর্ৎসনা করেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর যে কোনোভাবেই জেনে ফেলে যে, একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে একটি স্পর্শকাতর অনুরোধ জানিয়েছেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর পীড়াপীড়িতেই সানতুক আরও আলোচনার জন্য সে দেশটি সঙ্গোপনে সফর করেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর দিল্লিতে তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে খবরটি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা অনুসন্ধানী সাংবাদিক এটি জানতে পেরেছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ঐ দেশ দিল্লিকে এ ধরনের কোনো অনুরোধ জানিয়েছে কিনা তা চেক করে দেখতে বলেন। যদি তা ঠিক হয়ে থাকে তাহলে ভারতের প্রতিক্রিয়া কী তা জানতে চেয়ে মার্কিন দূতাবাস দিল্লিতে পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে একটি বার্তা পাঠায়। ইন্দিরা গান্ধীর আহূত অল্পসংখ্যক বাছাই করা সিনিয়র লোকের অংশগ্রহনে অতি গোপনীয় একটি সভার আলোচ্য বিষয় কিভাবে মার্কিন দূতাবাস জানতে পারল তা ভেবে দিল্লির কূটনৈতিক মহল বিস্মিত হয়। একজনকে বলা হয়, ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে আইবি'র তদন্তের ফলে এরূপ সন্দেহ জোরালো হয় যে, বৈঠকে অংশ নেয়া একজন ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারের মাধ্যমে সম্ভবত ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেছে। এতে ওই ব্যক্তির পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত হয় এবং পেশাগত দক্ষতার ব্যাপারে খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি আর শীর্ষ পদে উন্নীত হতে পারেননি। বিদেশে অতি গোপন সফর শেষে সানতুক দেশে ফিরে আসার পর ১৯৮৩ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে গ্রে নামে পরিচিত গিরিশ চন্দ্র সাক্সেনা 'র'-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 'র'-এর 'জেন্টেলম্যান প্রফেশনালস'-এর শেষ ব্যক্তি। যার স্থান কাও, শংকর নায়ার ও সানতুকের পরই। তারা শুধু অতি দক্ষ পেশাদার ব্যক্তিই ছিলেন না। তাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলি ছিল যে কারণে মানুষ তাদের এমনিতেই ভালোবাসতো। খাটো করে দেখার মতো কিছু তাদের মধ্যে নেই। তারা সবাই অসাধ্য সাধন করেছিলেন এবং নিজ নিজ সময়কার প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল আকাশচুম্বী। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের নেটওয়ার্ক ছিল। তারা 'র' কর্মকর্তাদের জন্য গর্বের ধন। তবে তারা নিজেরা কখনও নিজেদের নিয়ে বড়াই করতেন না।

উত্তর প্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার সাক্সেনা 'র'-এর কার্যক্রম যখন শুরু হয় ঠিক সে সময় উত্তর প্রদেশ থেকে এসে সংস্থার পাকিস্তান ও ইসলামি দুনিয়ার বাদবাকি অংশ নিয়ে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ শাখার প্রধান হিসেবে যোগ দেন। 'র'তে চাকরির শুরুর বছরগুলোতে তিনি একজন চমৎকার বিশ্লেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ঠিক আগের কিছু মাসে তিনি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং সে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোথায়

গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে সংক্রান্ত যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা পরে অকাট্য প্রমাণিত হয়। তিনি ছিলেন কিংবদন্তির 'কাওবয়দের' একজন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাকে রেঙ্গুনে 'র' প্রধান হিসেবে বদলি করা হয়। সেখানে তার কার্যকাল শেষ করে ফের সদর দফতরে ফিরে এসে তিনি পাকিস্তানবিষয়ক এনালাইসিস ও অপারেশন সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সানতুক তাকে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সাথে লিয়াজোঁ স্থাপন করার দায়িত্ব দিয়ে লন্ডনে নিয়োগ দান করেন। তার কার্যকালে ১৯৮৫ সালের পর সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগিতার গুরুত্ব যতটা বৃদ্ধি পায় ততটা আগে কোনদিন হয়নি। তাই সে সময় চীন, পাকিস্তান এবং অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা তথ্যবিনিময় এবং ভারত ও যুক্তরাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়া হতো।

সানতুক তাকে লন্ডনে তার ৩ বছরের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯৮০ সালে দেশে তলব করেন। তাকে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে বরখাস্তকৃত শিবরাজ বাহাদুরের স্থলাভিষিক্ত হতে হয়েছিল। শিবরাজ বাহাদুর 'র'-এর চৌকস কর্মকর্তা ছিলেন। সাক্সেনা সানতুকের পক্ষে পাকিস্তান সংক্রান্ত প্রশাসনিক এনালাইসিস এবং অপারেশন শাখাগুলোর সব কার্যক্রম তদারক ও সমন্বয় করেন। তিনি পুনরায় গোপন তৎপরতা ক্ষমতার কার্যকর একটি ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হন।

সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাও তার কার্যকালে শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের একটি সক্রিয় নীতির সূচনা প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীলঙ্কায় ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ স্বার্থসংশ্লিষ্টতা এবং দেশটিকে নিয়ে তার উদ্বেগের সূত্রপাত ঘটে ১৯৭১ সালে। সে সময় শ্রীলঙ্কা সরকার তার বিরক্তির উদ্রেগ করে পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর বিমানগুলোকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা-যাওয়ার সময় কাতুনায়ের বিমানবন্দরে পুনরায় জ্বালানি সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল। এর আগে ভারত তার আকাশসীমায় পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে। শ্রীমাভো বন্দর নায়েকের সাথে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী চীনের সাথে শ্রীলঙ্কার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতের নিরাপত্তার প্রতি যে হুমকি সৃষ্টি করেছিল সেটার ব্যাপারে চোখ বুজে থাকেননি। তবে চীনের সাথে শ্রীমাভো বন্দর নায়েকের দহরম-মহরম ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭১ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার নেত্রীর কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পাঠানো একটি এসওএস বার্তার ব্যাপারে ত্বরিত সাড়া দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এ সময় জনতা ভিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি) নামক একটি উগ্র মার্কসবাদী দল সারাদেশে একযোগে হামলা চালিয়ে ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সে সময় 'র' প্রধান কাও ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে 'র'তে কর্মরত মহারাষ্ট্র ক্যাডারের একজন অফিসারকে দ্রুত কলম্বো পাঠান। ওই কর্মকর্তা ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিস মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দমনে সফলতার পরিচয় দেন। ওই কর্মকর্তা কিছু সময়ের জন্য কলম্বো অবস্থান করেন এবং জেভিপি বিদ্রোহীদের কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে বন্দর নায়েক এবং তার কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন। শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বাহিনী জেভিপি'র প্রাথমিক হুমকি কাটিয়ে ওঠার পর তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন। জেভিপি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, চীন ও উত্তর কোরিয়ার সাথে তার সম্পর্ক এবং ভারতের মার্কসবাদীদের সাথে

তাদের সম্ভাব্য যোগাযোগ খতিয়ে দেখা 'র'-এর গুরুত্বপূর্ণ কজে পরিণত হয়। পাকিস্তান, চীন ও শ্রীলঙ্কার মার্কসবাদীদের মাধ্যমে ভারতের প্রতি হুমকির চাইতেও সম্ভাব্য মার্কিন হুমকি ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল। ১৯৮০ সালে আবার ক্ষমতায় আসার পর শ্রীলঙ্কায় ক্রমবর্ধমান মার্কিন তৎপরতা এবং ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির (ইউএনপি) সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দহরম-মহরমের ব্যাপারে খবর আসতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধী ও কাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ত্রিঙ্কোমালিতে নির্মিত এক বিরাট সংখ্যক পেট্রোল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ভাড়া করার ক্ষেত্রে মার্কিন স্বার্থের প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এসব ট্যাঙ্ক অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর মার্কিন নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ড জোরদারে আগ্রহ দেখাতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হচ্ছে ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবাহিনীর তৎপরতা মনিটর ও প্রতিহত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট সংখ্যক মাছ ধরার ট্রলারের গতিবিধির ওপর নজর রাখা। সিআইএ'র সন্দেহ ছিল, এগুলো সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি'র টেকইন্ট শাখা কর্তৃক ভারত মহাসাগরীর অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা দানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল। দিয়াগো গার্সিয়াকে মার্কিন নৌঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলার চাইতেও যুক্তরাষ্ট্র ত্রিঙ্কোমালিতে তার উপস্থিতি বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে থাকে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর কাও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সামুদ্রিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে 'র'-এর দক্ষতা বাড়ানোর বিভিন্ন সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল ফ্রান্স ও ইরানের সাথে একটা ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা চুক্তি করার, যে বিষয়ে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটা হচ্ছে কেজিবি'র টেকইন্ট শাখার কাছ থেকে সরঞ্জাম ও কারিগরি পরামর্শের ভিত্তিতে টেকইন্ট সংগ্রহে 'র'-এর কর্মকর্তাদের ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি মাছ ধরার জাহাজ ব্যবহার করা। প্রথমে এ প্রকল্প থেকে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়নি। ভারতীয় নৌবাহিনী ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে দ্বিতীয় প্রকল্পটি শুরুই করা যায়নি। ১৯৮১ সালে মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদনকে পুরোপুরি কবর দেয়া হয়। খোদ 'র'তেই এ ব্যাপারে আগ্রহ না থাকায় পরে আর সেই প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়নি। 'র'তে সংখ্যাগরিষ্ঠ আইপিএস কর্মকর্তারা অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের ধারণাতীত বিষয়গুলো পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ফের ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস পর এ মর্মে খবর আসতে থাকে যে, সিঙ্গাপুরভিত্তিক একটি কোম্পানি পেট্রোল স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো ভাড়া নেয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের সাথে দেনদরবার করছে। 'র'-এর তদন্তে আভাস পাওয়া যায়, সিঙ্গাপুরভিত্তিক কোম্পানিটি মার্কিন গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের হয়ে কাজটি করছিল। আবার মার্কিন গোয়েন্দা সম্প্রদায় হয় সিআইএ

নয়তো এনএসএ'র (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি) পক্ষে কাজ করছিল। শ্রীলঙ্কার পুলিশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে 'র'-এর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল। 'র' অবিলম্বে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করে তা নিয়ে কথা বললেও তাতে ইতিবাচক কোনো ফল আসেনি। সিঙ্গাপুরভিত্তিক কোম্পানির সাথে দেনদরবার কমিয়ে দেয়া হলেও সেটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়নি। এদিকে এই মর্মে অপর একটি খবর আসে যে, ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) শ্রীলঙ্কায় তার উপস্থিতি ও সম্প্রচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির অনুমতির জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আপাত দৃষ্টিতে এর যে কারণ দেখায় তা হলো তারা এশিয়ায় ভোয়ার সম্প্রচার সম্প্রসারিত করতে চায়। 'র'-এর টেকইন্ট কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় নৌবাহিনীর স্থাপনাগুলো এবং ভারতীয় ও সোভিয়েত নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর যোগাযোগ মনিটর করতে সিআইএ কর্তৃক ভোয়ার সেটআপ ব্যবহার করা। এ বিষয়টি শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে উত্থাপন করা হয়। তবে ফলাফল আগের মতোই নেতিবাচক।

শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা সরকার পেট্রোল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব বর্জন এবং ভোয়ার সম্প্রসারণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করলেও ভারতের নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি বারবার তাদের সংবেদনহীনতার ঘটনা ইন্দিরা গান্ধীকে মর্মাহত করে। এদিকে শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি ও সংখ্যালঘু তামিলদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এর ফলে ১৯৮৩ সালে কলম্বোতে তামিলবিরোধী দাঙ্গা এবং লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) নেতৃত্বে একটি স্বাধীন তামিল আবাসভূমির আন্দোলন শুরু হয়। ইন্দিরা গান্ধীর বরাবরই সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারত এবং বিশেষভাবে তামিলনাড়ুর প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ ছিল। ওই এলাকার লোকেরা সুদিনে ও দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। সিংহলিদের হাতে শ্রীলঙ্কার তামিলদের নির্যাতনের খবরে ইন্দিরা গান্ধী ব্যথিত হন। ফলে তিনি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি 'র'কে শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাহায্য করতে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন। ভারতের নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রীলঙ্কা সরকারের সংবেদনহীনতা এবং শ্রীলঙ্কার তামিলদের দুর্ভোগ দুটোই ইন্দিরা গান্ধীকে এ ধরনের নীতি অবলম্বনে প্রভাবিত করে। তামিলদের জন্য 'র'-এর সহায়তা কাওয়ের সিনিয়র উপদেষ্টা থাকাকালেই সাক্সেনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে শুরু হয়। এই প্রকল্পের কিছু কিছু দিক সংক্রান্ত খবর মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এসব বিব্রতকর পরিস্থিতি সত্ত্বেও তামিলদের সহায়তা প্রকল্প কাওয়ের চলে যাওয়ার পরও অব্যাহত থাকে।

ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন এবং অবসরে যাওয়ার পরও কাওকে ডেকে পাঠিয়ে সিনিয়র উপদেষ্টা করায় পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বেশ বিচলিত ভাব দেখা দেয়। ১৯৭৭ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক একনায়ক জিয়াউল হক ও সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তা ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী এবং কাও 'র'-এর প্রধান থাকাকালে ১৯৭১ সালে

পাকিস্তানের কী ঘটেছিল সেটা ভুলে যাননি। মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় থাকাতে জিয়াউল হক খুশি ছিলেন। দেশাই সরকার পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সমালোচনাকারী ও বিরোধীদের সাথে দহরম-মহরম গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা তাদের ব্যাপারে খুব একটা ভাবেননি। যারা পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রে নির্বাসনে গিয়েছিলেন তারা ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় ফেরা এবং কাওয়ের উপদেষ্টা হওয়ায় খুবই আনন্দিত হন। সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানি রাজনৈতিক শ্রেণী ইন্দিরা গান্ধীকে পছন্দ করতেন। তারা আশা করেন, তিনি পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাদের সহায়তা দেবেন। তাদের কেউ কেউ গোপনে আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে ভারত সফর করতে থাকেন। প্রকাশ্যে সফরকারীদের মধ্যে ছিলেন খান আবদুল গাফফার খানের পুত্র মরহুম খান আবদুল ওয়ালী খান এবং সীমান্ত গান্ধী। তারা হয় কাও নয়তো ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। পাকিস্তানের নেতাদের অনেকেরই সেই ১৯৪৭ সালের আগে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। এসব সফরকালে তারা নতুন করে তাদের সাথে পুরনো সম্পর্ক ঝালাই করেন।

১৯৬৮ সালে যাত্রা শুরু করার সময় থেকেই 'র'-এর আফগান গোয়েন্দা সংস্থা খাদের সাথে ঘনিষ্ঠ লিয়াজোঁ ছিল। 'র' খাদকে পাকিস্তানের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হিসেবে গ্রহণ করে। এই লিয়াজোঁ আরও জোরদার হয় ইন্দিরা গান্ধী ও কাও'য়ের প্রত্যাবর্তন এবং সাক্সেনার 'র' প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর। 'র', খাদ ও কেজিবি'র সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার ভিত্তি তখন রচিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় এলাকায় আইএসআই পরিচালিত খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের বহু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চিহ্নিত হয়। তাদের অস্ত্রশস্ত্র আসত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর গুদাম থেকে। অতএব 'র' ওই এলাকায় খালিস্তানিদের তৎপরতা মনিটরের ক্ষেত্রে খাদের সহযোগিতাকে অত্যন্ত মূল্য দিতো।

আফগানিস্তানে সিআইএ'র গোপন তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত অর্থাৎ সিআইএ ও আইএসআই কিভাবে আফগান মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং কিভাবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে ইত্যাদি সম্পর্কে জানতেও 'র' অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। উইলিয়াম ক্যাসির নেতৃত্বে সিআইএ সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের পরাভূত করতে লেবাননের হিজবুল্লাহ সংগঠনের মতো কর্মকাণ্ড পরিচালনার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের প্রক্সি যুদ্ধে কংগ্রেস যাতে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ না আনতে পারে সে জন্য সিআইএ আফগান মুজাহিদ ও আরবদের সরাসরি প্রশিক্ষণ এড়িয়ে যায়। ওসামা বিন লাদেনসহ আরবরা পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন। এর পরিবর্তে সিআইএ আইএসআই'কে একটি গোপন তৎপরতা শাখা খোলার ব্যাপারে সহায়তা করে। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ এবং এর কাজ ছিল হিজবুল্লাহর কৌশলে

আফগান মুজাহিদ ও তাদের আরব স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয়া। ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ ও তার কর্মকর্তাদের গোপনে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেসের বিশেষজ্ঞরা আইএসআই কর্মকর্তাদের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেড ফুয়েল অয়েল (এমএনফও) ভেহিকুলার বোমা তৈরি ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ দেয়। সিআইএ আইএসআই'কে বিভিন্ন ধরনের বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য, ডেটোনেটর ও টাইমার সরবরাহ করে। সিআইএ ও স্পেশাল ফোর্সেস কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া আইএসআই কর্মকর্তারা আফগান মুজাহিদ ও আরব স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। সিআইএ'র হুকুম তামিল করার সময় আইএসআই ওসব সামগ্রী ও কৌশল গোপনে তাদের পরিচালিত ক্যাম্পগুলোতে খালিস্তানিদের সরবরাহ করত। অপারেশন ব্লু স্টারের পর খালিস্তানিরা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর এসব কৌশল এবং সামগ্রী প্রয়োগ করতে শুরু করে। এভাবে সিআইএ ও আইএসআই'র মধ্যকার সহযোগিতার লক্ষ্য আফগানিস্তানে আফগান সৈন্য এবং সোভিয়েত বাহিনী হলেও তার প্রভাব ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও পড়তে থাকে। খাদ ও কেজিবি'র সাথে 'র'-এর সহযোগিতার দ্বিবিধ লক্ষ্য ছিল। তা হলো আফগান মুজাহিদ ও আরব স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহৃত আইএসআই'র দেয়া কৌশল ও সরবরাহকৃত সামগ্রী এবং তাদের কাছ থেকে আফগান ও সোভিয়েত সৈন্যদের উদ্ধারকৃত সরঞ্জামের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া।

আফগানিস্তানে সিআইএ ও আইএসআই'র কর্মকাণ্ডের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি কাও সানতুক ও সাক্সেনা এ সংক্রান্ত উদ্বেগ যাতে কোনোভাবেই সিআইএ'র সাথে 'র'-এর লিয়াজোঁর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে নজর রাখেন। 'র' কার্যত তার ও আইবি'র কিছু কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সিআইএ'র সহযোগিতা চায়। প্রশিক্ষণের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ছিনতাই ও পণবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মতো সন্ত্রাস দমন কৌশল। সিআইএ এতে সানন্দে সাড়া দেয়। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সহযোগিতা কী অদ্ভুত নিয়মে চলে তার আরেকটি বাস্তব উদাহরণ এটি। একদিকে সিআইএ আইএসআইকে তার এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ দেয় আবার অন্যদিকে কিভাবে সে সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করা যায় সে কৌশলের ব্যাপারে 'র' এবং আইবি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতির বিরুদ্ধে সিআইএ'কে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতাকালেই পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মারাত্মক ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তার সামরিক পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আফগানিস্তানে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে রিগান প্রশাসন সামরিক পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনে ইসলামাবাদের জোরালো প্রচেষ্টার প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখে। পাকিস্তান পশ্চিমা বিশ্ব থেকে গোপনে উপকরণ সংগ্রহ তৎপরতাই কেবল অব্যাহত রাখেনি, এর পাশাপাশি এ ব্যাপারে চীনের সাথে একটি গোপন সমঝোতা প্রকল্পেও সম্পৃক্ত হয় পাকিস্তান।

ড. সান্তানমের নেতৃত্বে 'র'-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখা পাকিস্তানের এ সংক্রান্ত গোপন কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে মনিটর করার ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করেছিল।

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'র' গঠিত হওয়ার পরপরই ইন্দিরা গান্ধীর অনুমতি নিয়ে ইসরাইলের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে লিয়াজোঁ গড়ে তোলে। পশ্চিম ইউরোপে নিয়োগপ্রাপ্ত 'র'-এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মোসাদের সাথে এ লিয়াজোঁ পরিচালিত হতো। এই দুইটি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সময়ে সময়ে নিজেদের মধ্যে সফর বিনিময় করতেন। এই লিয়াজোঁর মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার ব্যাপারে ইসরাইলের জানাশোনা থেকে উপকৃত হওয়া এবং তার কাছ থেকে সন্ত্রাস দমনের কৌশল রপ্ত করা। ইসরাইলের সাথে ভারতের যোগাযোগ এবং 'র'-এর সাথে মোসাদের লিয়াজোঁর বিষয়টি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। মোরারজি দেশাইয়ের শাসনামলে এর কিছু কিছু দিক প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। ইসরাইলের কিংবদন্তির সমর নেতা জেনারেল মোশে দায়ানের গোপনে কাঠমান্ডু সফরের বিষয়টি সংবাদ মাধ্যম জেনে ফেলেছিল। ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সাথেই যে বৈঠক করার জন্য তিনি কাঠমান্ডু সফরে এসেছিলেন এটি অনুধাবন করতে সাংবাদিকদের বেশি সময় লাগেনি।

ইন্দিরা গান্ধী ফের ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানের প্রতি আরও সক্রিয় নীতি অবলম্বন করার পরও পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক দেশের রাজনীতিতে তার প্রভাবের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন না। পাকিস্তান সরকার মনে করেছিল, আফগানিস্তান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকায় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করার সুযোগ ভারতকে দেবে না। কেননা পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করা হলে তা তার আফগান অভিযানকে দুর্বল করবে। তবে পাকিস্তান যে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল সেটা হচ্ছে কাহুতায় পাকিস্তান যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করছিল সেটা ইন্দো-ইসরাইলি অপারেশনে ধ্বংস হয়ে যায় কিনা। ফ্রান্সের সহায়তায় ইরাক ও সিরিয়া যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপন করেছিল সেটা কাজ শুরু করার আগেই ১৯৮১ সালে ইসরাইল ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। তারপর পাকিস্তানও আশঙ্কা করছিল যে ভারত ও ইসরাইল কাহুতায় তার পারমাণবিক প্রকল্প ধ্বংস করে দিতে পারে।

সিআইএ এবং আইএসআই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনে 'র'-এর কর্মকাণ্ড মনিটরিং জোরদার করে। সিআইএ খাদ ও কেজিবি'র সাথে 'র'-এর যোগাযোগের ব্যাপারে আরও অধিক পরিমাণে জানতে চায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক পাকিস্তানের নির্বাসিত রাজনীতিকদের সাথে ভারতের যোগাযোগ এবং মোসাদের সাথে তার গোপন সহযোগিতার বিষয়ে বেশি করে জানতে চায়। এর ফলে ভারতে এ দু'টি দেশের কূটনৈতিক মিশনে সিআইএ ও আইএসআই কর্মকর্তাদের নিয়োগের ঘটনা ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাস এবং মুম্বাই, কলকাতা ও চেন্নাইয়ে মার্কিন কনস্যুলেটে নিয়োগপ্রাপ্ত সিআইএ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সিআইএ 'র'-তে ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টা জোরদার করে।

১৯৮০-এর দশকে ভারতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও তৎপরতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তারা সবাই একে অন্যকে

সহযোগিতা করে। ফরাসি গোয়েন্দারা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ঢুকে পড়ে। তারা তাদের পশ্চিম ইউরোপীয় ও মার্কিন মিত্রদের তাদের সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য ও কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য করত। পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দারা ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার জন্য কিংবা চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য দিল্লি সফরকারী আফগান কর্মকর্তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সিআইএ'কে সহযোগিতা করে। সিআইএ মনে করত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর খোলাখুলি অবিশ্বাস ও বিরূপ মনোভাবের কারণে তার কর্মকর্তাদের ওপর আইবি গভীর নজর রাখছে। তাই সিআইএ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কাজ চালাত। ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঢুকে পড়েছে এ বিষয়টি ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ওপর এভাবে গভীর নজরদারি ছিল না। বহুকাল পর ১৯৮৭ সালে আইবি শ্রীলঙ্কায় 'র'-এর কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য ও কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য 'র'-এর চেন্নাই অফিসে সিআইএ ঢুকে পড়ে বলে জানতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ফরাসি গোয়েন্দাদের অনুপ্রবেশের দ্বারা। 'র' ও আইবি তাদের স্পর্শকাতর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেসব অতি গোপন রিপোর্ট পাঠাত সেগুলো ফরাসি গোয়েন্দাদের হস্তগত হয়ে যেত।

পাল্টা গোয়েন্দা তৎপরতার ক্ষেত্রে 'র'-এর অব্যাহত দুর্বলতা এ সময়ে একটা উদ্বেগের ব্যাপার ছিল। একদিন লক্ষ্য করা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতিসঙ্ঘের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পে চাকরিরত একজন অস্ট্রেলীয় মহিলা দিল্লির একটি বাড়িতে 'র'তে ডেপুটেশনে কর্মরত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত একজন বিপত্নীক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে বসবাস করছেন। এ বিষয়টি 'র'-এর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স শাখার নজর বেশ কিছু সময় এড়িয়ে যায়। 'র'তে ডেপুটেশনে আসা এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত অপর এক পুলিশ অফিসারের স্ত্রীকে এক দিন অস্ট্রেলিয়ার একজন চিহ্নিত গোয়েন্দা কর্মকর্তার স্ত্রীর সাথে দুপুরের খাবার খেতে দেখা যায়। অস্ট্রেলীয় সেই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে 'র'-এর সাথে লিয়াজোঁ রক্ষার জন্য নয়াদিল্লিতে অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তদন্তে আভাস পাওয়া যায়, তার স্বামী অস্ট্রেলীয় ওই কর্মকর্তার সাথে লিয়াজোঁ বৈঠকের জন্য 'র' কর্তৃক সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর ওই পুলিশ অফিসার ও তার স্ত্রী 'র'-এর অজ্ঞাতেই অস্ট্রেলীয় দম্পতির সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। এটা সন্দেহ করার কারণ ছিল যে, ওই পুলিশ দম্পতি অস্ট্রেলীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুঁজে বের করেছিলেন। পরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত উভয় পুলিশ কর্মকর্তাকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে নেয়া হয়। নয়াদিল্লিতে নিয়োগপ্রাপ্ত উপসাগরীয় একটি দেশের একজন কূটনীতিককে তার বাসভবনে একজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হত্যা করে। সংবাদমাধ্যম নিহত কূটনীতিককে 'র'-এর একজন কর্মকর্তার ভাড়াটিয়া বলে বর্ণনা করে। তদন্তে দেখা যায়, অবসরপ্রাপ্ত এবং 'র'তে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেনা কর্মকর্তা 'র'-এর অজান্তেই ওই কূটনীতিককে উচ্চমূল্যে তার বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা তিনি সিকিউরিটি রেগুলেশন ভঙ্গ করেছিলেন। সততা ও

শৃঙ্খলার জন্য খ্যাতিমান কেরালা ক্যাডারের একজন বিশিষ্ট আইপিএস কর্মকর্তাকে সিআইএস শাখার প্রধান করা হয়। তিনি সিআইএস-এ নিয়ম-নীতি ও কঠোর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে 'র'-এর চেন্নাই অফিসে সিআইএ'র অনুপ্রবেশ শনাক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংস্থার লোকজনের ভাষাগত দুর্বলতাও তার বিশ্লেষণ ও অপারেশনাল কাজকর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে সময় খালিস্তানিদের কর্মকাণ্ড চরম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে সময় গুরুমুক্তি পাণ্ডুলিপিতে পাঞ্জাবি ভাষা জানার মতো লোক সংস্থায় তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'র'-তে বহু কর্মকর্তা ছিলেন যারা চীনা ও আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। অথচ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ভাষাগুলোতে পারদর্শী লোক খুব কমই ছিলেন। কিছু কর্মকর্তা উর্দু বলতে ও বুঝতে পারতেন কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই উর্দু লিখতে বা পড়তে পারতেন। 'র'-এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন যিনি পশতুভাষা ভালো জানতেন। তবে সিন্ধি ও বালুচ ভাষা বোঝার মতো কেউ ছিলেন না। ফলে পাকিস্তানি পত্রপত্রিকা পড়া ও রেডিও মনিটর করার জন্য অল ইন্ডিয়া রেডিও'র বৈদেশিক সার্ভিসের লোকজন ও অন্যান্য বহিরাগতের ওপর 'র'-কে নির্ভর করতে হতো। একটি গোয়েন্দা সংস্থার চাহিদা সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা ছিল না বিধায় তাদের কাজকর্ম সন্তোষজনক ছিল না। তদুপরি তারা চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ত্বরিতও ছিলেন না।

১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার আগে অবিভক্ত আইবি'তে পাকিস্তান ও প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী একটি ক্যাডার গড়ে তোলা হয়েছিল। এর সমুদয় কৃতিত্ব ছিল মল্লিকের। চমৎকারভাবে চীনা ও আরবি ভাষা জানা একদল ক্যাডার সৃষ্টির কৃতিত্বও মল্লিকেরই। ১৯৯৪ সালের আগস্টে আমার অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমি যাদের চীনা ও আরবি ভাষায় পারদর্শী দেখেছি তাদের অধিকাংশই আইবি'র চৌকস কর্মকর্তা। 'র'তে পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষার প্রতি অহেতুক দুর্বলতা পোষণকারী ব্যক্তি ছিলেন। এর ফলে অবস্থা এই দাঁড়ায়, সংস্থাটিতে প্রতিবেশী দেশগুলোর ভাষা জানা লোকের চাইতেও ওইসব ভাষা জানা লোকের সংখ্যাধিক্য ছিল। 'র'তে যাদের সরাসরি রিক্রুট করা হতো তাদের চাকরি স্থায়ী করার ও প্রমোশন দেয়ার আগে বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তবে যারা এই সংস্থায় আইসিএস, অন্যান্য অল ইন্ডিয়া ও সেন্ট্রাল সার্ভিসেস এবং সামরিক বাহিনী থেকে ডেপুটেশনে আসতেন তাদের জন্য ভাষাগত দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক ছিল না। আমার অবসরে যাওয়ার পর এ ধরনের পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা আমি জানি না।

এ সময় আরও একটি বিষয় সামনে এসে যায়। সেটি ছিল সরাসরিভাবেই হোক আর ডেপুটেশনে নেয়ার মাধ্যমেই হোক মুসলিম কর্মকর্তাদের 'র'-তে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে সব ধর্মীয় সংখ্যালঘুর বেশ ভালো প্রতিনিধিত্ব থাকলেও মুসলমানদের এখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো। তবে এ দূরে সরিয়ে রাখার বিষয়টি বুঝতে দেয়া হতো না। স্বাধীনতা লাভের পর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন তখনই মুসলমানদের ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা থেকে

দূরে রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তকে জওহরলাল নেহরুসহ পরবর্তী সময়ে যারাই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তারাই অনুমোদন দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়টিও অন্তর্ভুক্ত। অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের একজন সিনিয়র মুসলিম কর্মকর্তার দৃষ্টিতে এ ছুতোয় নয়তো ওই ছুতোয় তার আইপিএস-এ কর্মরত পুত্রকে আইবি ও 'র' থেকে দূরে রাখার ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধী তার দ্বিতীয় মেয়াদে বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়, মুসলমানদের আর এসব সংস্থা থেকে দূরে রাখা ঠিক হবে না। বরং আমাদের যদি জিহাদি সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে হয় তাহলে মুসলমানদের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তাধর্মী সংস্থাগুলোতে নিতে হবে এবং তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী ও অপারেশনাল পদ দিতে হবে।

কাও সিনিয়র উপদেষ্টা থাকাকালে গোয়েন্দা সম্প্রদায় আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। প্রথমটি ছিল মোরারজি দেশাই ও চরণ সিংয়ের শাসনামলে স্থগিত থাকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'র'তে সরাসরি লোক নিয়োগ আবার শুরু করা এবং রিসার্চ ও এনালাইসিস সার্ভিস (আরএএস) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৮ সালে আইবি'কে বিভক্ত করে যখন 'র' গঠন করেন তখন তিনি চেয়েছিলেন, নয়া সংস্থাটি পুলিশের ভাবমর্যাদা পরিহার করুক। আইবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখা এ ভাবমর্যাদা অর্জন করেছিল। তিনি যথার্থই এই ধারণা পোষণ করতেন, আইপিএস কর্মকর্তারা অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থাতে ভালো করলেও বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষমতা তাদের নাও থাকতে পারে। কেননা এ জন্য প্রয়োজন এক ভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও কাজের ঝোঁক। তাই তিনি প্রস্তাব করেন, এই সংস্থায় আইপিএস অফিসারদের পদোন্নতির পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী থেকেও সরাসরি আরও বেশি লোক নিয়োগ দেয়া উচিত। অন্যান্য সার্ভিস থেকে ডেপুটেশনে আরও লোক আনার ক্ষেত্রে সমস্যা না থাকলেও সর্বসাধারণ থেকে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগে প্রথম দিকে সমস্যা দেখা দেয়। সরকারের সব বিভাগেই ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) মাধ্যমে লোক নিয়োগ দিতে হয়। কাও এই সংস্থাটিকে ইউপিএসসি'র আওতামুক্ত রাখতে ইন্দিরা গান্ধীকে সার্থকভাবে বুঝাতে পেরেছিলেন। তিনি সংস্থাটির জন্য আরএএস নামে অভিহিত একটি পৃথক সেন্ট্রাল সার্ভিস গঠনের ব্যাপারেও ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি করাতে পেরেছিলেন। আরএএস গঠিত হওয়ার কথা ছিল সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ও বিভিন্ন সার্ভিস থেকে ডেপুটেশনে আসা লোকদের মধ্য থেকে যাদেরকে আরএএস-এ অন্তর্ভুক্ত করার মতো যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদের নিয়ে। তবে শর্ত থাকে যে, তাদেরকে মূল সার্ভিসের পদে ইস্তফা দিয়ে নতুন সংস্থাটিতে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হবার ব্যাপারে ইচ্ছুক হতে হবে। নানা কারণে ১৯৭৭ সালে কাওয়ের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত আরএএস গঠনের পদক্ষেপ নেয়া যায়নি। এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে যে, 'র'কে ইউপিএসসি'র আওতাবহির্ভূত রাখার সুযোগে চাকরিরত কিংবা অবসর গ্রহণকারী উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা তাদের পুত্র-কন্যাদের সংস্থাটিতে সরাসরি নিয়োগে

নেমে পড়েছেন। অথচ তাদের সন্তানরা হয়ত অল ইন্ডিয়া অ্যান্ড সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্য ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, নয়ত পরীক্ষা দিলেও কখনও কৃতকার্য হতে পারত না। প্রথম দিকে সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েদের কিছুসংখ্যককে 'র'তে চাকরি দেয়া হয়। এর ফলে অভিযোগ উঠে যে, এই সংস্থাটি সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়োগ দানের মাধ্যমে এর কর্মদক্ষতার ব্যাপারে তাদের সমালোচনাকে নমনীয় করার চেষ্টা করছে। এ ছাড়া সরাসরি সাধারণ ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে নেয়া লোকজন ও বিভিন্ন বিভাগ থেকে নেয়া লোকজনের মধ্যকার আন্তঃজ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাইর ক্ষমতা গ্রহণের পর সংস্থাটি মনে করে, আরএএস ক্যাডার গঠনের বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ তিনি এই সংস্থাটির প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করেন। তদুপরি তিনি এই সংস্থাটির এত বিশাল কলেবর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং এটাকে আরও ছোট করার পরামর্শ দেন।

১৯৮১ সালে ইন্দিরা গান্ধী ফের ক্ষমতায় ফেরার পর কাও তার সিনিয়র উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আরএএস ক্যাডার সৃষ্টির কাজে যে ছেদ পড়েছিল সেটাকে নয়া উদ্যমে আবার চালু করার ব্যাপারে আগ্রহী হন। কারো কারো মধ্যে এমন ধারণা থাকতে পারে, সরাসরি নিয়োগের ব্যাপারে সংস্থাটির জুনিয়র ও মধ্যম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের তরফ থেকে উত্থাপিত স্বজনপ্রীতির অভিযোগের কারণে সানতুক আরএএস ক্যাডার সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। কাও তার চিরাচরিত বিনম্র স্বভাবে আবার সরাসরি নিয়োগ চালু ও ক্যাডার গঠনের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে চাপ অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত সানতুক তাতে সায় দেন। কাও ১৯৭৯ সালে অবসরে যাওয়া শঙ্কর নায়ারকে দিয়ে এক সদস্যের একটি কমিটি গঠন করিয়ে নেন। এই কমিটির কাজ ছিল বিভিন্ন বিভাগ থেকে আনা কর্মকর্তা এবং আরএএস ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আন্তঃজ্যেষ্ঠতা কিভাবে নির্ধারিত হবে সে ব্যাপারে সুপারিশ করা। শঙ্কর নায়ারের সুপারিশ গ্রহণ করে আরএএস ক্যাডার গঠিত হয়েছিল। আন্তঃজ্যেষ্ঠতার ব্যাপারে নায়ারের সুপারিশে কিছু বেসামরিক কর্মকর্তা, বিশেষ করে আইপিএস থেকে আসা ব্যক্তিরা নাখোশ হয়েছিলেন। তারা মনে করেন, সিনিয়রিটির ক্ষেত্রে আর্মি থেকে আসা কর্মকর্তাদের অন্যায় সুবিধা দেয়া হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় এই সংস্থাটিতে বিভিন্ন বিভাগ থেকে লোকজনকে নেয়া হয়েছিল, যেভাবে খোলা বাজার থেকে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হয়েছিল এবং যেভাবে আন্তঃজ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হয়েছিল তাতে যে চরম তিক্ততা সৃষ্টি হয় সেটি আজো অব্যাহত আছে। আর এ কারণেই 'র' গঠিত হওয়ার ৩৯ বছর পরও তার কর্মকর্তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে উঠতে পারেনি। আরএএস বনাম নন-আরএএস, আইপিএস বনাম অবশিষ্টরা এবং সামরিক কর্মকর্তা বনাম বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে মনকষাকষি ও দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। এই দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের ফয়সালা কাওসহ অন্যান্য 'র' প্রধান সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো পন্থায় উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর এ কারণেই সংস্থাটিতে প্রত্যেকের মধ্যে তাদের ক্যারিয়ার প্রশ্নে ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল। এর ফলে এ অসন্তুষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মিডিয়ায় সংস্থার

ব্যাপারে নেতিবাচক প্রচারণা প্রাধান্য পেত। অন্যান্য সরকারি বিভাগের মতো আইবিতেও বিভিন্ন স্তরে ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল। তবে সেখানে নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে লেগে যাওয়ার উদাহরণ কম। 'র' কর্মকর্তাদের চেয়েও আইবি'র কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকতর আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তঃপদমর্যাদাগত সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ভারত সরকারের জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটিকে (জেআইসি) খণ্ডিত করার সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যকার যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (এসআইএস) বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের নির্দেশে লর্ড ফ্যাঙ্কস পরিচালিত তদন্তে এসআইএসকে গোয়েন্দা ব্যর্থতার দায় থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, এসআইএস-এর উপস্থিতি যেহেতু আর্জেন্টিনায় ছিল না, তাই তাকে ফকল্যান্ডে আর্জেন্টাইন অভিযানের ব্যাপারে পূর্ব থেকে ধারণা করতে ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ করা যায় না। এর পরিবর্তে তদন্ত প্রতিবেদনে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ব্যাপক খোলামেলা তথ্য সত্ত্বেও সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ব্রিটিশ জেআইসি'কে দায়ী করা হয়। তদন্ত কমিটি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ কিংবা ভোগ্য সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান করার মাধ্যমে জেআইসি'কে শক্তিশালী করার পরামর্শ দেয়। এই প্রতিবেদন পড়ে কাও ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ভারতীয় জেআইসি'কেও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। তিনি তাকে বলেন, দেশের উত্তর-পূর্বে অব্যাহত বিদ্রোহ ও পাঞ্জাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চরম আকার ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়নের জন্য ভারতীয় প্রশাসনিক সার্ভিসের (আইএএস) একজন কর্মকর্তাকে প্রধান করে একটি পৃথক জেআইসি গঠন করলে ভালো হবে। ইন্দিরা গান্ধী তার প্রস্তাব মেনে নেন। এভাবে দু'টি জেআইসি সৃষ্টি করা হয়। এর একটির কাজ হচ্ছে একজন আইপিএস কর্মকর্তার নেতৃত্বে বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়ন, আর অপরটির কাজ হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একজন আইএএস কর্মকর্তার নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়ন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি পৃথক জেআইসি সৃষ্টির ধারণাকে গোয়েন্দা সম্প্রদায় এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তারা মনে করতেন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তাকে কৃত্রিমভাবে আলাদা করার সুযোগ নেই বরং উভয় গোয়েন্দা তথ্যেরই অব্যাহতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন জরুরি। বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়নের জন্য কাও 'র' থেকে একজনকে জেআইসি প্রধান করার যে সুপারিশ করেছিলেন সে ব্যাপারেও অনেকের আপত্তি ছিল। জেআইসি যেহেতু এজেন্সিগুলোর দেয়া গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়ন ও তাদের কর্মকাণ্ড মনিটর করে তাই মনে করা হচ্ছিল, একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে এর চেয়ারম্যান করা হলে তার স্বাধীনতা ও বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। কিন্তু তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ইন্দিরা গান্ধী কাওয়ের সুপারিশ বাস্তবায়ন করেন। ইন্দিরা গান্ধীর স্থলাভিষিক্ত রাজীব গান্ধী জেআইসি'র বিভক্তি

বাতিল করে দিয়ে সেটাকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়নের জন্য একটি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন। তবে তিনি জেআইসি'র চেয়ারম্যান পদে 'র' কিংবা আইবি থেকে যে একজন আইপিএস অফিসারকে নিয়োগ দেয়ার বিধান চালু ছিল সেটার পরিবর্তন করেননি। ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধের পরই শুধু এই বিধান পরিবর্তন করা হয়।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তার অধীনে কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে একটি পলিসি অ্যান্ড রিসার্চ স্টাফ সৃষ্টি করা। এতে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা ও 'র' থেকে তিনজন কর্মকর্তা ছিলেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যাপারে তার সামান্যই অভিজ্ঞতা ছিল। পলিসি অ্যান্ড রিসার্চ স্টাফের সূত্র ধরেই ১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট গঠিত হয়। সিনিয়র অ্যাডভাইজার হিসেবে কাও যে তিনটি নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার কোনোটিই সুচিন্তিত ছিল না বিধায় সেগুলো জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেনি। গোয়েন্দা কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, পয়েন্ট মূল্যায়নের কাজকে ভারাক্রান্ত করে ফেলে। এর ফলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কাও যখন সিনিয়র উপদেষ্টা ছিলেন তখন পাঁচটি মূল্যায়ন পয়েন্ট ছিল এবং এগুলো হচ্ছে আইবি, র, জেআইসি (অভ্যন্তরীণ), জেআইসি (বৈদেশিক) এবং পলিসি ও রিসার্চ স্টাফ। কাও প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেয়ার সময় দৃশ্যপটে জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা যেমন কেবিনেট সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র সচিব ও প্রতিরক্ষা সচিবকে রাখতেন না। এর ফলে জাতীয় নিরাপত্তা প্রশাসনের কোথাও কোথাও অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেলেও তার বিরুদ্ধে কারো মনে ঈর্ষার মনোভাব জাগেনি। তবে এ জন্য সবার কাছে তার গ্রহণযোগ্য একটা ভাবমর্যাদাই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। কিন্তু তার বিদায়ের পর এসব প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে উত্থাপিত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর যখন তার গোয়েন্দা প্রধানদের সাথে সরাসরি কথা বলার অধিকার রয়েছে এবং গোয়েন্দা প্রধানদেরও যখন সরাসরি তার সাথে কথা বলার সুযোগ রয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে কী পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তকে অবহিত রাখাটা কি গুরুত্বপূর্ণ নয়? এতে তারা প্রধানমন্ত্রীকে গোয়েন্দা প্রধানদের দেয়া পরামর্শের ব্যাপারে কোনো আপত্তি থেকে থাকলে সেটা জানাতে পারেন।

এ প্রশ্নটির এখনো সুরাহা করা যায়নি। কিছু কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা ২০০০ সালে অটল বিহারি বাজপেয়ির প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল টাস্কফোর্সে বিষয়টি উত্থাপন করেন। গোয়েন্দা সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য গঠিত এই টাস্কফোর্সের প্রধান ছিলেন জিসি সাক্সেনা এবং আমি এ টাস্কফোর্সের একজন সদস্য ছিলাম। বিষয়টি আলোচনার পর টাস্কফোর্স এ মর্মে অভিমত দেয় যে, এটা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অধিকার এবং এ অধিকার নষ্ট করা যাবে না। এই আইনগত অবস্থানটা এভাবে অক্ষুণ্ণ থাকলেও বাজপেয়ির মুখ্য সচিব ব্রজেস মিশ্র এই নীতি চালু করেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে যত

রকমের পরামর্শ দেয়া হবে এবং তা গোয়েন্দা প্রধানদের কাছ থেকেই আসুক বা অন্য কোনো সিনিয়র অফিসারের কাছ থেকে আসুক সেটাকে অবশ্যই তার মাধ্যমে যেতে হবে। ব্রজেস মিশ্র বাজপেয়ির মুখ্য সচিবের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাও ছিলেন। তাই তিনি জোর দিয়ে এই দাবির বিরোধিতা করেছিলেন যে, একই ব্যক্তির একাধারে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ অধিকার করে রাখা উচিত নয়। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে গোয়েন্দা প্রধানদের ভূমিকাকে খর্ব করেন এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং এগুলো সরবরাহের মধ্যে তাদের ভূমিকাকে সীমিত করেন। জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা প্রধানদের বিশেষত 'র' প্রধানকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ না করে তার অধীনস্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়। তবে ডিআইবি এল কে আদভানি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধান মন্ত্রির মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কের সুবাদে নিজের অবস্থানকে কিঞ্চিৎ মর্যাদার আসনে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ডিআইবি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্রজেস মিশ্র ও বাজপেয়ির জামাতা রঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। ওপর মহলের সাথে এ ধরনের কোনো যোগাযোগ না থাকায় 'র' প্রধানরা তাদের ভূমিকাকে অত্যন্ত খাটো দেখতে পান। ড. মনমোহন সিংয়ের সময়ও গোয়েন্দা প্রধানদের পদমর্যাদা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার অধীনস্থ কর্মকর্তার পর্যায়ে থেকে যায়। ফলে তারা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন না। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'র'-এর সদর দফতরে 'র'-এর সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ড. মনমোহন সিং কাওয়ের প্রশংসা করে বলেছিলেন, প্রয়োজন মনে করলে গোয়েন্দা প্রধানরা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মনমোহন সিং কাওকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এস কে নারায়ণ পাছে ক্ষুব্ধ হন এ আশঙ্কায় তারা প্রধানমন্ত্রীর এ প্রস্তাবকে কাজে লাগাতে পারেননি। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর কাও সিনিয়র উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়ে বাকি জীবন ভাস্কর্যের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভাস্কর্য বিষয়ে তিনি বরাবরই গভীর উৎসাহী ছিলেন। ভাস্কর্যের বাইরেও আরও কিছু ভালো লাগার মতো কাজ তিনি করেন। গোয়েন্দা সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগে ও রাজনৈতিক জগতে বিশেষ করে ইন্দিরা কংগ্রেসে তার বিরাটসংখ্যক বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তারা সব সময় তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে বেশ খোঁজখবর রাখতেন। তবে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তার উত্তরসূরিদের কাছে তার সীমিত যাতায়াত ছিল। অবশ্য তিনি কোনো বিষয়ে জরুরি মনে করলে তার মতামত পত্রের মাধ্যমে তাদের অবহিত করতে দ্বিধা করতেন না। 'র' প্রধান থাকাকালে তিনি গোয়েন্দাদের সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 'র' প্রধান হিসেবে তার কার্যকাল সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে তার কার্যকালের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। তার প্রভাব এখনো দ্যুতিময়। একই ভাবমর্যাদা নিয়ে তিনি সিনিয়র উপদেষ্টার পদ থেকেও বিদায় নিতে পারতেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

পরিচ্ছেদ : তের

পাঞ্জাবে অব্যাহত শিখ সহিংসতা

অপারেশন ব্লু স্টারকে কেন্দ্র করে ভারতে এবং বিদেশে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তার ফলে খালিস্তানিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আরও বেড়ে যায়। আরও বেশি করে শিখ খালিস্তানিদের সমর্থন জানাতে শুরু করে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর শিখ সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর নৃশংসতা এবং এ নৃশংসতা বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। এই মর্মে মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, ইন্দিরা কংগ্রেসের কোনো কোনো নেতা এই নৃশংসতার পেছনে মদদ যুগিয়েছেন। আইএসআই পূর্ণমাত্রায় এর সুযোগ গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানের নিজস্ব স্বার্থে শিখ সম্প্রদায়ের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। পাকিস্তান তার ভূখণ্ডে খালিস্তানিদের জন্য আরও ক্যাম্প স্থাপন করে দেয় এবং এসব ক্যাম্পে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেস (আইইডি) বানানো এবং টাইমার ও রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে কিভাবে এসব ব্যবহার করতে হয় তার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অপারেশন ব্লু স্টারের আগে আইএসআই প্রধানত হাতে রাখা অস্ত্রের ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিত। এর পর থেকে তারা উচ্চমানের বিস্ফোরক, ডেটোনেটর ও কেমিক্যাল টাইমার্স সরবরাহ করতে থাকে। এসবের অনেকটাই আসত আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সিআইএ'র সরবরাহকৃত মুজাহিদদের মজুদ থেকে। অপারেশন ব্লু স্টারের আগে ও পরে শিখদের বিরুদ্ধে যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে কথিত সেসব ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পশ্চিম ইউরোপে বেসরকারি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আইএসআই তাদের পরামর্শ দেয়। আইএসআই এ কাজে তাদের অর্থ জোগায়। আইএসআই তাদের কাছে ভারতের অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানার গুরুত্ব তুলে ধরে। আইএসআই চেয়েছিল শিখরা পাঞ্জাবের কৃষি অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করুক। এটি পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামির মতো সংগঠনের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের সহযোগিতা করার পরামর্শ দেয়। এটি স্বর্ণমন্দির থেকে পালিয়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়া সন্ত্রাসী ও অন্যদের থাকার জায়গা করে দেয়। আইএসআই কর্তৃক খালিস্তানিদের সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের পুণ:পুণ: অভিযোগ জিয়াউল হক সরকার

প্রত্যাখ্যান করে।

সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করার বিষয়টি ভারত সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের মতো নিবেদিতপ্রাণ কোনো সার্ভিস বা বাহিনী ভারতের ছিল না। আইবি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের কাজটি করত। নিম্নমানের সমন্বয় ও অকার্যকর তদারকির কারণেই ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল। এই উপলব্ধি থেকেই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) নামে একটি নিষ্ঠাবান বাহিনী গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব আইবি থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। ফলে এটা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের আগে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে রূপ মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করত সেভাবে না থেকে একটি সহযোগী সংস্থায় পরিণত হয়। ড. এস সুব্রামনিয়ামকে এসপিজি'র প্রথম পরিচালক করা হয়। অন্ধ্র প্রদেশের বাসিন্দা সুব্রামনিয়াম একজন প্রভাবশালী আইপিএস কর্মকর্তা। তিনি ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত কয়েক বছরের জন্য আইবি'তে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী পরিচালক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এসপিজিকে সুসংগঠিত করে রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের সদস্যদের আস্থা অর্জন করেন। তিনি একজন পরিমিতিবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা হিসেবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতে কোনোরূপ শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না। তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সবার আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। তিনি হাড়ে হাড়ে পেশাদারিত্ব বজায় রাখেন এবং এসপিজি'র কাজে কোনো রাজনৈতিক শ্রেণী, কিংবা আইবি কিংবা অন্য কোনো সিনিয়র কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ সহ্য করতেন না। তিনি এটা নিশ্চিত করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর দৈহিক নিরাপত্তার প্রশ্নে তার হুকুমই ছিল আইন।

'র' প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহরকে বুলেটপ্রুফ করা এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত গাড়িগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। রাজিব গান্ধী চেয়েছিলেন এসপিজি'র প্রথম দিকের বাহিনীকে ইতালীয় বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দিক, যদিও এ ফিল্ডে ইতালীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এ ধরনের কোনো দক্ষতার বিষয়টি জানা যায়নি। কেন তিনি এটা চেয়েছিলেন সে কারণটি স্পষ্ট নয়। ইতালীয় বিশেষজ্ঞরা দিল্লি থেকে দূরে অবস্থিত 'র'-এর মালিকানাধীন একটি গেস্ট হাউসে এই প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি ইতালীয় প্রশিক্ষকরা রূঢ় আচরণ করতেন বলে অভিযোগ ছিল। এমনও অভিযোগ করা হয়েছিল, একজন ইতালীয় প্রশিক্ষক একজন প্রশিক্ষরণার্থীকে গালে চড় মেরেছিলেন। 'র' এসব অভিযোগের বিষয় রাজিব গান্ধীর গোচরীভূত করে তাকে জানায়, এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। পরে রাজিব গান্ধী ইতালীয়দের দিয়ে প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি বাতিল করে দেন।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে। আইএসআই পাকিস্তান রেডিওর বৈদেশিক শাখায় একটি উসকানিধর্মী অনুষ্ঠানের

কলেবর আরও বৃদ্ধি করে। এই অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ও বিদেশে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন একটি বৈরী মনোভাব জোরদার হয়। এটা খালিস্তানিদের ওপর ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ উড়িয়ে দিতে এবং পাঞ্জাবে সেচ খালের ক্ষতিসাধন করতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত খালিস্তানিরা তাদের আন্দোলনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও সরকারকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রধানত বিমান ছিনতাই ও হাতে বহন করার মতো অস্ত্র দিয়ে টার্গেটেড হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মতো কাজ করত। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর তারা আইইডি বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ঘন ঘন ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথম দিকে তারা ঘড়ির মতো মেকানিক্যাল ডিভাইস দিয়ে এসব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ফাটাত। এরপর তারা যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ও আইএসআই'র দেয়া কেমিক্যাল টাইমার্স ব্যবহার করতে শুরু করে। এরপর তারা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন করে। নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবনে তাদের দক্ষতা ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮৫ সালের জুনে অপারেশন ব্লু স্টারের প্রথম বার্ষিকীতে তারা দিল্লির বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। পরবর্তীকালে জানা যায়, বিস্ফোরিত বোমাগুলো ছিল ট্রানজিস্টার রেডিও বোমা। তারা আইইডি ট্রানজিস্টার রেডিওর মধ্যে ঢুকিয়ে সেগুলো প্রকাশ্য স্থানে ফেলে রেখে যেত। পথিকরা সেগুলো কুড়িয়ে নিতে গিয়ে বিস্ফোরণের শিকার হয়ে হতাহত হতো। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এ ধরনের ট্রানজিস্টার রেডিও পড়ে থাকতে দেখলে সেগুলো না কুড়িয়ে বরং পুলিশে খবর দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকে। রাজিব গান্ধী ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় আট মাস বিদেশ সফর থেকে বিরত থাকেন। ১৯৮৫ সালের জুনে তিনি প্রথম বিদেশ সফরে যান। তিনি ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও আলজিরিয়া সফর করেন। আলজিরিয়া সফর থেকে দিল্লি ফিরে আসার পথে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেয়ার জন্য জেনেভায় যাত্রাবিরতি করেন। এ খবর পেয়ে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসকারী খালিস্তানিরা তাকে এ সময় হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা তার নিরাপত্তা জোরদার করে তাদের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। এ ধরনের অতীব জরুরি বিশেষ ও আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা শিখ সম্প্রদায়ের মনোপীড়ার কারণ হয়। এ ধরনের একটি আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একবার এটা নিশ্চিত করা হয় যে, রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের সদস্যদের ধারে কাছে কোনো শিখ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন রাখা যাবে না।

ওই সময় আমি জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের সংস্থাগুলোর জন্য ভারতের স্থায়ী মিশনে কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত ছিলাম। একই সাথে আমি জেনেভায় ক্যান্টনাল গভর্নমেন্ট অব জেনেভার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় কনসাল জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করি। ১৯৭০-এর দশকে আমি প্যারিসে দায়িত্ব পালন করেছিলাম বিধায় ফরাসি ভাষায় আমার পারদর্শিতা ছিল। তাই আমাকে বলা হলো ফরাসি এবং জেনেভার নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে যাতে আমি দোভাষী হিসেবে কাজ করি এবং

যেভাবেই হোক আমি যাতে এসপিজিকে তার নিরাপত্তাব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমন্বয় করি এবং সহযোগিতা দেই। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। বিদেশী বংশোদ্ভূত ক্লিন শেভ করা একজন শিখ তখন এয়ার ইন্ডিয়ার একটি কার্যালয়ে সিনিয়র কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতেন। দিল্লি থেকে আমাকে বলা হয় আমি যেন রাজিব গান্ধীর সফরকালে ওই শিখ কর্মকর্তাকে কোনো সফরে পাঠিয়ে দিতে এয়ার ইন্ডিয়াকে রাজি করাই, যাতে তিনি রাজিবের সফরকালে উপস্থিত থাকতে না পারেন।

জেনেভায় আমি পুরো নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করি। ভারতের স্থায়ী মিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের একজন তরুণ ও সুদর্শন শিখ কর্মকর্তা ছিলেন। আমি জেনেভা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় রাজিব গান্ধীর আগমন ও প্রস্থানকালে বিমানবন্দরে যাবতীয় ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলাম। এটা জানতে পেরে দিল্লি আমাকে নির্দেশ দেয় যাতে আমি তাকে নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত না করি। আমি বললাম, ইতোমধ্যেই তাকে আমি এয়ারপোর্টের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে ফেলেছি। এ অবস্থায় তাকে কাজ করতে দেয়া না হলে তিনি অপমানিত বোধ করবেন। এ ছাড়া ভারতীয় মিশনের সব কর্মকর্তাই যখন নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন সে অবস্থায় নিছক শিখ বলে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। কেননা, খালিস্তানিরা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণার ক্ষেত্রে এটাকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবে। তারপর দিল্লি থেকে বলা হয় তাকে যেন ২৪ ঘণ্টার জন্য স্থায়ী মিশনে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব দেয়া হয়, যাতে রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের জেনেভা অবস্থানকালে তিনি তাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারেন।

দায়িত্ব বদল করে দেয়ায় তিনি যে নির্ঘাত মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তিনি সেটা প্রকাশ করেননি এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একবারের জন্যও বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে কথা বলেননি। তিন বছর পর আমাকে ফের দিল্লিতে বদলি করার প্রাক্কালে মিশনে আমার জন্য একটি বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি ড. জে এস তেজা আমার প্রশংসা করে কিছু বক্তব্য রাখার পর সেই তরুণ শিখ কর্মকর্তা কয়েকটি কথা বলার জন্য তেজার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি আমার প্রশংসা করে বেশ কিছু কথা বলার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেদিন তাকে নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব দেয়ার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, সেদিন তিনি বড্ড মর্মাহত হয়েছিলেন। ওই সময় আমার মনে হয়েছিল আমি অতি নীচ। কিন্তু কে তাকে বুঝাবে যে, সেদিন তাকে তার পূর্বনির্ধারিত দায়িত্বে রাখার জন্য আমি দিল্লিকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

জেনেভায় রাজিব গান্ধীর জন্য যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেসব অনুষ্ঠানের একটির আয়োজক ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। স্থানীয় এক হোটেলে সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে সে সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন মার্কামারা শিখ, যিনি জাতিসঙ্ঘের সংস্থাগুলোর একটির পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

সেই তরুণ আইএফএস অফিসারকে নিয়ে সৃষ্ট বিব্রতকর পরিস্থিতির কারণে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে দিল্লিকে বিষয়টি জানাইনি। রাজিব গান্ধী তাকে দেয়া সংবর্ধনায় অংশ নিতে হোটেলে উপস্থিত হলে তার সাথে থাকা কোনো কোনো কর্মকর্তা একজন শিখ তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে দেখতে পেয়ে বিচলিত বোধ করেন এবং আমি সেটি বুঝে ফেলেছিলাম। অপর একজন ভারতভিত্তিক শিখ বহুজাতিক বৈঠকে অংশ নিতে প্রায়ই জেনেভা আসতেন। সৌভাগ্যবশত দিল্লি তাকেও রাজিব গান্ধী থেকে দূরে রাখতে আমাকে বলেনি। তার নাম ছিল ড. মনমোহন সিং।

শিখ নিরাপত্তারক্ষী কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার কারণে দুর্ভাগ্যজনক হলেও যেসব বোধগম্য পরিণতি ঘটে তার একটি হচ্ছে শিখ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর বাড়াবাড়ি রকমের সতর্কতা এবং তাদের ব্যাপারে মানসিক বৈকল্য। অনেকের মতো আমিও এ মানসিক বৈকল্যের শিকার হয়েছিলাম। শিখদের ব্যাপারে আমরা এতটাই সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ি যে তা থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পর্যন্ত বাদ পড়ত না। আমরা যথাযথ যাচাই বাছাই ছাড়াই শিখ চরমপন্থীদের কথিত তৎপরতাসংক্রান্ত সব রিপোর্টকে গুরুত্বের সাথে দেখতে শুরু করি। এর ফলে আমাদের সোর্সরা এবং এমনকি কিছুসংখ্যক অবিবেচক গোয়েন্দা কর্মকর্তা পর্যন্ত এর সুযোগ গ্রহণ করতে চাইতেন। তারা খালিস্তানিদের কাছ থেকে সম্ভাব্য হুমকিসংক্রান্ত সব ধরনের রিপোর্ট আমাদেরকে দিয়ে হজম করাতো। যত বড় এবং সম্মানিতই হোক না কেন, কোনো শিখ যদি সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করত তা হলে তাকে গোপন খালিস্তানি বলে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। যখন কেবল সোর্সরাই নয়, জুনিয়র কর্মকর্তারাও দেখলেন যে, সন্ত্রাসী হুমকিসংক্রান্ত যেকোনো রিপোর্টকেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তখন হুমকি সংবলিত বানোয়াট রিপোর্ট তৈরি হতে লাগল। মনিটরিং শাখায় কর্মরত 'র'-এর একজন সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ দাবি করেন, তিনি দু'জন শিখের মধ্যকার কথোপকথন আড়ি পেতে শুনেছেন এবং ওই কথোপকথনে রাজিব গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেছে। সৌভাগ্যবশত সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল যিনি ওই বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, এটি একটি বানোয়াট তথ্য ছিল। পরে তাকে বরখাস্ত করা হয়। আইবি ও 'র' প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রতি হুমকি কোন্ কোন্ সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর কাছ থেকে আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে। একটি মাত্র সোর্সের একাধিক রিপোর্টের ভিত্তিতে এই তালিকায় বহু নাম স্থান পায়। ফলে শত শত নাম যুক্ত হয়ে তালিকাটি দীর্ঘ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নামের ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্য যেমন পুরো নাম কিংবা ঠিকানা কিংবা পাসপোর্টের বিস্তারিত বর্ণনা ইত্যাদি ছিল না। অ্যাডভান্স সিকিউরিটি লিয়াজোঁ টিমের সাথে আইবি ও 'র'-এর যেসব কর্মকর্তা যেতেন তারা এই তালিকাটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে এই মর্মে অনুরোধ জানাতেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে কিংবা সময়ে যাতে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সন্দেহভাজনদের দেশে প্রবেশ করতে দেয়া না হয়। কাউকে শনাক্ত করার মতো বিস্তারিত তথ্যবিহীন এত বিশাল তালিকা অনেক

ক্ষেত্রেই বহু দেশে হাসির খোরাকে পরিনত হয়। বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার ইসলামাবাদে রাজিব গান্ধীর সফরের আগে একটি অ্যাডভান্স সিকিউরিটি টিম ইসলামাবাদ সফর করে। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে দু'দেশের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের এক যৌথ বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে এই বিশাল রিপোর্টটি হস্তান্তরের আগে 'র' প্রতিনিধি পাকিস্তানে, বিশেষ করে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাসরত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম পড়ে শোনান। তিনি ওই তালিকা পড়ে শেষ করার আগেই স্বরাষ্ট্র সচিব তামাশা করে বলেন, 'অলক (আসল নাম নয়), আপনি যখন এই তালিকা পড়ছিলেন তখন আমি খুব বিচলিত বোধ করছিলাম এই ভেবে যে, এত দীর্ঘ তালিকার মধ্যে কখন আবার আমার নামটি এসে পড়ে কি না। সে ক্ষেত্রে আমি বেনজিরকে হয়তো বলতে বাধ্য হতাম যে, আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন হুমকি বলে মনে করেন। তাই রাজিব গান্ধীর সফরসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। ভাগ্যিস, আমার নামটি তালিকায় নেই দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম।' এ কথা শুনে সবাই হাসলেন– পাকিস্তানিরা হাসলেন নিতান্তই আন্তরিকতার সাথে আর ভারতীয়রা হাসলেন একটা বিব্রতবোধ থেকে।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের পরিকল্পিত সফরের আগেও অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। মালয়েশিয়া সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে সন্দেহভাজনদের তালিকা হস্তান্তর করা হলে তিনি মন্তব্য করেন, 'এটা সন্দেহভাজনদের তালিকা! আমি তো ভেবেছিলাম এটা একটা অভিধান।' অতঃপর তিনি তালিকার দিকে চোখ বুলিয়ে 'এ সিং', 'এস সিং', 'আই আহমদ' ইত্যাদি জাতীয় নাম দেখতে পান। অধিকাংশ নামের পাশেই শনাক্ত করার মতো বিস্তারিত কিছু নেই।

মালয়েশিয়ার ওই কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুরা নাম ও ঠিকানা দিতে বলেন। কিন্তু আইবি কিংবা 'র' কারো কাছেই তা ছিল না। তারা এসব নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন শুধু এই কারণে যে, কোনো না কোনো সূত্রে পাওয়া রিপোর্টে এ নামগুলো ছিল। মালয়েশীয়রা এতে বিস্মিত হন। তারা প্রশ্ন করেন, কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এবং এ ধরনের ব্যক্তির আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কি না সেটা না দেখেই আপনারা এই নামগুলো তালিকাভুক্ত করেছেন বলতে চান? ওই সময় মালয়েশিয়ার ভারতীয় হাইকমিশনে আইএফএস-এর এক পদস্থ শিখ কর্মকর্তা ছিলেন। একজন মালয়েশীয় কর্মকর্তা তখন রসিকতা করে বলেই ফেললেন যে, আমরা আশা করি, ওই ভদ্রলোকের নামটিও আপনারা এতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাহলে কিন্তু আমরা বড় ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো। গোয়েন্দা টীমটি কুয়ালালামপুর থেকে ফিরে আসার পর আইবি ও 'র' তালিকাটি ব্যাপকভাবে সংশোধন করে তার কলেবর ছোট করে ফেলে।

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে আইবি ও 'র'-এর সদর দফতর সম্ভাব্য হুমকির ব্যাপারে তাদের সোর্স এবং জুনিয়রদের কাছ থেকে বিরাট সংখ্যক রিপোর্ট পেয়ে থাকে। এসব রিপোর্টের সবগুলোই নিরাপত্তা ব্যবস্থার

সাথে সংশ্লিষ্ট দিল্লি পুলিশের কমিশনার, স্বরাষ্ট্র সচিব, এসপিজি ডাইরেক্টর ও অন্যদের কাছে পাঠানো হতো। বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বয়কারী গ্রুপ অতিরিক্ত কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার আছে কি না সেটা নিরূপণের জন্য প্রায় প্রতিদিনই রিপোর্টগুলো নিয়ে আলোচনা করত। এক দিন আইবি স্বাধীনতা দিবসের প্যারেড যে রাস্তা দিয়ে যাবে সে রাস্তায় সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কার ব্যাপারে রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টটি পর্যালোচনার পর সমন্বয়কারী গ্রুপ প্যারেড রুটে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর কয়েক দিন পর আইবি রিপোর্ট দেয় যে, প্যারেড রুট বরাবর নিরাপত্তা জোরদারের পরিপ্রেক্ষিতে খালিস্তানিরা প্যারেড রুট থেকে দূরে পুরনো দিল্লিতে হামলা চালাতে পারে। সমন্বয় গ্রুপে রিপোর্টটি পর্যালোচনার জন্য উঠলে দিল্লি পুলিশের কমিশনার আইবি কর্মকর্তার ওপর আক্ষরিক অর্থেই চটে গিয়ে বলেন, আমরা যদি পুরনো দিল্লিতেও অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই তাহলে কিছুদিন পর বলবেন, পুরনো দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদারের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসীরা কারোলবাগে হামলা চালাতে পারে। আমরা এভাবে কাজ করতে পারব না।

কয়েক বছর পর পি ভি নরসীমা রাও যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তার মুখ্য সচিব এ এন ভার্মা পর্যন্ত আইবি ও 'র'কে পিঠ বাঁচানোধর্মী রিপোর্ট দিচ্ছে বলে অভিযুক্ত করেন। তিনি এমনও অভিযোগ করতেন, দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই হুমকি সংক্রান্ত তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করছে। তিনি অভিযোগ করেন, দুটো সংস্থাই হুমকির ধারণা সংক্রান্ত এত বিশাল বিশাল রিপোর্ট দিচ্ছে যে, তা যেকোনো দেশ এবং উপলক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তারা হুমকি সংক্রান্ত যে রিপোর্ট তৈরি করছে সেটি কোন্ দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য সেটিও সুনির্দিষ্ট করে বলছে না। এক দিন তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে 'র'-এর পাঠানো সম্ভাব্য হুমকির প্রতিবেদনে এমন কিছু প্যারা সংযুক্ত হয় যেগুলো ইতোপূর্বে থাইল্যান্ডে সম্ভাব্য হুমকির যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল সেটি থেকে তুলে এনে যুক্ত করা হয় বলে মনে হয়েছে।

এ ধরনের অতিমাত্রায় সাবধানতা ও সুবিধাধর্মী রিপোর্টের উদাহরণ আজকের দিনে হাস্যকর মনে হতে পারে এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের বুদ্ধিমত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের পরিস্থিতিটা ছিল ভিন্ন। তখন ইন্দিরা গান্ধীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর হঠাৎ করে খালিস্তানিদের সহিংসতার মাত্রা ও ভয়াবহতা বেড়ে যায়। ওই সময় ইন্দিরা গান্ধী ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান জেনারেল এ এস বৈদ্য পুনেতে নিহত হন। সে অবস্থায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে কোনোরূপ যাচাই-বাছাইয়ের আগেই সম্ভাব্য হুমকির রিপোর্টগুলোকে ফিজিক্যাল সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোতে পাঠাতে হতো। এগুলো পিঠ বাঁচানোধর্মী রিপোর্টিং ছিল না, ছিল সুচিন্তিত। সারা বিশ্বেই গোয়েন্দারা এই নিয়ম মেনে চলেন যে, যখনই কোনো সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হুমকির আভাস পাওয়া যায় সেটা তৎক্ষণাৎ কোনোরূপ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার আগেই ফিজিক্যাল সিকিউরিটি

এজেন্সিগুলোতে পাঠিয়ে দিতে হবে। কোনো ভিভিআইপি'র নিরাপত্তার ব্যাপারে হুমকির আভাস সংবলিত রিপোর্ট যাচাই-বাছাই করে তারপর পাঠানোর পরিবর্তে রিপোর্ট করা ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি যুগপৎ চালাতে হয় এবং এই নীতিই সব আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা মেনে চলে।

১৯৮৭ সালে 'র'-এর একটি সোর্স এই মর্মে রিপোর্ট করে যে, খালিস্তানের একজন সন্ত্রাসী রাজিব গান্ধীর রাজঘাট সফরকালে একটি পিস্তল নিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা চালাবে। লোকটি রাজিব গান্ধীর সফরের দিনের আগের রাতে একটি গাছের ডালে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। এই রিপোর্টের সত্যতা দ্বিতীয় কোনো সোর্সের মাধ্যমে যাচাইয়ের উপায় ছিল না। ভিআইপি সিকিউরিটি ডিভিশনের চার্জে থাকা একজন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ফোর্স কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে বিষয়টি অবহিত করেন। যেহেতু এই হুমকির খবরকে অন্য কোনো তরফে যাচাই করা যায়নি তাই তিনি বিষয়টি সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে না জানিয়ে বরং একজন যুগ্ম সচিবকে অবহিত করেন। ওই যুগ্ম সচিব ও একজন পুলিশ কমিশনার, যিনি তার একটি কপি পেয়েছিলেন, এই খবরকে গতানুগতিক ও পিঠ বাঁচানোধর্মী মনে করেন। ফলে এর প্রতি যেরূপ গুরুত্ব দেয়া দরকার সেরূপ গুরুত্ব দেননি। এতে দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেনি এবং সন্ত্রাসী লুকিয়ে থাকার মতো গাছগুলো ও সম্ভাব্য লুকানোর স্থানগুলো চেক করা হয়নি। অথচ রিপোর্টে ঠিক যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই সন্ত্রাসী রাজিব গান্ধীর সফরের আগের রাত থেকে গাছের ঘন শাখায় নিজেকে লুকিয়ে রাখে। পুলিশ রাজঘাটে অবস্থান নেয়ার সময় পর্যন্ত সন্ত্রাসী নিজেকে তাদের চোখের আড়ালে রাখতে সক্ষম হয়। রাজিব গান্ধী রাজঘাটে পৌঁছার পরই সন্ত্রাসী পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পিস্তলের রেঞ্জ কম থাকায় এবং সেটি ঠিকমতো কাজ না করায় রাজিব গান্ধী সে দিনের মতো প্রাণে বেঁচে যান। এই সঠিক গোয়েন্দা তথ্যের জন্য 'র'-কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানানোর পরিবর্তে এই ঘটনার তদন্তকারী কর্মকর্তা টি এন সেশান কেন বিষয়টি একজন সচিব পর্যায়ের লোককে না জানিয়ে শুধু যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে জানানো হলো তার কৈফিয়ত তলব করেন। পরে সেশান যখন কেবিনেট সচিব হয়েছিলেন তখন তিনি ওই কর্মকর্তার কাজের চমৎকার রেকর্ড সত্ত্বেও তাকে যুগ্ম সচিব পদে উন্নীত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পরে ওই কর্মকর্তা চরম ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সময় হওয়ার আগেই অবসরে চলে যান।

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার প্রতি সম্ভাব্য হুমকির রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গোয়েন্দারা কী ধরনের উভয় সঙ্কটের মধ্যে থাকেন। তথ্য যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে বলা হয় কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই মনগড়া তথ্য দিয়েছে। আবার যখন তথ্য সঠিক প্রমাণিত হয় কিন্তু রিপোর্ট দিতে বিলম্ব হয় সে ক্ষেত্রে বলা হয় যে, লোকগুলো কাজে অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন। এ কথা সত্য যে, যাচাই-বাছাইবিহীন তথ্য প্রদানের দু'টো অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমত, হুমকি বাস্তবায়িত হয়নি এ ধরনের তথ্য ঘন ঘন দেয়া হলে ফিজিক্যাল

সিকিউরিটি সংস্থাগুলোর মধ্যে গোয়েন্দা রিপোর্টগুলোকে গুরুত্ব সহকারে না নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যাচাই-বাছাই ছাড়াই রিপোর্ট দানের প্রবণতা ফিজিক্যাল সিকিউরিটি সংস্থাগুলো কর্তৃক হুমকিকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন ও তার ফলে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে ধাবিত করতে পারে। আবার ঘন ঘন অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ঘটনা ঘটলে যে সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সন্ত্রাসের উদ্ভব ঘটছে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। আর এটিই হচ্ছে উভয় সঙ্কট, যার কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে গোয়েন্দাদের এই সত্যকে মেনে নিয়েই কাজ করে যেতে হয়।

১৯৮৫ সালের জুনে রাজিব গান্ধী তার প্রথম বিদেশ সফরে যে দিন জর্ডান যান সে দিনটি ছিল অপারেশন ব্লু স্টারের প্রথম বার্ষিকী। 'র' এ মর্মে যুক্তরাজ্যে তার সূত্র থেকে নির্ভরযোগ্য খবর পায় যে, খালিস্তানি সন্ত্রাসীরা রাজিব গান্ধীকে জেনেভায় হত্যার পরিকল্পনা করছে এবং যুক্তরাজ্য থেকে গুরদিপ সিং সিভিয়া নামের একজন খালিস্তানি সন্ত্রাসী এ লক্ষ্যে জেনেভায় অবস্থান করছে। তখন এই মর্মে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, প্রভিশনাল আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) অনুকরণে হামলা চালানো হতে পারে। আইআরএ ১৯৮৪ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচারকে হত্যার জন্য যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে একটি স্থানীয় হোটেল বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। ওই হোটেলে কনজারভেটিভ পার্টির বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে মার্গারেট থেচার ও তার দলের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অবস্থান করার কথা ছিল। তবে আইআরএ'র সে হামলা ব্যর্থ হয়েছিল।

রাজিব গান্ধীর আগমনের এক দিন আগে জেনেভা পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের লোকজন জেনেভায় জাতিসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুচকুন দুবের বাসভবনে অবস্থান করবেন। তার আগে তাদের জন্য হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাজিব গান্ধী ও তার পরিবার জেনেভায় পৌঁছার পর স্থানীয় পুলিশ তাদের সরাসরি রাষ্ট্রদূতের বাসায় নিয়ে যায়। রাজিব গান্ধীর সফরসঙ্গী যেমন তার মুখ্য সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, অরুণ সিং ও অন্যদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের লোকদের জন্য হোটেলে যে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা বাতিল করা হয়নি। কেবল মুখ্য সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, প্রেস অ্যাডভাইজার এবং অরুণ সিংকে বলা হয়, রাজিব ও তার পরিবার দুবের বাসায় অবস্থান করবেন। তাদেরকে তার সাথে আলোচনার জন্য দুবের বাসায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। আর বাকিদের তার আসল অবস্থানস্থল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়। আবার যেসব সিনিয়র কর্মকর্তাকে রাজিবের সাথে দেখা করতে দেয়ার অনুমতি দেয়া হতো তাদেরকেও গাড়িতে করে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে যেতে দেয়া হতো না। রাষ্ট্রদূতের বাসা থেকে খানিকটা দূরে গাড়ি রেখে হেঁটে তাদের সেখানে যেতে দেয়া হতো।

কর্মকর্তাদের কেউ কেউ আইপিজি'র তৎকালীন পরিচালককে ড. এস সুব্রামিনয়ামের কাছে জেনেভা পুলিশের এ ধরনের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে

বলেন, পুলিশ যাতে তাদেরকে তাদের গাড়িতে করে রাষ্ট্রদূতের বাসভবন পর্যন্ত যেতে দেয়। তিনি এ ব্যাপারে জেনেভা পুলিশকে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, জেনেভা পুলিশ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য এ ধরনের বাড়তি ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এ অবস্থায় তিনি কিছুতেই তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। কর্মকর্তারা যখন জেনেভা পুলিশের কঠোরতার বিষয় নিয়ে সুব্রামনিয়ামের সাথে কথা বলছিলেন সে সময় রাজিব গান্ধী তাদের কাছে এসে পড়েন এবং তারা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন তা জানতে চান। কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আপত্তির কথা শুনে রাজিব গান্ধী সুব্রামনিয়ামের অবস্থানকে সমর্থন করে বলেন, জেনেভা পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। যেসব কর্মকর্তার ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনোরূপ ধারণা নেই তারাই এসব ক্ষেত্রে বেশি আপত্তি জানিয়ে থাকেন। আর এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, ফিজিক্যাল সিকিউরিটি এজেন্সিগুলো ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সন্ত্রাসীদের হাতে নানাবিধ ট্র্যাজেডি সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও বারবারই এমন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সুব্রামনিয়াম কাণ্ডজ্ঞানহীন ধরনের কর্মকর্তা ছিলেন না। তাই রাজিব গান্ধী তার অবস্থানকে সমর্থন করেছিলেন। তবে এমন সব কর্মকর্তাও আছেন যারা সুব্রামনিয়ামের মতো এত কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নন। ফলে তারা ভিভিআইপিদের ঘনিষ্ঠ কারো না কারো জেদের কাছে হার মেনে তাদের সুবিধার্থে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজিব গান্ধীর আগমনের আগে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) কানাডার ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশনের (আইএসওয়াইএফ) লাল সিং ওরফে মানজিত সিংয়ের একটি পরিকল্পনা জেনে ফেলে। তারা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে রাজিব গান্ধীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় খালিস্তানিরাও হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ভজন লালকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ভজন লাল রাজিব গান্ধীর আগে যুক্তরাষ্ট্র সফর করে গিয়েছিলেন। লাল সিং এফবিআই'র হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। আইএসআই তাকে পাকিস্তানে আশ্রয় দেয়। আমরা যারা রাজিব গান্ধীর প্রথম বিদেশ সফরকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলাম তারা রাজিব গান্ধী ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরতে পেরেছেন দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। জেনেভায় ভারতীয় সমিতির প্রেসিডেন্ট ১৯৮৫ সালের ২১ জুন তার সমিতি এবং রাজিবের সফরের সাথে সম্পৃক্ত ভারতীয় মিশনের কর্মকর্তাদের জন্য তার বাসভবনে একটি পার্টির আয়োজন করেন। মুচকুন দুবে আর আমিও সেখানে ছিলাম এবং কোনোরূপ অঘটন ছাড়াই রাজিব গান্ধী তার সফর সমাপ্ত করতে পেরেছেন সে জন্য আমরা একে অন্যকে যখন ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম ঠিক সে সময় বিবিসিতে একটি ব্রেকিং নিউজে বলা হয়, কানিষ্কা নামক ভারতগামী একটি এয়ার ইন্ডিয়ান বিমানকে আয়ারল্যান্ডের উপকূলের অদূরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং বিমানের ৩২৯ জন যাত্রী ও ক্রুর সবাই নিহত হয়েছেন। বিমানটি মন্ট্রিয়াল হয়ে টরেন্টো থেকে ভারত যাচ্ছিল।

এ সংবাদে আমরা সবাই মর্মাহত হলাম। আমরা জানতাম, খালিস্তানিরা অপারেশন ব্লু স্টারের প্রথমবার্ষিকীতে তাক লাগানো সন্ত্রাসী হামলা চালাবে। এ কারণে ভারতে সব ভিআইপি'র দৈহিক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বিদেশ সফরকালে রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে হামলার সম্ভাবনার রিপোর্টও আমরা পেয়েছিলাম। ১৯৮৫ সালের জুনের শুরুর দিকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের আলোকে এয়ার ইন্ডিয়া ফিজিক্যাল সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশকে (আরসিএমপি) নিম্নবর্ণিত ট্যালেক্স বার্তা পাঠানো হয়েছিল; 'গোয়েন্দাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, শিখ চরমপন্থীরা বিমানে কিংবা রেজিস্টার্ড ব্যাগেজে টাইম ডিলে ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে পারে। এমনটাও জানা গেছে, শিখ চরমপন্থীরা সুইসাইড স্কোয়াড স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। এসব সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যরা রেজিস্টার্ড কিংবা ক্যারি অন ব্যাগেজে বিস্ফোরক বহন করে বা অন্য কোনোভাবে বিমান উড়িয়ে দিতে পারে।'

কানাডাভিত্তিক খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের প্রতি সম্ভাব্য হুমকির ব্যাপারে কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের (সিএসআইএস) ধারণা জানতে চাওয়া হলেও আরসিএমপি সিএসআইএসকে বলেনি যে, ভারতীয় মূল্যায়নে এ ধরনের হুমকির কথা বলা হয়েছে। আরসিএমপি তার জবাবে জানায়, সিএসআইএস এ ধরনের হুমকির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। ওই পর্যায়েও আরসিএমপি সিএসআইএসকে এ কথা বলার গরজ বোধ করেনি যে, ভারতীয় মূল্যায়নে হুমকির কথা বলা হয়েছে এবং তার মূল্যায়ন পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছে। দু'টি মূল্যায়ন যাচাই করে দেখার উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

আরসিএমপি ভারতীয় মূল্যায়নকে অবজ্ঞা করে এবং কোনো হুমকি নেই মর্মে সিএসআইএস-এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে কাজ করে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আরসিএমপির কর্মকর্তা তার সদর দফতরে ৫ জুন এক টেলেক্স বার্তায় বলেন, 'বিমানবন্দরে অতিরিক্ত কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

ভারতীয় হুঁশিয়ারির ব্যাপারে আরসিএমপি'র দুঃখজনক নিষ্ক্রিয়তার কারণে ৩২৯ জন নিরীহ বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। এ ঘটনাই প্রমাণ করে, ভারত খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় কিছু কিছু পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে কী ধরনের অসহযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। অপারেশন ব্লু স্টারের প্রথম বার্ষিকীতে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডসহ আরও বহু দেশের ফিজিক্যাল সিকিউরিটি এজেন্সি ভারতের সতর্কবাণীকে গুরুত্বসহকারে দেখলেও সিএসআইএস ও আরসিএমপি তা অবজ্ঞা করে। কানাডার কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকায় শিখদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি বিধায় খালিস্তানিদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত থাকার বিষয়টি সিএসআইএস স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তবে ওই ট্র্যাজেডির পর তারা তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কেননা নিহতদের

প্রায় সবাই ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয়। কানাডীয় কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত এ ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং কার অবহেলার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটি নির্ধারণ করেনি। অথচ লক্ষ্য করুন, কী ক্ষিপ্রতার সাথে ১৯৮৮ সালের ২১ ডিসেম্বর স্কটল্যান্ডের লকারবিতে প্যান অ্যাম বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা তদন্ত করে এর জন্য কারা দায়ী সেটা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।

কানাডার বাবর খালসা বস্তুত একই দিনে দুটো ভারতীয় বিমান উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। একটি ছিল টরেন্টো থেকে, অপরটি ছিল টোকিও থেকে উড্ডয়নের পর। টরেন্টো থেকে যে বিমানটি উড্ডয়ন করেছিল সেটির মধ্যে সন্ত্রাসীরা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে সাফল্যের সাথে ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) লাগেজ হোল্ডের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে টোকিওতে তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায় এ কারণে, যে লাগেজের মধ্যে আইইডি লুকানো ছিল বিমানে তোলার আগেই সেটি বিস্ফোরিত হয়। এতে বিমানবন্দরের মাত্র দু'জন কর্মচারী নিহত হন। সৌভাগ্যক্রমে যাত্রীরা বেঁচে যান।

তদন্তে দেখা যায়, কানাডায় বাবর খালসার তালিন্দর সিং পারমার উভয় হামলার পরিকল্পনার মূল নায়ক ছিলেন। তিনিও পাকিস্তানে পালিয়ে যান এবং সেখানে আইএসআই তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রাজিবকে হত্যার পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত লাল সিং ওরফে মানজিত সিং এবং ভারতীয় বিমান কানিস্কা উড়িয়ে দেয়া এবং টোকিওতে বিমান ধ্বংসের ব্যর্থ নায়ক তালিন্দর সিং পারমার আইএসআই'র অতিথি হিসেবে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত গোপনে পাকিস্তানে বসবাস করতে থাকেন। সেখান থেকে তারা ভারতে ও বিদেশে সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনা করছিলেন। তারা পাকিস্তানে খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের জন্য আইএসআই'র স্থাপিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো পরিদর্শন করে তাদের উজ্জীবিত করার মতো বক্তব্য দিতেন। আমরা যতবারই ইসলামাবাদকে বিচারের জন্য তাদেরকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করতে বলেছি, ততবারই আমরা একই উত্তর পেয়েছি– 'আমরা তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। তারা পাকিস্তানে নেই।' ইন্টারপোলও তাদেরকে খুঁজে বের করার যে নোটিশ দিত, আইএসআই সেটা উপেক্ষা করত।

ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড এবং কানিস্কা উড়িয়ে দেয়ার ঘটনার পর খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে যুক্তরাজ্য ও কানাডার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। তখনও পর্যন্ত তারা খালিস্তানিদের সন্ত্রাসী বলতে প্রস্তুত ছিল না, যদিও বহু ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা ছিল। এটার আংশিক কারণ ছিল, তাদের কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকায় শিখ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অপরটি ছিল ভারত, বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী যে ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন সেটার প্রতি তাদের সহমর্মিতার অভাব।

যে দিন ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন সে দিন যুক্তরাজ্যের কিছু খালিস্তানি জগজিৎ সিং চৌহানের নেতৃত্বে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে জড়ো হয়ে নেচে-গেয়ে মদপান করে এবং পথচারীদের মধ্যে মদ বিতরণ করে উল্লাস প্রকাশ করে। এ দৃশ্য

ব্রিটিশ টিভিতে সম্প্রচারিত হয়। ব্রিটিশদের একটা বিরাট অংশ এ দৃশ্য দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও তাতে বিরক্ত হয়েছিলেন। জানা গেছে, তিনি ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিস এমআই-৫কে খালিস্তানিদের মোকাবেলায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই দৃশ্যে কী রূপ বিরক্ত হন তা প্রকাশ করার জন্য তিনি ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজিব গান্ধীর কাছে ফোন করেন। তিনি রাজিব গান্ধীকে এটাও অবহিত করেন, তিনি এমআই-৫কে খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় আইবি ও 'র'-এর সাথে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। বাবর খালসা কর্তৃক কানিস্কা উড়িয়ে দেয়ার পর এসব সন্ত্রাসী দমনে ব্রিটিশ সঙ্কল্প আরও জোরদার হয়।

এর পর খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় আইবি ও 'র'কে এমআই-৫ ও এমআই-৬ এর সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সহযোগিতা দেয়া হয় নয়াদিল্লি ও লন্ডনে ওই চারটি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের বছরে দু'বার করে অনুষ্ঠিত বৈঠকের লিখিত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও বাস্তবভিত্তিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ে মাধ্যমে। এমআই-৫ ও র-এর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের লক্ষ্যে একটি হটলাইন স্থাপন ও সেটি দ্রুত চালু করা হয়। এমআই-৫ ও এমআই-৬ কেবল খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড ও তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারেই দ্রুত গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেনি, তারা এসব সন্ত্রাসীকে আইএসআই কিভাবে সহায়তা দিচ্ছে সে ব্যাপারেও পরস্পরকে সহযোগিতা করে। আমার এমন একটা উদাহরণ মনে পড়ে না যেখানে ব্রিটিশ সংস্থাগুলো আমাদের সাথে যেসব সোর্স রিপোর্ট শেয়ার করত তাতে পাকিস্তান কিংবা আইএসআই'র নাম বাদ পড়ত।

তাদের সাথে বৈঠককালে আমি লক্ষ্য করলাম, এসব বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য এমআই-৫ এর বাজেট ছিল বিশাল এবং সদর দফতরে তাদের লোকবলও বেশি। এ ছাড়া পাঞ্জাবি-গুরুমুখি ভাষা জানা বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও ছিল তাদের বেশি। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই তাদের বেশি বেশি ছিল, যা আইবি এবং 'র'-এর সম্মিলিত বাজেট বা লোকবলের চাইতেও বেশি। তদুপরি ব্রিটিশ এজেন্সিগুলো তাদের স্বরাষ্ট্র দফতরকে প্রিভেনশন অব টেররিজম অ্যাক্ট (স্পেশাল প্রভিশান) সংশোধন করতে বলে, যাতে তারা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) বাইরেও যেকোনো সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় কাজ করতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ সংশোধনীটি গৃহীত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি কেবল উত্তর আয়ারল্যান্ডের সন্ত্রাসীদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল। এই সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর তারা এর ধারাগুলোকে খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এমআই-৫ যুক্তরাজ্যের চ্যারিটিজ কমিশনকেও নির্দেশ দেয় যাতে তারা যুক্তরাজ্যের গুরুদুয়ারার অ্যাকাউন্টগুলো সময়ে সময়ে পরীক্ষা করে দেখে। গুরুদুয়ারাগুলো খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের অর্থ জোগান দেয় বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। তবে এরপরও খালিস্তানিদের জন্য যুক্তরাজ্য থেকে অর্থ সরবরাহ বন্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা সন্তোষজনক ছিল না। এর কারণ ছিল এই যে, ব্রিটিশরা এই বিষয়ের ওপর জোর দিতে থাকে যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা যদি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কমিশনের

কাছে এটা তুলে ধরতে পারে, গুরুদুয়ারাগুলো যুক্তরাজ্য থেকে খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের অর্থ সরবরাহ করছে তাহলে তারা সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাই নিতে পারে। এটা ছিল একটা অবাস্তব অনুরোধ। নাইন-ইলেভেনের পর তারা নিজেরাই নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়েই অনেকে চরমপন্থী জিহাদি সংগঠনের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে এবং এ জন্য কোনো শক্তিশালী প্রমাণাদির প্রয়োজন হয়নি।

১৯৮৫ সাল পর্যন্ত অসহযোগিতা করার পর কানাডীয় সংস্থাগুলো কানিষ্কা ধ্বংসের পর ব্রিটিশদের মতোই জোরেশোরে সহযোগিতা করতে থাকে। কেননা ওই ঘটনায় নিহতদের অনেকেই ছিলেন কানাডার নাগরিক। ব্রিটিশদের মতো তারাও খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড এবং পাকিস্তান ও আইএসআই'র ভূমিকা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য তাদের গোচরে আসার সাথে সাথেই সেগুলো আইবি ও 'র'কে অবহিত করত।

কানাডা ও ব্রিটিশদের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের সম্পূর্ণ উল্টো ছিল আমেরিকা ও ইউরোপীয় মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মনোভাব। মার্কিন সংস্থাগুলোর কাছ থেকে অসহযোগিতার মাত্রা ছিল পীড়াদায়ক। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ভিভিআইপিদের সফরকালে ফিজিক্যাল সিকিউরিটি জোরদার এবং প্রশিক্ষণ সহযোগিতার অনুরোধের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিলেও খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের তৎপরতা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো গোয়েন্দা তথ্য তারা কদাচিৎই দিত। পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয় মদদদাতা ঘোষণা করার জন্য মার্কিন প্রশাসনের প্রতি আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কোনো সাড়া মেলেনি।

আইবি এবং 'র' সন্ত্রাসীদের জন্য পাকিস্তানের ভূখণ্ডে আইএসআই'র প্রশিক্ষণ শিবির এবং আইএসআই কর্তৃক সন্ত্রাসীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছিল। মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে যখনই আমরা এসব গোয়েন্দা তথ্য তুলে ধরতাম তখনই তারা বলত, এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ভারতীয় পুলিশ কর্তৃক সন্দেহভাজনদের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদকালে।

আমরা ব্রিটিশ ও কানাডীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে তারা পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সিআইএ'কে সরবরাহ করে। আমি আমার ব্রিটিশ ও কানাডীয় প্রতিপক্ষকে বলেছি, 'দেখুন, আমি পাকিস্তানের মদদে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে সিআইএ'কে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি যতবারই গোয়েন্দা তথ্য উপস্থাপন করেছি ততবারই তারা তা কোনো না কোনো অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেছে। আপনারা আপনাদের মতো করে নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আপনারা যদি সেগুলো সিআইএ'র কাছে উপস্থাপন করেন তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হবে।'

ওই দু'টি সংস্থায় আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারীরা একই ধরনের জবাব দেন। তারা বলেন, 'আমরা জানি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মদদে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমাদের সবার কাছে যে পরিমাণ তথ্য রয়েছে তার চেয়েও বেশি তথ্য

রয়েছে সিআইএ'র কাছে। সিআইএ আইএসআই'র মদদে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে অনেক আগেই জানে। সমস্যাটা সিআইএ'র সাথে নয়; সমস্যাটা হয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সাথে। পররাষ্ট্র দফতর পাকিস্তানের বিপক্ষে যেতে নারাজ।'

১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে লাল সিং ওরফে মানজিত সিং পাকিস্তান থেকে ভারতে এলে গুজরাট পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ভারত, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক মামলায় তাকে খোঁজা হচ্ছিল। কানাডা ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থায় আমি আমার প্রতিপক্ষকে জানালাম, তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের কর্মকর্তাদের ভারতে পাঠাতে পারেন। আমি তাদেরকে এ মর্মে আশ্বাসও দেই যে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদকালে কোনো ভারতীয় কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন না। কানাডীয়রা এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে পাঠান তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। মার্কিন সংস্থাগুলো এ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। পরে আমি জানতে পারি, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকে কাউকে যাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভারতে না পাঠানো হয় সে পরামর্শ দিয়েছিল। পররাষ্ট্র দফতর এই আশঙ্কা করছিল যে, লাল সিং যদি মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে আইএসআই'র ব্যাপারে সব কিছু বলে দেয় তাহলে তারা এতকাল 'সম্ভাব্য নির্যাতনের মাধ্যমে আইএসআই সম্পর্কিত তথ্য বের করা হয়েছে' বলে যে দাবি করে আসছিল তা প্রত্যাখ্যান করা তাদের জন্য কষ্টকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মহাদেশের দেশগুলোর সহযোগিতা ১৯৯১ সালের দু'টি ঘটনার পর বৃদ্ধি পায়। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপভিত্তিক কিছু শিখ সন্ত্রাসীর জুলিও রাইবেরিওকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা। জুলিও রাইবেরিও তখন রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এর আগে তিনি খালিস্তানে সহিংসতা বৃদ্ধির সময় পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান ছিলেন। তদন্তে দেখা যায়, সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসীদের এক গোপন বৈঠকে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয় এবং গোটা অপারেশনটির সমন্বয় সাধন করে সেখানে কর্মরত খালিস্তান লিবারেশন ফোর্স (কেএলএফ)।

দ্বিতীয় ঘটনায় কেএলএফ'র সন্ত্রাসীরা দিল্লিতে কর্মরত রুমানিয়ার কূটনীতিক লাইভিউ রাদুকে অপহরণ করে একটি গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাকে জিম্মি করে এবং তার মুক্তির বিনিময়ে কারাগারে আটক কিছু খালিস্তানি সন্ত্রাসীর মুক্তি দাবি করে। ভারত সরকার তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজ নিজ উদ্যোগে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও নিউ ইয়র্কে তাদের সহযোগীদের সহায়তায় লাহোরভিত্তিক সন্ত্রাসীদের টেলিফোনে কথোপকথনে আড়ি পাতে। আইবিও অপহরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কেএলএফ সদস্যকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাদের আড়িপাতা থেকে এবং গ্রেফতারকৃত কেএলএফ সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদের আলোকে এই তথ্য বেরিয়ে আসে যে, কেএলএফ প্রথমে একজন ফরাসি দূতকে অপহরণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু তারা তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখে সে পরিকল্পনা ভগ্নচিত্তে বাদ দেয়। অতঃপর তারা কোনো ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না এমন একজন রুমানিয়

কূটনীতিককে অপহরণ করে। সন্ত্রাসীরা এটা দেখে মর্মাহত হয়, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এই অপহরণের ঘটনায় তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তাই তারা তাকে মুক্তি দিয়ে ভবিষ্যতে ভালো প্রচার পাওয়ার আশায় আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশের কাউকে টার্গেট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আড়িপেতে শোনা আলোচনা এবং জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবেদন সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে থাকে। এর ফলে মার্কিন, ফরাসি ও জার্মান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড মনিটর করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করে। এসব সংস্থার সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও তা কানাডা ও ইউকে'র সহযোগিতার পর্যায়ে তখনও উন্নীত হয়নি। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্র আইএসআই'র সাথে সন্ত্রাসীদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার বিষয়টি তখনও এড়িয়ে চলতে থাকে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মার্কিন অনীহার সুযোগে আইএসআই খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ জোরদার করে। এমন খবরও পাওয়া যায় যে, আইএসআই তাদেরকে বিমান ভূপাতিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কাঁধে বহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে। রাজিব গান্ধীকে বহনকারী বিমানের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ইসরাইলের বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখা মোসাদ রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস যাতে কাজ না করে সে জন্য জ্যামার সরবরাহ করার জন্য 'র'-এর আবেদনে ইতিবাচক সাড়া দেয়। ব্রিটিশদের কাছে এ ধরনের জ্যামার চেয়ে না পাওয়ার পর মোসাদের কাছে এ অনুরোধ জানানো হয়। রাজিব গান্ধীর কানাডা সফরকালে যখন রিমোট কন্ট্রোল এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের (আইইডি) সাহায্যে বিমান উড়িয়ে দেয়ার হুমকি অতিমাত্রায় ছিল তখন ব্রিটিশরা জ্যামারসহকারে একটি টিম কানাডায় পাঠায়। তবে তারা জ্যামার ব্যবহারে এসপিজি স্টাফদের প্রশিক্ষণ দিতে কিংবা ভারতকে এগুলো ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ভারতীয় বিমান ছিনতাইকারীদের এবং লাল সিং ওরফে মানজিত সিং ও তালিন্দর সিং পারমারকে গ্রেফতার করে ভারতের কাছে হস্তান্তরের দাবি ইসলামাবাদ বারবার প্রত্যাখ্যান করে। তারা পাকিস্তানে নেই বলেও ইসলামাবাদ দাবি করে। ব্রিটিশ ও কানাডীয় গোয়েন্দারা পাকিস্তানে তাদের উপস্থিতির সত্যতা স্বীকার করলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবনতির দিকে যেতে থাকে। একটি স্বাধীন সিন্ধু গঠনের ব্যাপারে সিন্ধুদেশ মুভমেন্ট হালে বাতাস পায় তখন। সিন্ধুদেশ আন্দোলনের জনক মরহুম জি এম সাইদ প্রকাশ্যে রাজিব গান্ধী ও ভারতের অন্যান্য নেতার সাথে দেখা করেন। পাকিস্তানে তিনি এই মর্মে বিবৃতি দেন যে, তিনি ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনের একজন সহ-উদ্যোক্তা হয়ে এক ঐতিহাসিক ভুল করে ফেলেছেন। সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টির ডাক দেয়া হয়েছিল। তিনি সিন্ধুদেশ আন্দোলন জোরদার করার জন্য সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ চষে বেড়ান। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডে সিন্ধি হিউম্যান রাইটস সংগঠন গজিয়ে ওঠে এবং সেগুলো সিন্ধিদের অধিকার

লঙ্ঘনের বিষয় তুলে ধরে।

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত আলতাফ হোসেন করাচি ফিরে আসার পর জিয়াউল হক ও আইএসআই সিন্ধিদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য তাকে মুহাজির স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন গঠনে উদ্বুদ্ধ করেন। সিন্ধি ও মুহাজিরদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও সন্ত্রাসের মদদ দেয় আইএসআই। করাচিতে মুহাজির ও পশতু ট্রাকচালকদের মধ্যে বেশকিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পশতুদের রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক মুহাজিরদের দমন-নিপীড়নের ফলে মুহাজিররাও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চলে যায়। মুহাজির স্টুডেন্টস মুভমেন্ট রূপ লাভ করে মুহাজির কওমি মুভমেন্টে (এমকিউএম)। এমকিউএম দাবি করতে থাকে যে করাচিকে হংকংয়ের মর্যাদা দিতে হবে। সিন্ধিদের বিরুদ্ধে মুহাজিরদের লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও আইএসআই'র ডিভাইড অ্যান্ড রুল খেলা বুমেরাং হয়।

ওই সময় অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীরা ধীরে ধীরে করাচিতে গিয়ে স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলতে থাকেন। তাদের অনেকেই করাচি বন্দরে শ্রমিকের চাকরি নেন। তাদের ডাকা ঘন ঘন হরতালে বন্দরের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক জাহাজ কোম্পানিগুলো করাচি বন্দর এড়িয়ে চলতে শুরু করে। কার্গো ইন্স্যুরেন্স রেট করাচিতে বেড়ে যায়। আফগানিস্তানের নজিবুল্লাহ সরকারের দ্বারা আফগান ভূখণ্ডে আশ্রয় পাওয়া বালুচ নেতারা দিল্লি সফর করে ভারতীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের পুত্র ওয়ালি খান প্রকাশ্যে ভারত সফর করে রাজিব গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। 'র' এবং আফগান গোয়েন্দা সংস্থা খাদ-এর প্রধানরা পরস্পরের দেশ সফর এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করতে থাকেন। এসব সফর গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও আইএসআই কাবুলে তার সোর্সের মাধ্যমে তা জেনে ফেলে।

সাধারণভাবে সিন্ধুর পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে করাচির পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যেতে থাকে এবং এ অবস্থা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আইএসআই ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করার জন্য 'র'কে দোষারোপ করতে শুরু করে। তবে তা সত্য ছিল না। পাকিস্তান তার নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করছিল এবং এমনটি ঘটা ছিল অবধারিত। এজন্য 'র'কে কোনো ভূমিকা পালন করতে হয়নি। তবে একটি মাত্র কাজ, যা 'র' করেছিল তা হচ্ছে রাজিব গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে সিন্ধি ও বালুচ ভাষায় অল ইন্ডিয়া রেডিওর এক্সটার্নাল সার্ভিসের কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়তা এবং পশতু ভাষায় আফগান রেডিওর এক্সটার্নাল সার্ভিস সম্প্রসারণে উৎসাহিত করেছিল। সিন্ধি ও বালুচ ভাষায় প্রোগ্রাম সম্প্রচারের জন্য রাজস্থানে টিভি কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু সেটা কার্যকর হতে পারেনি।

১৯৮৮ সালের ১০ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডির ওজিরিতে একটি সামরিক গুদামে বিস্ফোরণে ৫ হাজার সামরিক ও বেসামরিক লোক নিহত হয়। আফগান মুজাহিদদের জন্য সিআইএ'র সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এই গুদামে রাখা

হতো। আইএসআই এখান থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের সরবরাহ করত। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সিআইএ'র একটি প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান সফরের আগে আইএসআই নিজেই এটি ঘটিয়েছে বলে পাকিস্তানের কিছু নির্বাসিত রাজনীতিকের ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জিয়াউল হক এ ব্যাপারে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের কাছে এই মর্মে অভিযোগ ছিল, আইএসআই ও অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তা আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইরানি ও লিবীয়দের কাছে স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে দিয়ে প্রচুর অর্থ কামাই করেছেন। জিয়াউল হকের প্রধানমন্ত্রী সিন্ধুভাষী মুহাম্মদ খান জুনেজো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করে দাবি করেন, ওজিরি ট্র্যাজেডির তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং এ জন্য দায়ী আইএসআই ও সামরিক কর্মকর্তাদের শাস্তি দিতে হবে। জিয়াউল হক ১৯৮৮ সালের ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী জুনেজোকে বরখাস্ত করে জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দেন। গিলগিটের শিয়ারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে জিয়াউল হক কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে থাকা ট্রাইবাল এরিয়ার (এফএটিএ) ওয়াজিরিস্তান এলাকার ওসামা বিন লাদেনপন্থী সুন্নি উপজাতীয়দের সহায়তায় ওই বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করেন।

১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট মুহাজির সম্প্রদায়ভুক্ত সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মির্জা আসলাম বেগ, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরনল্ড রাফেল ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাকে নিয়ে জিয়াউল হক একটি বিমানযোগে বাহওয়ালপুর যান। তারা সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি ট্যাঙ্কের মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। এই ট্যাঙ্কটি পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছিল। ট্যাঙ্ক মহড়া ও দুপুরের খাবারের পর জিয়াউল হক ও তার সফরসঙ্গীরা বিমানযোগে ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দেন। মির্জা আসলাম বেগ তাদের সাথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অন্য একটি বিমানে আরওহণ করেছিলেন। তিনি যখন বিমানে করে যাচ্ছিলেন তখন তার বিমানের পাইলট এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ারের স্টাফদের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলার শব্দ শুনতে পান এবং এ থেকে আভাস পাওয়া যায়, কন্ট্রোল রুমের সাথে জিয়ার বিমানটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর মনিটরিং স্টেশনও তাদের মধ্যকার কথোপকথন শুনতে পায়। ভারতীয় বিমানবাহিনী সাথে সাথে ব্যাপারটি রাজিব গান্ধীকে অবহিত করে। জেনারেল বেগ তার পাইলটকে বাওয়ালপুরে ফিরে যেতে বলেন। বিমানটি বাওয়ালপুরে ফেরার পথে তিনি ভূমি থেকে আগুন ও ধোঁয়া উড়তে দেখেন। তিনি তার পাইলটকে নিচে নেমে এসে অকুস্থলের চারপাশে চক্কর দেয়ার কথা বলেন। তিনি লক্ষ করলেন, জিয়ার বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। তিনি বাওয়ালপুর এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ারকে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী বিমান পাঠানো এবং তার পাইলটকে ইসলামাবাদের দিকে যেতে থাকার নির্দেশ দেন। উদ্ধার পার্টি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায়, কেউ জীবিত নেই।

মির্জা আসলাম বেগ সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের চেয়ারম্যান গোলাম ইসহাক খানকে প্রেসিডেন্টের

দায়িত্ব গ্রহণ করার পরমার্শ দেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দেন।

কয়েক ঘণ্টা পর জিয়াউল হকের মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হলে বিপুলসংখ্যক মানুষ রাস্তায় নেমে এসে নেচে গেয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস প্রকাশ এবং পথচারীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে। গোলাম ইসহাক খান জিয়ার বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়ে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন।

এই বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে পাকিস্তানের সর্বত্র নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুজব ছিল। কেউ বলেন, আমের ঝুড়িতে লুকানো ইম্প্রোভাইস ডিভাইসের দ্বারা এটা ধ্বংস করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, গিলগিট থেকে আসা একজন শিয়া বৈমানিক হঠাৎ করে ককপিটে টিয়ারগ্যাস বা অন্য কোনো গ্যাস ছাড়তে থাকায় বিমানের ক্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়লে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কেউ আবার বলছেন, এই বিমান ধ্বংসের পেছনে 'র'-এর হাত রয়েছে। আইএসআই'র সহযোগিতায় খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের দ্বারা ভারতের কানিষ্কা বিমান ধ্বংসের প্রতিশোধ হিসেবে এটা করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী এর তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। তদন্ত রিপোর্টে কী আছে তা কেবল পাকিস্তান আর্মি ও যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনই জানে। এই রিপোর্ট পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও দেখানো হয়নি। তবে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়, গিলগিট থেকে আসা শিয়া বৈমানিকের কারণেই এটা ঘটেছে।

এ দুর্ঘটনা এমন কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয় যার উত্তর আজো মেলেনি। জিয়ার সব সফরসঙ্গী ওই বিমানে করে গেলেন, কিন্তু আসলাম বেগ কেন অন্য বিমানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন? তিনি কি আগাম জানতেন যে, বিমানটি বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে? তিনি যখন আগুন ও ধোঁয়া দেখলেন তখন সাথে সাথে অবতরণ করে কেন উদ্ধার কাজ পরিচালনা করলেন না এবং সেটি তিনি এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকজনের ওপর ছেড়ে দিলেন কেন, যাদের এ কাজটি করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়?

বেনজির ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বরের নির্বাচনে জয়লাভ করে। সেনাবাহিনী ও আইএসআই প্রথমে বেনজির ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে দিতে চায়নি। তারা বেনজির ও তার সহযোগীদের 'র'-এর এজেন্ট বলে সন্দেহ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে তারা তাকে সরকার গঠন করতে দিতে রাজি হলেও তার ওপর ব্যাপক বিধিনিষেধ আরওপ করে।

'র'-এর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের রিপোর্টে বলা হয়, সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে বেনজির ভুট্টোর কোনো এক বৈঠকে লে. জেনারেল হামিদ গুলকে দৃঢ়তার সাথে বেনজির বলেই ফেলেছিলেন, 'আপনি ভারতের বিরুদ্ধে শিখ কার্ড নিয়ে খেলছেন। তাই তারাও আমাদের বিরুদ্ধে সিন্ধ কার্ড খেলতে শুরু করেছে। শিখ কার্ড খেলা বন্ধ করে পাকিস্তানে বসবাসকারী শিখদের ভারতের কাছে হস্তান্তর করুন। ভারতীয় পুলিশ তাদেরকে বিচারের জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে'। সেই একই সূত্র

মতে, লে. জেনারেল গুলের জবাব ছিল, 'ম্যাডাম, পাঞ্জাবকে অস্থিতিশীল রাখার অর্থ হচ্ছে বিনা খরচে পাকিস্তানের দুই ডিভিশন সৈন্য পালা। আপনি যদি শিখ কার্ড খেলা বন্ধ করতে বলেন, তাহলে আপনাকে নতুন করে দু'টি ডিভিশন সৃষ্টির অনুমোদন দিতে হবে'। তিনি তার যুক্তি অগ্রাহ্য করতে না পেরে চুপ থাকেন। গুল তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন, শিগগিরই সিন্ধুর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তাকে এ জন্য চিন্তিত হতে হবে না।

উল্লেখ্য, গুলকে আইএসআই প্রধান রাখতে বেনজিরকে বাধ্য করা হয়েছিল। জিয়ার আমলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটেছিল, যা বেনজির ভুট্টোর শাসন-আমল পর্যন্ত গড়ায়। সে সময় রাজিব গান্ধী ও জিয়া দু'জনেরই ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন জর্ডানের যুবরাজ হাসান বিন তালাল। হাসানের স্ত্রী ছিলেন পাকিস্তান বংশোদ্ভূত এবং তিনি জিয়াউল হককে জর্ডানভিত্তিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে আম্মানে নিয়োগ দানের সময় থেকেই চিনতেন। তিনি জিয়া ও রাজিব গান্ধীর সাথে পৃথকভাবে যোগাযোগ করেন এবং খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের প্রতি পাকিস্তানের সমর্থনের বিষয়ে ভারতের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের অগোচরে ও গোপনে আইএসআই এবং 'র' প্রধানের মধ্যে আলোচনার পরামর্শ দেন। তিনি প্রথম বৈঠকটির আয়োজন আম্মানে করার প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি হামিদ গুল ও তৎকালীন 'র' প্রধান এ কে ভার্মার মধ্যে আম্মানে বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি তাদেরকে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারা দু'জনে দুটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। প্রথম বৈঠকটি আম্মানে এবং দ্বিতীয়টি জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বৈঠকের পরিবেশ ছিল ইতিবাচক। বৈঠকের এজেন্ডা কেবল খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের প্রতি আইএসআই'র সমর্থন বন্ধ ও পাকিস্তানে আশ্রয় দেয়া সন্ত্রাসীদের ভারতের কাছে হস্তান্তরই ছিল না, সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে যে সমস্যা চলে আসছে সেটাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচনায় সিয়াচেন প্রশ্নে অগ্রগতি হয়। কেননা পাকিস্তান আর্মি সেখান থেকে ভারতীয় সৈন্যদের অপসারণ দেখতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে লে. জেনারেল গুল সেই আগের অবস্থানেই অনড় থাকেন যে, ভারত যেসব শিখ সন্ত্রাসীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা পাকিস্তানে নেই। তবে একটি অতি সতর্ক ব্যবস্থাপনায় তিনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা চারজন শিখকে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই চারজন শিখ সৈন্য জম্মু ও কাশ্মীরে দায়িত্ব পালনকালে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি এটি এমনভাবে করেছিলেন যাতে প্রতীয়মান না হয় যে, আইএসআই তাদেরকে 'র'-এর কাছে হস্তান্তর করছে। 'র'-এই পন্থার ব্যাপারে সম্মত হয় এবং জেনারেল গুলকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন, তারা তার মুখ রক্ষা করবেন এবং কোনোভাবেই তা সংবাদ মাধ্যমকে জানতে দেয়া হবে না।

জিয়ার মৃত্যু ও নির্বাচনের পর সেনাবাহিনী ও আইএসআই তিনটি শর্তে বেনজিরের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হয়। শর্ত তিনটি হচ্ছে : প্রথমত, জেনারেল মির্জা আসলাম বেগ সেনাবাহিনীর প্রধান থেকে যাবেন, দ্বিতীয়ত, লে.

জেনারেল গুল, যিনি ১৯৮৭ সাল থেকে আইএসআই প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং তৃতীয়ত, ড. এ কিউ খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা সরাসরি সেনাপ্রধানের অধীনে কাজ করবে। তারা বেনজিরের কাছে কোনো রিপোর্ট দেবে না। যুবরাজ হাসান ও লে. জেনারেল গুল বেনজিরকে অবহিত রাখেন, 'র'-এর সাথে একটি সংলাপ চলছে। বেনজির 'এ সংলাপ অব্যাহত থাকুক' বলে তার সম্মতি দেন।

১৯৮৯ সালের মার্চে বেনজিরের সম্মতি ছাড়াই আফগান মুজাহেদীন, ওসামা বিন লাদেনের আরব অনুসারী ও পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের নিয়ে নজিবুল্লাহর আফগান বাহিনীর বিরুদ্ধে জালালাবাদে একটি সেনা ফাঁড়িতে অভিযান পরিচালনা করেন লে. জেনারেল গুল। তারা কিছু দিনের জন্য জালালাবাদ ঘিরে রাখতে সক্ষম হন। প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন যে তারা জালালাবাদ শেষ পর্যন্ত দখল করে ফেলবেন এবং এতে করে নজিবুল্লাহর শাসনের অবসান ঘটবে। কিন্তু ব্যাপারটি সেভাবে ঘটেনি। নজিবুল্লাহর বাহিনী বহু সৈন্যের হতাহতের মাধ্যমে সে অভিযান প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। গুলের এই চরম ব্যর্থতার সুযোগকে কাজে লাগান বেনজির। তিনি ১৯৮৯ সালের জুনে হামিদ গুলকে অপসারণ করে মেজর জেনারেল শামসুর রহমান কাল্লুকে আইএসআই প্রধান করেন। কাল্লু বেনজিরের পিতার খুব ঘনিষ্ঠ এবং ভুট্টো পরিবারের প্রতি বেশ অনুগত ছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই, গুলের অপসারণের বিরোধিতা করেননি আসলাম বেগ। কয়েক বছর পর সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর আসলাম বেগ দাবি করেন, গুল জালালাবাদে বিপর্যয়কারী অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে তার সাথে কথা বলেননি। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে আইএসআই প্রধান করার বিরোধিতা করেছিলেন বেগ। কিন্তু তারপরও বেনজির তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর কাল্লু আইএসআই'র রাজনৈতিক শাখা তুলে দেন। ওই সময় রাজনৈতিক শাখার প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ইমতিয়াজ। এই শাখার কাজ ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বেসামরিক আমলাদের ওপর নজর রাখার পাশাপাশি খালিস্তানি আন্দোলনকে সহায়তা দেয়া। লে. জেনারেল হামিদ গুলের পরামর্শে পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ইমতিয়াজকে পাঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দেন। সেখানে তার কাজ ছিল খালিস্তানি আন্দোলনকে সহায়তা দানে আইএসআই'র কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। লে. জেনারেল হামিদ গুল সব খালিস্তানি নেতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, এখন থেকে তারা কোনো সাহায্যের জন্য কাল্লুর সাথে যোগাযোগ না করে পাঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ইমতিয়াজের সাথে যেন যোগাযোগ করেন।

লে. জেনারেল গুল অবশ্য নওয়াজ শরিফ ও গণমাধ্যমের কিছু লোকের কাছে এই খবর ফাঁস করে দেন যে, পাকিস্তানে পালিয়ে আসা চারজন শিখ সৈন্যকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও রাজিব গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ বেনজির ভুট্টো এটা করেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বে তৎকালীন মুসলিম লীগ বেনজিরের বিরুদ্ধে

জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলে। লে. জে. হামিদ গুল বেনজিরবিরোধীদের এ কথাও বলেন, কাল্লু তার নির্দেশে খালিস্তানি নেতাদের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত আইএসআই'র কিছু ফাইল র-এর কাছে হস্তান্তর করেছে।

বেনজিরকে 'র'-এর এজেন্ট বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং বলা হয়, তিনি খালিস্তানিদের আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এসব অভিযোগে বিব্রত বেনজির ভার্মার সাথে লে. জেনারেল গুলের বৈঠক সংক্রান্ত ফাইলপত্র হাজির করতে কাল্লুকে নির্দেশ দেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বেনজিরের কাছে রিপোর্ট দেন, এ বিষয়ে আইএসআই'র সদর দফতরে কোনো কাগজপত্র নেই।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান জেনারেল আসলাম বেগ ও লে. জেনারেল হামিদ গুলের পীড়াপীড়িতে ১৯৯০ সালের ৬ আগস্ট বেনজির ভুট্টোকে বরখাস্ত করেন। রাজিব গান্ধীর সাথে বেনজিরের ঘনিষ্ঠতা 'র'-এর সাথে তার কথিত যোগসাজশ এবং খালিস্তানি আন্দোলনের সাথে তার কথিত বিশ্বাসঘাতকতার গোপন অভিযোগকে গোলাম ইসহাক খান তাকে বরখাস্তের কাজে ব্যবহার করেন।

খালিস্তানিদের সাহায্য করা বেনজির সম্পূর্ণ বন্ধ করে না দিলেও তাদের সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করার পাশাপাশি কাল্লুকে জম্মু ও কাশ্মীরের জিহাদি সংগঠনগুলোকে আর্থিক, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। এর আগে তিনি কাশ্মীর সংক্রান্ত পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখেন। তিনি কাল্লুকে আফগান সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে তাদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করতে বলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু জিহাদিকে মুজাহিদদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার জন্য আইএসআই আফগানিস্তানে নিয়ে যায়। নজিবুল্লাহ আফগান ভূখণ্ডে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ শিবিরে কাশ্মীরিদের পরিদর্শনের বিষয়টি অবহিত করার জন্য বার্তা পাঠাতে থাকেন। বেনজিরের প্রতি রাজিব গান্ধীর শতভাগ আস্থার কারণে নজিবুল্লার এই ঘুম ভাঙানোর ডাক তেমন গুরুত্ব পায়নি। কেননা বেনজির পাঞ্জাবের ব্যাপারে ভারতের জন্য সহায়ক হতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এমনটা ধারণা করা হয়েছিল, বেনজির জম্মু ও কাশ্মীরে আমাদের জন্য কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবেন না। কিন্তু তিনি তাই করেছিলেন প্রতিশোধমূলক পন্থায়। ১৯৯০ সালের আগস্টের আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কাশ্মীরে আমাদের জন্য সমস্যা দেখা দেয়। অটল বিহারি বাজপেয়িও ঠিক যেভাবে লাহোরে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নওয়াজ শরিফের সাথে বৈঠকের পর তাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তেমনিভাবে রাজিব গান্ধীও বেনজিরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন। নওয়াজ শরিফের সাথে বৈঠকের পরই কারগিলে আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়। কিন্তু নওয়াজ শরিফকে এজন্য মূল্য দিতে হয়নি। কেননা (ইন্দিরা) কংগ্রেস ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে নির্বাচনে হেরে যায় এবং বাজপেয়ির স্থলাভিষিক্ত হন ভিপি সিং। বেনজিরকে বিশ্বাস করে রাজিব গান্ধী যে ভুল করেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে তার মাশুল দিতে হয় ভিপি সিং ও তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে সহিংসতার ইন্ধন জোগানোর চেষ্টা তাকে বরখাস্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

বেনজিরকে বরখাস্তের পর গোলাম ইসহাক খান জেনারেল আসলাম বেগের পরামর্শে সিন্ধু থেকে পিপিপি'র নেতা গোলাম মোস্তফা জাতোইকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভারতবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর (জেআই) সহায়তায় নওয়াজ শরিফের মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন হয় এবং নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি খালিস্তানিদের সহায়তা সংক্রান্ত কাজ আবার পাঞ্জাব স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আইএসআই'র কাছে হস্তান্তর করেন এবং ইমতিয়াজকে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টর নিয়োগ করেন। 'র'-এর নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, পাকিস্তানের হাবিব ব্যাংক, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা এবং ওসামা বিন লাদেন পিএমএল ও জেআই'র নির্বাচনী তহবিলে উদারহস্তে দান করেছিল।

এসব ঘটনা যখন ঘটছিল তখন পাঞ্জাবের পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছিল এবং এ পরিস্থিতি ক্রমে আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছিল। ১৯৮৮ সালের মে মাসে একদল খালিস্তানি স্বর্ণমন্দির দখল করে নেয়। রাজিব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করেন। ১৯৮৪ সালে অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে তার ঘনিষ্ঠজনদের সাথে পরামর্শ করেন। রাজিব গান্ধী কেএসপি গিলকে ডেকে পাঠান। গিল মাত্র তিন সপ্তাহ আগে পাঞ্জাব পুলিশের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গিল তাকে স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর পরিবর্তে তিনি স্বর্ণমন্দির পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন দিয়ে ঘিরে রাখার এবং সেখান থেকে দখলকারীদের ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর বের করে আনার পরামর্শ দেন। রাজিব এ পরামর্শ খুবই পছন্দ করেন এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন তাকে। এই অভিযান 'অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার' নামে অভিহিত হয়। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে গিলের মাথা থেকেই আসে। তার পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত সহজ। পাঞ্জাব পুলিশ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ও অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন মন্দিরটি ঘিরে রাখবেন। তারা কাউকে ভেতরে যেতে কিংবা ভেতর থেকে বেরোতে দেবে না, কোনো খাদ্যদ্রব্য ভেতরে নিতে দেয়া হবে না, নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র থাকবে না, থাকবে ছোট ছোট অস্ত্র যার সাহায্যে ভেতর থেকে কেউ নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আসছে বলে মনে হলেই তাকে গুলি করবে, নিরাপত্তা কর্মীদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে যাতে ভেতর থেকে সন্ত্রাসীরা ক্লান্ত হয়ে নিজেরাই বেরিয়ে আসে এবং সমগ্র পরিকল্পনাটি মিডিয়ার লোকজনের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন করা হবে।

তার এই পরিকল্পনা চমৎকার সুফল বয়ে আনে। অভিযান শুরুর সাত দিন পর (১১ মে থেকে ১৮ মে) সন্ত্রাসীরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। গণমাধ্যমের কর্মীরা পুলিশের সাথে স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করে স্বচক্ষে দেখতে পান, সন্ত্রাসীরা স্বর্ণমন্দিরকে কিভাবে অপব্যবহার করেছে। তারা মন্দিরের বহু জায়গার ক্ষতিসাধন করেছে এবং গোটা মন্দির থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। সংবাদ মাধ্যমগুলো তাদের সংবাদদাতাদের

সরাসরি দেখা বিষয়গুলো বিস্তারিত পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরে। এসব খবর পড়ে পাঞ্জাবের শিখরা খালিস্তানিদের ব্যাপারে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯৮৪ সালে অপারেশন ব্লু স্টারের পর পাঞ্জাবের যেসব লোক খালিস্তানিদের সমর্থন না করলেও তাদের প্রতি সহানুভূতি ধরে রেখেছিলেন তারা অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারের পর তাদের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এটা ছিল কেএমপি গিল ও তদানীন্তন এনএসজি প্রধান বেদ মারওয়াহর পরিচালিত একটি অত্যন্ত সফল অভিযান। এই অভিযানের পর থেকে খালিস্তানিদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ভিপি সিংয়ের আমলে সামান্য বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। ভিপি সিং সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য খালিস্তানিদের প্রতি একটু নমনীয় নীতি অবলম্বন করেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য গিলকে পাঞ্জাব থেকে বদলি করে দেন।

নরসীমা রাওয়ের শাসনামলে খালিস্তানিদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া আবার গতি পায়। ১৯৯১ সালের ২১ জুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর নরসীমা রাও গিলকে আবার পাঞ্জাবে নিয়ে এসে রাজ্য পুলিশের ডিজি বানিয়ে দেন। তিনি রাজ্যসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন এবং ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের মে মাস থেকেই পাঞ্জাব রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে ছিল বলে এতকাল সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। গিল ও পাঞ্জাব পুলিশ সন্ত্রাসীরা যাতে নির্বাচন বানচাল করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বেয়ান্ত সিংয়ের অধীনে একটি নির্বাচিত সরকার পাঞ্জাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

১৯৯২ সাল ছিল যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের বছর। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্তমান প্রেসিডেন্টের পিতা জর্জ বুশের প্রশাসনকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। বুশ প্রশাসন তখনও পর্যন্ত পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা হিসেবে ঘোষণা করতে চাচ্ছিল না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে ইসলামাবাদের নাক গলানো বন্ধের ব্যাপারে চাপ দিতেও প্রস্তুত ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরকে বিতর্কিত একটি ভূখণ্ড হিসেবে দেখত। কিন্তু বুশ প্রশাসন খালিস্তানিদের প্রতি আইএসআই'র সমর্থনের ব্যাপারে পাকিস্তানকে চাপ দিতে শুরু করে। ১৯৯০ সালে বেনজিরের স্থলাভিষিক্ত নওয়াজ শরিফ আইএসআইকে খালিস্তানিদের প্রতি সমর্থন হ্রাসের নির্দেশ দেন। আইএসআই লাল সিং, তালিন্দর সিং পারমার দ্বিতীয় প্যান্থিক কমিটির প্রধান সোহান সিংকে পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দেয়। লাল সিং ১৯৯২ সালে করাচি থেকে বিমানযোগে মুম্বাই চলে যান এবং গুজরাট যাওয়ার পথে গ্রেফতার হন। তালিন্দর সিং পারমার, যিনি ১৯৯২ সালের অক্টোবরে সিঙ্গাপুর ও চেন্নাই হয়ে পাঞ্জাব পৌঁছেছিলেন, পাঞ্জাব পুলিশের সাথে এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। চুপিচুপি পাঞ্জাব ফিরে আসা সোহান সিং গ্রেফতার হন।

১৯৯২ সালের ১৯ আগস্ট ভারতীয় বাবর খালসার প্রধান সুখদেব সিং বাবর পাঞ্জাবে এক এনকাউন্টারে নিহত হন। পাঞ্জাব পুলিশের সাথে তার যে বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা সাধারণ লোকজন প্রত্যক্ষ করে। বন্দুকযুদ্ধের পর সাধারণ লোকজন দেখতে পান, সুখদেব যে গাড়িতে করে এসেছিলেন তাতে তার একজন

মহিলা সঙ্গী ছিল এবং গাড়িটি ছিল বলতে গেলে একটি ছোটখাটো বার। এই দৃশ্য দেখে লোকজন ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কেননা এই লোকটিই লোকজনের ওপর কঠোর আচরণবিধি জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতেন। এ ঘটনায়ও সাধারণ মানুষের মন থেকে খালিস্তানিদের জন্য সহানুভূতি দূর হয়ে যায়। সুখদেব সিংয়ের অনুসারীরা তাদের নেতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে পাঞ্জাব পুলিশের ওপর নির্মম আক্রমণ চালায়। তারা পুলিশের জুনিয়র কর্মকর্তাদের বহু আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করে। যেসব লোকজন স্পেশাল পুলিশ অফিসারের ক্যাপাসিটিতে স্বেচ্ছায় পুলিশকে সহায়তা দিয়েছিলেন সে ধরনের বহু সাধারণ মানুষকেও তারা গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু বেশ ক'দিন ধরে চলা তাদের এই মুহুর্মুহু হত্যাকাণ্ড খালিস্তানিদের সন্ত্রাসের অবসান ঘটাতে পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্কল্পকে দুর্বল করতে পারেনি।

গিল ও পাঞ্জাব পুলিশের অব্যাহত চাপের মুখে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার আগে তারা অবশ্য তাদের শেষ এবং উল্লেখযোগ্য অপারেশনটি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৫ সালের ৩১ আগস্ট পরিচালিত ওই অভিযানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বেয়ান্ত সিং দিনের শেষে কাজ সেরে চণ্ডিগড়ের অফিস ত্যাগের সময় নিহত হন। তারপর অবশ্য তারা তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তবে তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, তারা চিরতরে খতম হয়ে গেছে। পাকিস্তানের আইএসআই যত দিন পর্যন্ত ছিঁটেফুটো যেসব খালিস্তানি সন্ত্রাসী রয়ে গেছে তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে থাকবে তত দিন তাদের তৎপরতা বন্ধ হয়েছে বলা যাবে না। পাকিস্তান বরাবরই বলে আসছে, তাদের ভূখণ্ডে কোনো খালিস্তানি নেই। ২০০৬ সালের শুরু থেকে যুক্তরাজ্যে খালিস্তানি আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের অপারেশনের সাফল্যের কারণগুলো কী ছিল? প্রথমত, পাঞ্জাব পুলিশ ও অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর সাহসী লড়াই। দ্বিতীয়ত, গিলের দুর্দান্ত নেতৃত্ব। গিল সম্মুখভাগ থেকে নেতৃত্ব দেন এবং তিনি কর্মকর্তাদের একটি দল গড়ে তুলেছিলেন, যাদের মধ্যে অনেক শিখও ছিলেন। যেটি সন্ত্রাসীদের নৃশংসতা উপেক্ষা করেও তাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, পাঞ্জাবে বেয়ান্ত সিং এবং দিল্লিতে রাজিব গান্ধী, নরসিমা রাও ও রাজেস পাইলটের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তারা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গিল ও পাঞ্জাব পুলিশকে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়। চতুর্থত, আইবি ও 'র'-এর মানব সূত্রগুলো থেকে সরবরাহকৃত ইনপুটগুলো এবং তাদের টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনের চমৎকার কর্মকাণ্ড। পঞ্চমত, যুক্তরাজ্য ও কানাডার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সহযোগিতা এবং ষষ্ঠত, শিখ সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধ ও উদার মানসিকতা। এর ফলেই তারা অপারেশন ব্লু স্টার ও ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৃশংসতাকে ভুলে গিয়ে খালিস্তানিদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনে সক্ষম হয়।

সন্ত্রাস দমনের এটা ছিল একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানুষ আশা করে যে, এই নাটকের কুশীলবরা যেহেতু এখনো জীবিত আছেন তাই হায়দরাবাদের জাতীয় পুলিশ একাডেমি তাদের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টিকে নথিভুক্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য দৃষ্টান্ত ও নির্দেশিকা হিসেবে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা নেবে। পাঞ্জাবে সহিংসতা দমনের পরিপ্রেক্ষিতে সে রাজ্যে এমন কিছু বেসরকারি সংস্থার আবির্ভাব ঘটে, যাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সন্দেহ করার মতো কারণ ছিল। এসব এনজিও সন্ত্রাসীদের সাথে সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যাওয়া পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে তাদেরকে বিভিন্ন আদালতে বিচারের সম্মুখীন করার মাধ্যমে হয়রানি করে। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা না থাকলে আজ পাঞ্জাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে নাও আসতে পারত; তাদের পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা জনগণ কেউ-ই দাঁড়ায়নি। এ অবস্থায় একজন পুলিশ অফিসার তো মনের দুঃখে আত্মহত্যাই করলেন।

পরিচ্ছেদ : চৌদ্দ

জেনেভা এবং বফোর্স

১৯৮৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮৮ সালের মে পর্যন্ত আমি জেনেভাভিত্তিক জাতিসঙ্ঘের সংস্থাগুলোর জন্য ভারতের স্থায়ী মিশনের (পিএসআই) কাউন্সিলর হিসেবে জেনেভায় নিযুক্ত ছিলাম। আমি ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন, ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ), কমিশন ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ওয়ার্ল্ড মেটেরিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রসের (আইসিআরসি) সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ করতাম। এর পাশাপাশি আমি জেনেভায় ভারতীয় কনসাল জেনারেলের (সিজি) দায়িত্বেও অধিষ্ঠিত ছিলাম।

পিএসআইতে কাউন্সিলর হিসেবে আমি জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের সংস্থাগুলোর জন্য স্থায়ী প্রতিনিধির (পিআর) অধীনে এবং সিজি হিসেবে আমি সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হুকুম তামিল করতাম। আমার জন্য অহমিকাবোধ এবং এখতিয়ারগত দ্বন্দ্ব প্রায়ই কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করত। ১৯৮৫ সালের জুনে জেনেভায় রাজিব গান্ধীর সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দান ও আইসিআরসি'র সদর দফতর পরিদর্শন করা। এর সমুদয় দায়দায়িত্ব ছিল পিআর-এর। ফলে আমাকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

ভারতের প্রেসিডেন্ট আর ভেঙ্কটরমন ভারতের একটি উৎসব উদ্বোধনের জন্য ১৯৮৭ সালে জেনেভা সফর করেছিলেন। উদ্বোধনের পর তিনি ভারত ফেরার আগে বার্ন সফর করেন। এটা ছিল সম্পূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সফর এবং জাতিসঙ্ঘের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ তার ছিল না। বার্নে নিযুক্ত তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জানান, তিনি জেনেভা ও বার্ন সফরের যাবতীয় কাজ করবেন। কিন্তু পিআর জেনেভা সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ তাকে করতে দেননি। তিনি বলেন, যেহেতু তিনি জেনেভায় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি সেহেতু সফরের জেনেভা পার্ট তিনিই দেখাশোনা করবেন। এই দু'জনের মাঝে পড়ে আমাকে অনেক উত্তেজনাকর মুহূর্ত পার করতে হয়। পিআর রাষ্ট্রদূত আয়োজিত সমন্বয় সভায় যোগদানের জন্য আমাকে বার্ন যেতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, আমি জেনেভায়ও প্রেসিডেন্টের সফরসংক্রান্ত বিষয়ে

কেবল তার হুকুম তামিল করব। যেভাবেই হোক আমি বিষয়টি ম্যানেজ করি এবং প্রেসিডেন্টের সফরও ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হয়।

প্রেসিডেন্টের সফর এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় যখন সুইডেনের বফোর্স কোম্পানির সাথে ভারত সরকারের চুক্তি নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে ছিল। সুইডেনের একটি বেসরকারি সংগঠন এই মর্মে অভিযোগ করে যে, কোম্পানিটি রাজিব গান্ধী ও তার পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কাউকে কাউকে কমিশন দিয়েছিল। এমনও অভিযোগ করা হয়েছিল, অন্যান্যের মধ্যে হিন্দুজা ভাইয়েরাও এই কমিশনের ভাগ পেয়েছেন। হিন্দুজা হচ্ছে একটি প্রখ্যাত সিন্ধি ব্যবসায়ী পরিবার। হিন্দুজা পরিবারের ব্যবসার মূল কেন্দ্র ছিল লন্ডনে এবং বড় ভাই শ্রীচান্দ হিন্দুজা সেটার দেখাশোনা করতেন। জেনেভায় তাদের একটা বিশাল অফিস ছিল। সেটার দেখাশোনা করতেন শ্রীচান্দ হিন্দুজার ভাই প্রকাশ হিন্দুজা। শ্রীচান্দ প্রায়শ জেনেভা সফর করতেন।

আমি প্রকাশকে ভালোভাবেই চিনতাম। সত্যি কথা বলতে কী, পরিবারটির বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্ত্বেও আমি প্রকাশ ও শ্রীচান্দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও তাদেরকে ভালো লাগার মতো কিছু দেখতে পেলাম। তাদের গোটা পরিবারেরই বৈদেশিক ব্যবসা শুরুর আদি স্থান ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকজনের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাদেরকে যখনই বলা হতো তখনই তারা ভারত সরকারকে কোনো বৈধ সহযোগিতা দিতে দ্বিধা করত না। বহু বছর ধরে তারা বিদেশে বসবাস করলেও তারা এখনো মনেপ্রাণে ভারতীয়। তাদের বিরুদ্ধে কমিশন গ্রহণের যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা সত্যি হলেও এর দ্বারা তাদের দেশাত্মবোধের কোনো ঘাটতি হয়েছে বলে মনে করার কিছু নেই। লোকে আমাকে ভুল বুঝতে পারে কিংবা আমার নিন্দা করতে পারে এ ধরনের ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি তাদের ব্যাপারে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

জেনেভায় পিআর এবং রাষ্ট্রদূত যাদের আমন্ত্রণ জানাতেন তাদের তালিকায় হিন্দুজা ভাইয়েরা, বিশেষত প্রকাশের নাম থাকত এবং ভারত থেকে আসা কোনো বিশেষ অতিথির সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা বা নৈশভোজে তাকে অনিবার্যভাবেই আমন্ত্রণ জানানো হতো। প্রেসিডেন্টের সফরের কয়েক সপ্তাহ আগে রাজিব গান্ধীর মন্ত্রিসভার সংসদবিষয়ক মন্ত্রী এইচ কে আই ভগত আইপিইউ সম্মেলনে যোগদানের জন্য জেনেভায় আসেন। আমি তৎকালীন পিআর (পরলোকগত) আলফ্রেড গঞ্জালেসের নির্দেশনায় তার সফরের ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন করেছিলাম। পিআর প্রকাশকে ভগতের সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন এবং বার্নে সুইস ফেডারেল কেবিনেট ও জেনেভায় ক্যান্টনাল সরকারের সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তাতে আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ জানান। প্রকাশ সানন্দে এ অনুরোধ গ্রহণ করে অতিথিদের আমন্ত্রণপত্র পাঠান। পত্র পাওয়া সবাই তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

প্রকাশকে নৈশভোজের আয়োজন করতে বলার আগে আমি বফোর্স সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে পিআর-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, ভগতের জন্য প্রকাশকে নৈশভোজের আয়োজন করতে বলাটা সমীচীন হবে না। আমি তাকে এই পরামর্শ

দিলাম যে, আপনি ভগতকে জিজ্ঞেস করুন প্রকাশ তার জন্য নৈশভোজের আয়োজন করলে তাতে যোগদানে ভগতের কোনো আপত্তি আছে কি না। পিআর সাথে সাথেই এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'রমন, আমি রাজনীতিকদের আপনার চেয়ে ভালো চিনি। আমি আমাদের রাজনীতিকদের বিদেশ সফরের বিষয়টি আপনার চেয়েও বেশি দেখাশোনা করেছি। তারা সবাই দুর্নীতিবাজ এবং এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নেই। তারা সবাই ব্যবসায়ীদের দেয়া সুযোগ-সুবিধায় গা ভাসিয়ে দিতে ভালোবাসেন। আমি ভগতকে চিনি। তিনি সানন্দে প্রকাশের বাড়ি যাবেন।' আমি চুপ রইলাম। গঞ্জালেস ও আমি ভগতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাই এবং তাকে সেখান থেকে তার থাকার জন্য নির্ধারিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে যাই। গঞ্জালেস তার জন্য স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবারের আয়োজন করেন এবং এতে আইপিইউ'র সিনিয়র কর্মকর্তারা যোগদান করেন। লাঞ্চের পর পিআর তাকে লুসানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য নিয়ে গেলেন। পিআর ও ভগত একই গাড়িতে আরওহণ করেন। আমি ভিন্ন গাড়িতে করে তাদের অনুসরণ করি। আমরা যখন লুসানের দিকে অর্ধেক পথ গিয়েছি তখন পিআর-এর গাড়ি থেমে যায়। আমি আমার গাড়ি থেকে নেমে এলাম। তিনি বললেন, "রমন, তোমার কথাই ঠিক। প্রকাশের দেয়া নৈশভোজে যোগ দিতে বলতেই ভগত ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন, আমার এই প্রস্তাব গ্রহণই ঠিক হয়নি। তিনি এতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি জেনেভায় ফিরে গিয়ে প্রকাশকে বলো মন্ত্রীর শরীরটা ভালো নয়। তাই তিনি আসতে পারবেন না। তাকে বলো, আমিও আসতে পারব না। কেন না আমাকে মন্ত্রীর দেখাশোনা করতে হবে।"

ওই সময় জেনেভায় আইএলও এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন চলছিল। এসব সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারত থেকে আধা ডজন সিনিয়র কর্মকর্তা জেনেভায় এসেছেন। প্রকাশ তাদের সবাইকে এবং স্থায়ী মিশনের সব কূটনৈতিক কর্মকর্তাকে দাওয়াত করেন। গঞ্জালেস আমাকে বলেন, তাদের সবাইকে টেলিফোন করে বলে দেয়ার জন্য যে মন্ত্রী অসুস্থ, তিনি নৈশভোজে যোগ দিতে পারবেন না। আপনারা ইচ্ছে করলে তাতে যোগ দিতেও পারেন আবার না-ও পারেন। আমি তাই করলাম। দিল্লি থেকে আসা সব সিনিয়র কর্মকর্তা এবং স্থায়ী মিশনের সকল কর্মকর্তার অনুমান করতে কষ্ট হলো না যে, মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের পেছনে বফোর্স বিরোধ কাজ করেছে। তারা সবাই প্রকাশের অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, অসুবিধার কারণে তারা এই নৈশভোজে অংশ নিতে পারছেন না।

এটা জানতে পেরে আমি লুসানে পিআর-এর সাথে যোগাযোগ করে বললাম এটা প্রকাশকে অপদস্থ করার শামিল। আমি পিআরকে বললাম, 'প্রকাশ নিজ থেকে এই ডিনারের আয়োজন করেনি। আমি তাকে এটা করতে বলেছিলাম এবং তিনি মনে করেছিলেন, প্রকাশ যদি ডিনারের আয়োজন করে তাহলে ফেডারেল সরকারের সিনিয়র নেতারা এতে অংশগ্রহণ করবেন। তারা সবাই এতে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন এ কারণে যে, একজন সিনিয়র মন্ত্রীর সম্মানে এই ভোজের আয়োজন করা হচ্ছে। তারা যদি দেখেন, ভারতীয় মন্ত্রী, পিআর কিংবা ভারতীয় কর্মকর্তাদের

কেউই এতে যোগ দিচ্ছেন না তাহলে তারা নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবতে শুরু করবেন। সেখানে নানা বিষয়ে অযথা কানাঘুষা হবে।' আপনি দিল্লি থেকে আসা এবং স্থায়ী মিশনের সব কর্মকর্তাকে বলেছিলেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নৈশভোজ এবং এতে তাদের যোগদান করা উচিত। আমি তাই করলাম। দিল্লি থেকে আসা কিছু এবং স্থায়ী মিশনের কিছু কর্মকর্তা এতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে বেশিরভাগই এতে যোগ দেননি। এতে কতই না বিশৃঙ্খল একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

আরও একজন ভিআইপি জেনেভা সফর করেন। তিনি হচ্ছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ডা. ফারুক আবদুল্লাহ। আমি লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশন থেকে বার্তা পাই যে, ডা. আবদুল্লাহ ও তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা ২৪ ঘণ্টার জন্য জেনেভা সফর করবেন। বার্তায় বলা হয়নি তিনি কী কারণে জেনেভায় আসছেন। কিংবা এটা কি সরকারি সফর নাকি ব্যক্তিগত সফর, কিংবা তাদের জন্য কোনো হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে কি না। আমি লন্ডনে ভারতীয় মিশনের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা জবাবে বললেন, আমাদেরকে আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। তাই আমরা আপনাকে বলেছি। মুখ্যমন্ত্রীর স্টাফ অফিসার আমাদেরকে হোটেল বুক করার ব্যাপারে কিছু বলেননি।

কনসাল জেনারেল হিসেবে আমি তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বিমানবন্দরে যাই এবং সাধারণত ভিআইপিরা যেখান দিয়ে বের হন সেখানে অপেক্ষা করতে থাকি। তিনি ও তার স্টাফ অফিসাররা আসেননি। আমি এয়ারপোর্ট পুলিশের কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চাই। নথিপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা আমাকে জানান, হিন্দুজা পরিবারের স্টাফদের মধ্যে একজন কর্মকর্তা তাকে বিমানবন্দরের টারমাক থেকে সরাসরি হোটেলে নিয়ে গেছেন। তারপর আমি হোটেলে গিয়ে তার সাথে দেখা করি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডায়মন্ড ব্যবসায়ী ডা. ফারুক আবদুল্লাহর সম্মানে একটি স্থানীয় হোটেলে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন এবং এতে স্থানীয় ভারতীয়দের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। আমিও তাতে যোগ দিয়েছিলাম। এটা ছিল এক অনানুষ্ঠানিক ভোজ অনুষ্ঠান। আলোচনাকালে ভারতের পরিস্থিতি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভূমিকা নিয়ে কথা হয়। ডা. ফারুক আবদুল্লাহ কড়া ভাষায় 'র'-এর সমালোচনা করতে থাকেন। ডা. ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, 'কুচ নাহি করতা হায়। সিক্রেট সার্ভিস পয়সা খাতা হায়।' তিনি জানতেন না আমি 'র'-এর লোক। আমি কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করেই শুনে থাকলাম।

ভোজ সভার আয়োজক এতে বিব্রত বোধ করেন। তিনি একটি কাগজের ওপর কিছু একটা লিখে সেটা ফারুক আবদুল্লাহর দিকে ঠেলে দিলেন। তিনি নিশ্চয়ই লিখে ছিলেন, আমি 'র'-এর লোক। আবদুল্লাহ তাতে সামান্যও বিব্রতবোধ করেননি। তিনি বললেন, 'রমন সাহেব, আপনি বুঝি 'র'-এর লোক? কাও ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। আপনার সংগঠন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছিল। সে কাজ করার সময় আবার এসেছে। অন্যথায় তারা পাঞ্জাবে হস্তক্ষেপ

করতেই থাকবে।' আমি জবাবে বললাম, 'আমি আমার সদর দফতরকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানিয়ে দেবো।'

ওই দিন রাতে হিন্দুজারা তাদের বাসায় তাকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান। তিনি যখন তার স্টাফ অফিসারের সাথে এই নিমন্ত্রণের বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন তখন তার স্টাফ অফিসার জানান, হিন্দুজারা তাকে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করেছেন ভারতে এটা জানাজানি হলে একটা বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। আবদল্লাহ জবাব দিলেন, 'তাতে কী হয়েছে? আমি নিজেই ভারত সরকারকে জানাব যে, আমি হিন্দুজার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছি। তারা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। বফোর্স চুক্তি নিয়ে কী ঘটেছে সেটার জন্য আমি হঠাৎ করে তো তাদের সাথে এতকালের সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারি না।'

ড. জে এম তেজা জেনেভায় পিআর হিসেবে গঞ্জালেসের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি জেনেভায় প্রেসিডেন্টের সম্মানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন। তিনি অন্যান্যের মধ্যে হিন্দুজাকেও আমন্ত্রণ জানানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। আমি ইতঃপূর্বে ভগতকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটার কথা তাকে জানালাম এবং তাকে এই পরামর্শ দিলাম যে, হিন্দুজাকে আমন্ত্রণ জানানোর আগে প্রেসিডেন্টের দফতরের সাথে কথা বলা উচিত। তিনি বার্তা পাঠালেন। ত্বরিত জবাব এলো, আমন্ত্রণ জানানো যাবে না।

পর দিন প্রকাশ আমাকে রিং করে বললেন, প্রেসিডেন্টের কার্যালয় তাকে বলেছে তিনি যেন স্থানীয় একজন কর্ণ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে প্রেসিডেন্টকে চেকআপ করানোর ব্যবস্থা করেন। কেননা, প্রেসিডেন্ট তার হিয়ারিং ডিভাইস বদলাতে চান। প্রকাশ আমাকে অনুরোধ করেছেন যাতে আমি এ জন্য প্রেসিডেন্টের প্রোগ্রামে একটু ফাঁক রাখি। আমি তৎক্ষণাৎ প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে বার্তা পাঠিয়ে জানতে চাই প্রকাশকে প্রেসিডেন্টের চেকআপের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে কি না। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের প্রোগ্রামের কথা অস্বীকার করে বলে যে, এ ধরনের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই। আমি ভালোভাবে প্রকাশকে বিষয়টি জানিয়ে দেই। জেনেভায় ইন্ডিয়া ফেস্টিভাল উদ্বোধন করে প্রেসিডেন্ট বার্ন চলে যান। সেখান থেকে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। পরে আমি জানতে পারি, কর্ণ বিশেষজ্ঞ বার্ন গিয়ে সেখানে প্রেসিডেন্টকে চেকআপ করেন। প্রকাশ যখন আমাকে বললেন, প্রেসিডেন্টের অফিস তাকে চেকআপের ব্যবস্থা করতে বলেছে তখন প্রেসিডেন্টের কার্যালয় দৃশ্যত বিব্রতবোধ করে। ফলে তারা জেনেভার পরিবর্তে কাজটি বার্ন-এ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা করা হয় বার্নে ভারতীয় দূতাবাসের অগোচরে।

বফোর্স কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুজাদের নাম এসে যাওয়ায় সফররত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকলেও সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) সিনিয়র কর্মকর্তাদের জেনেভা সফরকালে হিন্দুজাদের সাথে মেলামেশায় অনীহা দেখিনি। বফোর্স কেলেঙ্কারি সম্পূর্ণরূপে ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও আমি সিবিআই কর্মকর্তাদের

জেনেভা রেস্টুরেন্টে প্রকাশ কিংবা শ্রীচান্দ কিংবা তাদের উভয়েরই সাথে দুপুরের খাবার খেতে দেখেছি। এই কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর নরসীমা রাও একবার পশ্চিম ইউরোপীয় কিছু দেশ সফরে আসেন। পশ্চিম ইউরোপে তার অবস্থানকালে হিন্দুজারা বার্ষিক দিওয়ালি উৎসবের আয়োজন করেন। এতে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন। হিন্দুজারা এতে নরসীমা রাওয়ের যোগদানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হলেও রাও তাতে যোগদানের ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি পিএসও-কে একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানতে চান তার এতে যোগদান করা ঠিক হবে কি না। শিগগিরই সম্মতিসূচক জবাব আসে।

বফোর্স কলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাওয়ার আগে এ ধরনের কোনো অনীহা ছিল না। বস্তুত প্রকাশ নয়াদিল্লিতে কী ঘটছে না ঘটছে সে ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনের চাইতেও বেশি খোঁজ খবর রাখতেন। রাজনৈতিক নেতা কিংবা ঊর্ধ্বতন আমলারা কে কখন কী প্রোগ্রামে সফরে আসছেন তা তিনি ভারতীয় মিশনেরও আগে জেনে ফেলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলুন, ঊর্ধ্বতন আমলা বলুন আর বিচারক কিংবা অন্য যে কেউ হোক না কেন তারা সবাই জেনেভায় অবস্থানকালে তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

বফোর্স কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আগেও মাত্র দু'জন নেতা তাদের থেকে দূরে থাকেন। এদের একজন নরসীমা রাও এবং অপরজন ভি পি সিং। এ সময় ভি পি সিং রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গ্যাট (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ) সম্মেলনে যোগ দিতে জেনেভায় আসতেন। তিনি ভারতীয় মিশনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে হিন্দুজাকে তার সফরের ব্যাপারে কিছুই জানানো না হয়। তাদের তরফ থেকে কোনো দাওয়াতও যাতে গ্রহণ করা না হয়।

একদিন প্রকাশ জেনেভায় ভি পি সিংয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে জেনে ফেলেন। তিনি কোন্ হোটেলে রয়েছেন সেটা বের করে প্রকাশ সেখানে তাকে রিং দেন এবং নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান। ভি পি সিং এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকাশের কাছে তার প্রোগ্রাম ফাঁস করে দেয়ার জন্য তিনি ইন্ডিয়ান মিশনের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানান। মিশন ভি পি সিংকে জানায়, প্রকাশ দিল্লিতে যোগাযোগের মাধ্যমেই সব ব্যাপারে জানতে পারেন। এ জন্য তাকে জেনেভায় ভারতীয় মিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হয় না।

জেনেভাভিত্তিক এক ভারতীয় সাংবাদিক প্রথম চেন্নাইয়ের দৈনিক 'দি হিন্দু' ও পরে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার মাধ্যমে বফোর্স কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দেন। সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল পুলিশ বিভাগ এবং সুইডেনের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তার ভালো যোগাযোগ ছিল। জেনেভায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলেন, একজন সুইডিস ছাত্রী এই মহিলা সাংবাদিকের আউ পাইর-এর বাসায় থাকতেন এবং তাকে তার গৃহের কাজে সহায়তার পাশাপাশি এই সংবাদ তৈরির কাজেও সহায়তা করেন।

জেনেভায় ভারতীয় কূটনীতিক ও বিরাটসংখ্যক স্থানীয় ভারতীয়ের সাথে ওই

ঘটনার পর তার সম্পর্কে কিছুটা চিড় ধরে। আমাকে তার বন্ধু বলে দাবি করতে না পারলেও তার সাথে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল। কারণ, তার মা একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে চেন্নাইয়ে আমাদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমি বহুবার তার বাসায় গিয়েছি এবং তার ও ইতালীয় ভাষাভাষী সুইস স্বামীর সাথে অনেকবার খাওয়া-দাওয়া করেছি। তিনি সব সময় না হলেও প্রায়ই বফোর্স-সংক্রান্ত খবর পত্রিকায় পাঠানোর আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলতেন। আফগানিস্তানের নির্বাসিত রাজনীতিকদের মধ্যে আমার বেশ ক'জন ওয়েকেবহাল বন্ধু ছিলেন এবং আমি তাদের সাথে কথা বলে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার বিষয়াদি জানতে পারতাম। এসব নিয়ে তার সাথে মতবিনিময় করতাম, তবে তা কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়।

বফোর্স কেলেঙ্কারির ব্যাপারে তিনি যেসব তথ্য আমার সাথে শেয়ার করতেন তা আমি 'র'-এর সদর দফতরে পাঠিয়ে দিতাম। 'র' সেগুলো রাজীব গান্ধীকে পাঠিয়ে দিত। এভাবে রাজীব গান্ধী অগ্রীম জানতে পারতেন পরের দিন 'দি হিন্দু' পত্রিকায় কি ছাপা হতে যাচ্ছে।

একদিন এই সাংবাদিক আমার সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগ করলেন, ভারত সরকারের প্ররোচনায় হিন্দুজারা তার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন। আমি তাকে বললাম এটা আপনার মনের কাল্পনিক কথা। আমি তাকে এই বলে আশ্বাস দিলাম, ভারত সরকারের এ ধরনের কোনো কাজ করার অভ্যাস নেই। এর পর আরও দু'বার তিনি একই অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, আমি এসব অভিযোগ বিশ্বাস করি না। তবে আপনি ইচ্ছা করলে জেনেভা পুলিশের সহায়তা চাইতে পারেন। তারপর তিনি আর কখনও এ অভিযোগ তোলেননি। আর তিনিও জেনেভা পুলিশের সহায়তা চেয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। বফোর্স কেলেঙ্কারির ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ১ বছর আমি জেনেভায় কাজ করে চলি। ওই সময় এবং পরবর্তীকালেও আমার বন্ধুরা আমাকে প্রশ্ন করতেন রাজীব গান্ধী দুর্নীতিপরায়ন ছিলেন কি না কিংবা তিনি ও তার পরিবারের লোকদের বফোর্স কোম্পানি থেকে কমিশন গ্রহণের বিষয়টি আমি বিশ্বাস করি কি না? বরাবরই আমার জবাব ছিল 'আমি দিল্লিতে কখনও রাজীব গান্ধীর সংস্পর্শে আসিনি। তবে ১৯৮৫ সালের জুনে প্যারিস, লিডন ও জেনেভা সফরকালে এবং ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে হেগ সফরকালে আমি রাজীব গান্ধীর সাথে ছিলাম। তার কিছু ব্যয়বহুল শখ ছিল, যেমন দামি গাড়ি ও সুন্দর সুন্দর ইলেট্রনিকস সামগ্রীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি। তিনি জর্ডানের বাদশাহর কাছ থেকে উপহার হিসেবে একটি বিলাসবহুল মার্সিডিস বেঞ্জ কার গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেছে। জর্ডানের বাদশাহ তাকে দিল্লিতে একটি ধীরগতিসম্পন্ন অ্যাম্বেসেডর কারে চড়তে দেখে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। মাঝে মধ্যে তিনি এই মার্সিডিস গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তবে ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি দ্রুত গাড়িটি প্রেসিডেন্টের গ্যারেজে পাঠিয়ে দেন, যাতে করে সেটি ভারত সফরকারী বিদেশী রাষ্ট্র ও সরকার

প্রধানরা ব্যবহার করতে পারেন। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি বিভিন্ন দেশের নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া অন্যান্য উপহারও সরকারের জিম্মায় অর্পণ করেন। তার ব্যক্তিগত শখ ছিল খুবই সাদামাঠা ও কৃচ্ছ্রধর্মী এবং তিনি এটা বলে রাখতেন, তার ভ্রমণভাতা তিনিই পরিশোধ করবেন।'

এখান থেকে আমার জোরালো ধারণা হচ্ছে তিনি দুর্নীতিপরায়ন নন। তবে বফোর্স কোম্পানি তার পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কাউকে কমিশন দিয়েছে মর্মে স্টকহোমে অভিযোগ করা হলে রাজীব গান্ধী তার শান্ত স্বভাব হারিয়ে ফেলেন। কমিশন গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্তদের একজন হচ্ছেন ইতালীয় ব্যবসায়ী। এ অভিযোগ ধামাচাপা দিতে রাজীব গান্ধী যারপরনাই তৎপরতা চালান এবং তাতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলেন। এর ফলে কিছু কিছু লোকের মনে তার সততার ব্যাপারে অযথা ও মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। ইন্দিরা গান্ধী হলে এই পরিস্থিতি ভিন্নভাবে মোকাবেলা করতেন। তিনি নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে এবং ব্যক্তিগতভাবে এতে না জড়িয়ে সিনিয়র কর্মকর্তাদের বলতেন বিষয়টি দেখার জন্য।

রাজীব গান্ধী শুধু ব্যক্তিগতভাবেই এতে জড়িয়ে পড়েননি। তিনি তার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা ও অন্যদের এই ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য বিরোধীদের অন্যতম ভি পি সিংয়ের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করতেও উৎসাহিত করেন। এ ধরনের বিরূপ মন্তব্যের একটি হচ্ছে ভি পি সিংয়ের পুত্রকে জড়িয়ে। ভি পি সিংয়ের পুত্র নাকি আইবি'র সহায়তায় নয়াদিল্লি বিমানবন্দর ছেড়ে যেতে চাওয়া একটি ভাড়া করা বিমানের উড্ডয়ন বিলম্বিত করান এবং সে বিমানে করে নাকি ভি পি সিং ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের জন্য তার নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যেতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল একটা হাস্যকর অভিযোগ। এসবের ফলে রাজীব গান্ধী নিজেই নিজেকে নানা জটে জড়িয়ে ফেলেন। রাজীবের নিজের জন্য কিছুটা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে বিব্রতকর পরিস্থিতির ঝুঁকি নিয়ে হলেও বফোর্স-সংক্রান্ত আসল ব্যাপারটি প্রকাশের সুযোগ না করে দিয়ে আইবি, 'র' এবং সিবিআই বরং এ বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে রাজীব গান্ধীকে কতভাবে বুদ্ধি দেয়া যায় সে ব্যাপারে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আমি আজো সেই একই অভিমত পোষণ করি।

রাজীবের অনুরোধে পার্লামেন্টে কংগ্রেস (আই) সদস্য বি সঙ্করানন্দকে সভাপতি করে একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়েছিল বফোর্সের কমিশন প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য। সিবিআই, ডাইরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি টীমকে জেপিসি জেনেভা ও লন্ডন পাঠিয়েছিল সেখানকার কিছুসংখ্যক লোকের জবানবন্দী গ্রহণ ও তদন্ত করার জন্য। 'র'-এর সদর দফতর থেকে আমাকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, এই তদন্ত কাজে আমার কোনো ভূমিকা থাকবে না। আমাকে বলা হলো, আমার কাজ হবে শুধু তাদের পরোক্ষ সহযোগিতা দেয়া। যেমন প্রয়োজনে ফ্রান্স ও ইংরেজি ভাষায় দোভাষীর কাজ করা এবং কোনো কাগজপত্র টাইপ করার দরকার পড়লে সেটা করে দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু তারা আমাকে বলল,

আমি যাতে তাদের তালিকাভুক্ত সব সম্ভাব্য সাক্ষীর সাথে তাদের আগে দেখা করে কথা বলি এবং তাদের জবানবন্দী রেকর্ড করি। তারপর তারা তাদের প্রত্যেকের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলবেন। আমার ধারণা হলো, তারা শুধু ওই সব লোকের সাথে কথা বলেছেন যাদের বফোর্সের কমিশন প্রদানের বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই কিংবা থাকলেও সামান্য ধারণা রয়েছে। যারা এ বিষয়ে ভালো জানেন বলে দাবি করেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ তারা এড়িয়ে গেছেন।

প্রাথমিক আলোচনার জন্য তারা আমাকে যেসব নাম দিয়েছিলেন তাদের একজন যে ঠিকানার থাকার কথা বলে তারা উল্লেখ করেছেন সে ঠিকানায় থাকতেন না। আমি আমার সোর্সের মাধ্যমে তার সঠিক ঠিকানা বের করে তাদের দেই। কিন্তু তারা তাদের রেকর্ডে উল্লেখ করেন, ওই নামের কোনো ব্যক্তি ওই ঠিকানায় বাস করেন না। তারা প্রকাশ হিন্দুজা কিংবা যে সাংবাদিক এ কেলেঙ্কারির রিপোর্ট পাঠিয়ে ছিলেন তাদের কারো সাথেই যোগাযোগ করেননি। তারা আমাকে বললেন, তারা লন্ডনে শ্রীচান্দ হিন্দুজার সাথে দেখা করে সেখানে তার জবানবন্দী রেকর্ড করবেন। জেনেভায় তারা পাঁচ দিন থাকার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিলেও মাত্র তিন দিনে তারা তাদের কাজ শেষ করে ফেলেন। এই তদন্ত টীমের প্রধান সিবিআই'র পরিচালকদের ফোন করে তার কাছে জানতে চান এখন তারা কী করবেন। সিবিআই জেপিসি'র পক্ষে তদন্ত কাজের সমন্বয় করছিল। শঙ্করানন্দের সাথে পরামর্শের পর তিনি তাদের বলেন, কাজ শেষ হয়ে গেলেও তাদের সফর সংক্ষিপ্ত করা ঠিক হবে না। কেননা, এতে করে তারা তদন্তের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না বলে অভিযোগ উঠতে পারে। তারপরও তারা সফর একদিন কমিয়ে দিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

বফোর্স কেলেঙ্কারি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার কিছু কুৎসিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। যেসব কর্মকর্তা রাজীব গান্ধীর অধীনে চাকরি করেছিলেন এবং বফোর্স-সংক্রান্ত বিষয় কিভাবে ধামাচাপা দেয়া যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সেসব কর্মকর্তারাই ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের পর রাজীব গান্ধীর স্থলাভিষিক্ত হলে ভি পি সিংয়ের অধীনেও স্বেচ্ছায় চাকরি করেন। তারা রাজীব গান্ধীকে কিভাবে আটকানো যায় এবং আসল সত্য প্রকাশ পায় সে ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালে ভি পি সিং ও তার অধীনে কাজ করা বিনোদ পান্ডে অতিগোপন তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার পরিবর্তে ফেয়ারফ্যাক্সের মতো বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার ওপর নির্ভর করতে চাইতেন। ভি পি সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এবং বিনোদ পান্ডেকে তার কেবিনেট সচিব নিযুক্ত করার পরও তারা তাদের এই মনোবৃত্তি বজায় রাখেন।

একটি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করে পান্ডে ইউরোপীয় একটি বেসরকারি গোয়েন্দাকে বফোর্সের কমিশন কারা নিয়েছেন সে তদন্তভার প্রদান করেন। নিরপেক্ষ সূত্র থেকে যাচাই করা হয়নি কিংবা যাচাই করার যোগ্য নয় সেই গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট 'প্রিভিলেজড সূত্র' থেকে প্রাপ্ত বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে দেয়া হয়। একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি তার কোনো

একজন পূর্বসূরি কিংবা কংগ্রেসম্যানের ব্যাপারে তদন্তের জন্য একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োগ করেন এবং সে খবর যদি পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাহলে তাকে হয়তো ইমপিচমেন্টের সম্মুখীন হতে হতো। আমি বিস্মিত হয়েছি এটা দেখে, কিভাবে আমাদের অত্যন্ত খ্যাতিমান সংবাদপত্রগুলো রিপোর্টের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই না করেই রাজীব গান্ধীকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য পান্ডের গেলানো ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থার দেয়া রিপোর্টগুলো 'প্রিভিলেজড সোর্স'-এর বরাত দিয়ে ছাপতে পারল। এসব পত্রিকার মধ্যে চেন্নাইয়ের একটি দৈনিকও ছিল।

তিন বছরের কার্যকাল পার করার পর আমাকে ফের দিল্লিতে বদলি করা হয় ১৯৮৮ সালে। কর্নাটক ক্যাডারের একজন চৌকস খ্যাতনামা আইপিএস কর্মকর্তা (পরলোকগত) এস এ সুবিয়াহ জেনেভায় আমার স্থলাভিষিক্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত বফোর্স কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে রাজিব গান্ধীর কথিত প্রয়াস ফাঁস করে দিতে যে সাংবাদিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন জেনেভা-ভিত্তিক সেই সাংবাদিকের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না এবং এ জন্য তারও কোনো দোষ ছিল না। ভি পি সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার ও বিনোদ পান্ডের সাথে ওই সাংবাদিক সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি তাদের জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যানুসন্ধানী সাংবাদিক বনে যান এবং তিনি যা-ই দিতেন তা-ই তারা কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন। তিনি বুঝতে পারেন, সুবিয়াহ তাকে যতটা গুরুত্ব দেয়ার কথা ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। জানা যায়, এই সাংবাদিক বিনোদ পান্ডে এবং জেনেভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ও সুবিয়াহর বস সতিশ চন্দ্রের কাছে তার আচরণ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করেন। সতিশ চন্দ্র এসব অভিযোগ বিশ্বাস না করলেও বিনোদ পান্ডে তা বিশ্বাস করেন এবং বফোর্স কেলেঙ্কারির ঘটনা তদন্তে সমস্যার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন এই অভিযোগে সুবিয়াহকে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফের দিল্লিতে বদলির আদেশ দেন।

'র'-এর তৎকালীন প্রধান এ কে ভার্মা তার বিশেষ ব্যক্তিত্ব দিয়ে পান্ডের এই আদেশ প্রতিহত করেন। তিনি শলাপরামর্শের জন্য সুবিয়াহকে এক মাসের জন্য দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং এ সময়ে তিনি বিনোদ পান্ডেকে বুঝাতে সক্ষম হন যে সুবিয়াহর সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা প্রশ্নাতীত এবং তার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সচরাচর পাওয়া যায় না। তার সম্পর্কে ওই সাংবাদিকের অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন। বিনোদ পান্ডে সুবিয়াহর জেনেভায় ফিরে গিয়ে সেখানে তাকে দায়িত্ব পালন করতে দিতে সম্মত হন।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে জেনেভায় আমার কার্যকাল (১৯৮৫-১৯৮৮) পেশাগত দিক থেকে ইতঃপূর্বে প্যারিসে আমার কার্যকালের (১৯৭৫-১৯৭৯) মতো তৃপ্তিদায়ক ছিল না। প্যারিসে আমি এমন একটা পদে চাকরি করতাম যা ওপেন লিয়াজোঁ পোস্ট নামে পরিচিত ছিল। ফরাসি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার সাথে লিয়াজোঁ বজায় রাখা আমার কাজ ছিল। ওই গোয়েন্দা সংস্থা জানত আমি 'র'-এর লোক। আমার সাথে একটা জেন্টেলম্যান এগ্রিমেন্ট ছিল, আমি আমার পদকে কাজে লাগিয়ে ফরাসি সরকারের কাউকে সোর্স বানাব না। আমি এটি কঠোরভাবে মেনে

চলতাম। তবে ফরাসি ছাড়া অন্য অ-ফরাসি নাগরিক কিংবা ফরাসি সরকারি চাকুরে নয় এমন ব্যক্তিকে চর হিসেবে রিক্রুট করার এবং সোর্স ধরার ক্ষেত্রে আমার স্বাধীনতা ছিল। পাকিস্তান, চীন, ইরান প্রভৃতি দেশের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে কাজ করতে আমার ওপর কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। তবে এ ক্ষেত্রেও আমি ফরাসি নাগরিক কিংবা তাদের সরকারি চাকরিজীবীকে ব্যবহার করতে পারতাম না। এ বিষয়টি আমাকে পেশাগত একটা তৃপ্তি এনে দিয়েছিল। তদুপরি লিয়াজোঁ বজায় রাখার কাজটাই একটা মজার ব্যাপার।

জেনেভায় আমি একটা গোপন ও নন লিয়াজোঁ পোস্টে চাকরি করতাম। সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং জেনেভায় ক্যান্টনাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়নি, আমি 'র'-এর লোক। এর পরিবর্তে তাদের এরূপ ধারণা দেয়া হয়েছিল, আমি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের লোক হিসেবে ভারতের স্থায়ী মিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। আমার দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট বহুবিধ কাজকর্ম সম্পাদন এবং পাশাপাশি ভারতের কনসাল জেনারেলের দায়িত্ব পালন করা। 'র'-এর স্থায়ী নির্দেশনায় বলা হয়েছে, 'র' কর্মকর্তারা যখন বিদেশে ভারতীয় মিশনে কর্মরত থাকবেন তখন ডিপ্লোমেটিক কভার অর্থাৎ তারা ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তা বলে যেটা প্রচার করা হয়েছে সেটা রক্ষার জন্য তাদের সিকিউরিটি কিংবা ফৌজদারি তদন্তসংক্রান্ত দায়িত্ব দেয়া যাবে না। খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের কারণে সফররত ভারতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিরাপত্তার প্রতি বর্ধিত হুমকি এবং বফোর্স কেলেঙ্কারি তদন্ত করার কারণে জেনেভায় এসব নির্দেশনা কঠোরভাবে পালন করা যায়নি।

১৯৮৫ সালের জুনে জেনেভা ও একই বছর অক্টোবরে হল্যান্ড সফরকালে রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বয়ের কাজে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। ১৯৮৭ সালে প্রেসিডেন্ট ভেঙ্কট রমনের সুইজারল্যান্ড সফরকালেও আমাকে সরাসরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সে সময় আমাকে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও হল্যান্ডের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়েছিল।

বফোর্স-সংক্রান্ত বিষয়ে জেপিসি জেনেভায় তদন্ত কর্মকর্তাদের যে দলটি পাঠিয়েছিল আমি সেই দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। এর ফলে আমার আসল পরিচয় বেরিয়ে যায় এবং জেনেভায় এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার ছিল যে, আমি ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তা নই বরং 'র'-এর সাথে সম্পৃক্ত পুলিশ কর্মকর্তা। বস্তুত জেনেভায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের কিছু কুলাঙ্গার জেনেভা এয়ারপোর্টের কাছে আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেটাকে 'র' হাউস বলে প্রচার করত। সৌভাগ্যবশত সুইস কর্তৃপক্ষ আমি যতক্ষণ তাদের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করিনি ততক্ষণ তারা আমার সে পরিচয়কে বড় করে দেখেনি এবং সুইস কর্তৃপক্ষ যেহেতু আমার ব্যাপারে চিন্তিত ছিল না তাই আমিও চিন্তিত ছিলাম না।

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'র' গঠিত হওয়ার পরপরই কাও-এর সৃষ্ট প্রথম পোস্টগুলোর একটি ছিল জেনেভায়। তিনি এই পোস্টটিকে ইসরাইলের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে গোপন লিয়াজোঁ স্থাপন এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনীতিক সোর্সগুলোর সাথে স্পর্শকাতর বৈঠক অনুষ্ঠানের পয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগাতে চান। এমইএ থেকে এই পোস্টটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই যুক্তিতে বাধা দান করা হয় যে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সুইজারল্যান্ডের কোনো গুরুত্ব নেই। কাও ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝান কেন এই পোস্টটির দরকার আছে। পোস্টটি সৃষ্টির ব্যাপারে এমইএ'তে পাঠানো প্রস্তাবে এসব বিষয় ব্যাখ্যা করা যায়নি। কাও-এর কাছ থেকে বিস্তারিত শোনার পর ইন্দিরা গান্ধী এই পোস্টটির ব্যাপারে অনুমোদন দিতে পররাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দেন।

এই পোস্টটি গঠনের পর প্রায় ১০ বছর মোসাদ এটাকে তার যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর একটি থেকে আনা একজন ব্যবসায়ীর ছদ্মাবরণে নয়াদিল্লিতে মোসাদ তার কর্মকর্তাদের একজনকে নিয়োগ দেয়ার পর থেকে এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। প্রায় ১২ বছর ধরে নয়াদিল্লিতে ব্যবসায়ীর ছদ্মাবরণে নিয়োগপ্রাপ্ত মোসাদ কর্মকর্তারা 'র'-এর সাথে মোসাদের যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯২ সালে ভারত ও ইসরাইলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর অ-কূটনীতিকের খোলসটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

জেনেভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৯৭১ সালের পূর্বে বাংলা ভাষাভাষী কূটনীতিকদের সাথে বৈঠকগুলো। এসব বৈঠককে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগপর্যন্ত বাংলাভাষী কূটনীতিকদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো। এসব বৈঠক থেকে 'র' তাদের পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর ও বিদেশে তাদের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কী কী ঘটছে সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত রাখত। এ ছাড়াও ১৯৭৫ সালে এমএনএফ নেতা লালদেঙ্গার সাথে 'র' এবং আইবি কর্মকর্তাদের যৌথ টীমের প্রাথমিক আলোচনাগুলো এখানেই অনুষ্ঠিত হতো।

১৯৮৫ সালে যখন জেনেভায় আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন এই পোস্টের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে কমে যায়। 'র' তখন সুইজারল্যান্ডের বাইরেও কন্টাক্ট পয়েন্ট হিসেবে অন্যান্য শহরকে ব্যবহার করতে শুরু করে। এতদসত্ত্বেও তিব্বত, চীনের জিনজিয়াং অঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিষয়াদি দেখাশোনার কেন্দ্র হিসেবে জেনেভা নতুন করে গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৮০'র দশকে ভারতীয়দের পরই তিব্বতী উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ জেনেভায় বসবাস করত। তাদের অনেকে তিব্বতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ ওয়াকেবহাল ছিলেন। সুইজারল্যান্ডের সীমান্তসংলগ্ন জার্মানিতে জিনজিয়াং থেকে আগত উইঘরদের একটা ছোট্ট তবে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় অংশ ছিল। তারা প্রথমে তুরস্ক ও পরে সেখান থেকে পশ্চিম জার্মানি চলে যায়। এসব উইঘরদের কেউ কেউ রেডিও লিবার্টি নামে

মিউনিখে সিআইএ'র স্থাপিত, রেডিও স্টেশনে অনুবাদক ও সংবাদ পাঠক হিসেবে কাজ করতেন। এসব উইঘরবাসী জাতিসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস কমিশনের বৈঠকে যোগদানের জন্য জেনেভায় আসতেন।

আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) বিদেশভিত্তিক বহু নেতা স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো থেকে তাদের কার্যক্রম চালালেও তারা প্রায় জেনেভা আসতেন জাতিসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং বিশ্ব চার্চ কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদানের জন্য। এ দু'টি সংস্থার সদর দফতর ছিল জেনেভায়। ১৯৮৩ সালে লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এলটিটিই) শ্রীলঙ্কায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার পর শ্রীলঙ্কার তামিলরা দলে দলে বিদেশে চলে যেতে শুরু করে। পশ্চিম ইউরোপের সুইজারল্যান্ড ছিল তাদের প্রিয় গন্তব্য। তাদের অনেক নেতাও হিউম্যান রাইটস কমিশন ও বিশ্ব চার্চ কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদানের জন্য জেনেভায় আসতেন। সেখানে তারা রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির (আইসিআরসি) কর্মকর্তাদের সাথেও মতবিনিময় করতেন। শ্রীলঙ্কায় আইসিআরসি'র সক্রিয় মানবিক সাহায্য কর্মসূচি ছিল।

ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোর প্রতিই কেবল আগ্রহী ছিলেন না, একই সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার এএনসি এবং নামিবিয়ার সোয়াপো'র স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিও সমান আগ্রহী ছিলেন। ভারত আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি এসব দেশের পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানের মতো নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও মনোযোগী হয়েছিল। 'র' গঠিত হওয়ার আগেই আফ্রিকান দেশগুলোকে সহায়তা দানের প্রকল্প শুরু হয়েছিল। আইবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঘানার গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল। এ জন্য আইবি, কাও ও শঙ্করনায়ারকে ঘানার রাজধানী আক্রা পাঠায়। তারা একজনের পর অন্যজন যান সেখানে।

'র'-এর আত্মপ্রকাশের পর এ ধরনের কাজ আরও জোরদার হয়। ইদি আমিনের ক্ষমতাচ্যুতির পর উগান্ডা, মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ে, জাম্বিয়া, বতসোয়ানা ও মালাবিতে প্রশিক্ষণ সহায়তা দানে 'র' সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ইন্দিরা গান্ধী আফ্রিকান দেশগুলোর রাজনৈতিক স্পর্শকাতর মিশনে 'র'-এর সিনিয়র কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ইদি আমিন ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবোতে তার দেশকে আবার শৃঙ্খলার পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের নির্দেশনা কামনা করেন। ইন্দিরা গান্ধী 'র'-কে এ ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে বলেন। এ ধরনের বিষয়ে তিনি ও রাজীব গান্ধী এমইএ'র পরিবর্তে 'র'-এর ওপর বেশি আস্থা রাখতেন।

'র' এএনসি'র বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামে এবং সোয়াপোকে নামিবিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ দু'টি সংগঠনের অনেক ক্যাডারকে ভারত কিংবা জাম্বিয়ায় প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এএনসি এবং সোয়াপো নেতা ও ক্যাডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে জেনেভা ও লুসাকা

সক্রিয় ভূমিকা রাখে। দুঃখজনকভাবে 'র' দক্ষিণ আফ্রিকায় তার ভূমিকার কোনো রেকর্ড তৈরি করেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'র'-এর যেসব কর্মকর্তা তাদের কর্মদক্ষতার অসাধারণ স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাদের একটি তালিকা পর্যন্ত সংস্থার কাছে নেই।

আফ্রিকার নেতারা ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর প্রতি অগাধ সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা তাদের কাছে নির্দ্বিধায় তা চাইতেন এবং তা পাওয়ার ব্যাপারে তারা আস্থাশীল থাকতেন। সে সময় আফ্রিকায় ভারত ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের মর্যাদা ছিল আকাশচুম্বী। আর এর কৃতিত্ব এককভাবে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর। ভিপি সিংয়ের আমল থেকে আফ্রিকায় ভারতীয় স্বার্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি শুরু হয় এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে আজ ইন্ডিয়ান প্রভাব নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আফ্রিকায় আজ ভারতীয়দের খুঁজে পেতে হলে শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগবে।

জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস কমিশনের বৈঠকে যোগদানকারী প্রতিনিধি দলগুলোতে অনেক দেশেরই গোয়েন্দা কর্মকর্তারা থাকতেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ, বিদ্রোহী গ্রুপ কিংবা জেনেভা সফরের মতো অর্থ আছে এমন ভিন্ন মতাবলম্বীরা এসে যোগদান করতেন এবং তাদের আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গঠন করতেন। এসব গোষ্ঠীর লোকজনের সাথে কথা বলে নানা গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যেত।

১৯৮১ সালে খালিস্তানি আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু খালিস্তানিরা তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে এবং মানুষের সামনে তাদের তুলে ধরতে মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। এশিয়ার মধ্যে এলটিটিই একমাত্র সংগঠন, যেটি অন্য যেকোনো সংগঠনের চেয়ে মানবাধিকার কর্মের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয় এবং তার বেশ সুফলও পায়। তাদের দেখাদেখি খালিস্তানিরাসহ অন্যরা এতে মনোযাগ দিতে শুরু করে। এলটিটিই অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে মানবাধিকার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং এ জন্য তারা একটি পৃথক শাখা খোলে। এই শাখার লোকেরা যাতে কোনো ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত না হয় সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া ছিল।

খালিস্তানিরা এ ব্যাপারে একই রকম সাবধানতা অবলম্বন করেনি। একই ব্যক্তি যিনি সন্ত্রাসে জড়িত তিনিই আবার মানবাধিকার সংক্রান্ত ফ্রন্ট অর্গেনাইজেশনের কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতেন। ফলে এলটিটিই'র ফ্রন্ট অর্গেনাইজেশনের সদস্যরা যেখানে অতি সহজে হিউম্যান রাইটস কমিশনের বৈঠকগুলোতে যোগদান করতে পারতেন সেখানে খালিস্তানিদের এ ধরনের বৈঠকে যোগদানের অনুমতি পেতে বহু কষ্ট হতো। তাই তাদের ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে আগত রেড ইন্ডিয়ানদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে এসব সভায় যোগ দিতেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার রেড ইন্ডিয়ানদের সংগঠনগুলো জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের মাধ্যমে মানবাধিকার কমিশনের তালিকাভুক্ত হতো। এভাবে রেড ইন্ডিয়ান প্রতিনিধিদলের সদস্যরা যখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকারের সমালোচনা

করতেন তখন খালিস্তানিরাও শিখদের দমন-পীড়নের জন্য ভারত সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন।

রেড ইন্ডিয়ান সংগঠনগুলোর নেতাদের সাথে বার বার যোগাযোগ করে আমি তাদেরকে তাদের প্রতিনিধি দল থেকে খালিস্তানিদের বাদ দেয়ার ব্যাপারে রাজি করাই। এর ফলে খালিস্তানিরা জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের বৈঠকে যোগদানে বাধার সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় তারা অন্য দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে লবিতে কিংবা ক্যাফেটেরিয়াতে মতবিনিময় অব্যাহত রাখেন। এতে অবশ্য আমি কিছু মনে করতাম না। কেননা, তাদের ভারত সরকারের বিরুদ্ধে একটু কথা বলার এবং তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাটাকে আমি সমীচীন মনে করিনি। কেননা, যারা তাদের ক্ষোভের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে তাদের দ্বারা সহিংসতা ঘটানোর সম্ভাবনা কম থাকে। আর যারা তাদের ক্ষোভকে নিজেদের মধ্যে রেখে দেয় তারাই সাধারণত সহিংস উপায়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আমি যখন জেনেভায় ছিলাম তখনও জম্মু ও কাশ্মীরিদের আন্দোলন শুরু হয়নি। তাই তখন কোনো কাশ্মীরি সেখানে যেত না।

জেনেভায় আমার যোগদানের আগেই সুইজারল্যান্ড পাকিস্তানের তৎপরতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জুরিখ থেকে কামান ও অত্যাধুনিক যোগাযোগ সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে শুরু করে। পাকিস্তানের গোপন পারমাণবিক সংগ্রহকার্যের সমন্বয় সাধনের কাজ তখন জেনেভা থেকে সম্পন্ন করা হচ্ছিল। বিসিসিআই'র জেনেভায় বিরাট শাখা ছিল এবং তার স্টাফের লোকজন বেশিরভাগ ছিল পাকিস্তানি। হাবিব ব্যাংকের জুরিখে একটি সক্রিয় শাখা ছিল এবং তারও অধিকাংশ স্টাফ ছিল পাকিস্তানি। যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি ও অন্যান্য দেশ থেকে যেসব পারমাণবিক সরঞ্জাম ক্রয় করা হতো তার অর্থ পরিশোধ করা হতো এসব ব্রাঞ্চ থেকে। পাকিস্তানের একটি জাহাজ কোম্পানিকে পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং এটির সদর দফতর ছিল জেনেভায়। এই কোম্পানির সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপ থেকে সংগৃহীত সামরিক ও পারমাণবিক সরঞ্জামগুলো গোপনে পরিবহন করা হতো। ওই সময় জুরিখে পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের প্রবাহ ক্রমে বাড়তে থাকে। এদের বেশিরভাগ আহমদিয়া তথা কাদিয়ানী এবং ভুট্টো পরিবারের সমর্থক। জিয়াউল হকের সামরিক শাসনে পিষ্ট হয়ে তারা জুরিখের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

জেনেভায় আমার যোগদানের পর রোমে নির্বাসিত রাজা জহির শাহের ঘনিষ্ঠ কিছু আফগান রাজনৈতিক উদ্বাস্তু জেনেভা ও জুরিখে বসবাস করতে থাকেন। তারা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে শুরু করেন। জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে আফগান-সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এবং পাকিস্তান ও মুজাহিদদের মধ্যকার সমঝোতা বৈঠকের ভেনু হিসেবে জেনেভাকে বেছে নেয়া হয়। এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পথ সুগম হয়। এসব সমঝোতা বৈঠকে যোগদানের জন্য পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল জেনেভায় আসত।

জেনেভায় সমঝোতা বৈঠকের ব্যাপারে জানাশোনা ভালো এ মর্মে আমার একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠে। নির্বাসিত পশতু ও তাজিকদের সাথে আমার বেশ ভালো যোগাযোগ ছিল। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নটোবর সিং জেনেভা সফর করেন। ভারতের কনসাল জেনারেল হিসেবে আমাকে তার সফরের বিষয়টি দেখাশোনা করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে তিনি রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ হামবড়া স্বভাবের বলে বদনাম ছিল। তবে আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করতাম। তিনি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের একজন ছিলেন, যারা ফরেন সার্ভিসের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ প্রদর্শন করতেন। নটোবর সিং ছাড়া ফরেন সার্ভিসের অন্য কোনো কর্মকর্তা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোতে এত বেশি পরিচিতি ও সম্মান অর্জন করতে পারেননি। ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর পর যে ব্যক্তিটি জনপ্রতিনিধি হিসেবে আফ্রিকায় সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন তিনি হচ্ছেন নটোবর সিং। তিনি এমন এক সময় জাম্বিয়ায় ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন যখন 'র' ও এএনসি'র মধ্যে সম্পর্ক জোরদার হচ্ছিল। তিনি এ সম্পর্ক জোরদারের বিষয়টিকে উৎসাহিত করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী ও তার পরিবারের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন। একজন নেতার প্রতি আনুগত্য কিভাবে মাপা যায়? সেই আনুগত্য তখন নয় যখন তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তির শীর্ষে থাকেন বরং প্রভাব-প্রতিপত্তি যখন ক্ষয়ের পথে তখনকার আনুগত্যের মূল্যই বেশি। ১৯৭৭ ও ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর যখন দুর্দিন এবং মোরারজি দেশাই সরকারের দ্বারা তিনি যখন হয়রানির শিকার তখন যেসব মুষ্টিমেয় সরকারি চাকরিজীবী মোরারজি দেশাই সরকারের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কাদা ছোড়ার লোভ সংবরণ করতে পেরেছিলেন তাদের একজন ছিলেন নটোবর সিং।

নটোবর সিং যখন জেনেভায় আসেন তখন আমার সাথে পরিচিত নির্বাসিত আফগান রাজনীতিকরা তার সফর সম্পর্কে জানতে পারেন। তাদের সবাই তাকে চিনতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাদের একজন আমাকে বললেন তিনি নটোবরের সাথে একটি বিশেষ সৌজন্য সাক্ষাৎকার করতে চান এবং এ সাক্ষাতের বিষয় যাতে পাকিস্তানি কিংবা অন্য কোনো নির্বাসিত নেতা জানতে না পারেন। তিনি বলেন, 'আমরা আফগান জনগণকে সমর্থন না দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের সমর্থন দেয়ায় ভারত সরকারের প্রতি নাখোশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয়দের প্রতি, যারা আমাদের অতিঘনিষ্ঠ এবং সোভিয়েত হস্তক্ষেপের আগে যারা আমাদের সাহায্য করেছিল, তাদের প্রতি আমাদের মায়া-মমতা কমে যায়নি। নটোবর সিং তাদেরই একজন।' আমি নটোবর সিংকে তার আগ্রহের কথা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, লোকটিকে তার হোটেল স্যুটে সকালের নাশতার সময় নিয়ে আসতে। আমি তাকে নটোবর সিংয়ের স্যুটে নিয়ে এলাম এবং তাদের একান্তে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়ে আমি সেখান থেকে আমার অফিসে চলে যাই। বৈঠক শেষে আফগান রাজনীতিককে বিদায় জানাতে নটোবর সিং তার হোটেল স্যুটের বাইরে আসেন। ঠিক সে সময় জেনেভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জে এস তেজা সেখানে পৌঁছেন। কি এক আন্তরিকতার সাথে তারা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন

সেটা তেজা প্রত্যক্ষ করেন। পরে তিনি সিংয়ের স্টাফদের কাছে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলে তারা তার পরিচয় দেন এবং আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছি বলে জানান।

নটোবর সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তেজা তার অফিসে এসেই আমাকে রিং দেন। তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে কখনও বলেননি যে, এই লোককে আপনি চেনেন। দয়া করে লোকটিকে আমার অফিসে নিয়ে আসবেন চা খেতে। ভবিষ্যতে আমি তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করব। আপনার তার সাথে যোগাযোগ রক্ষার দরকার নেই।' আমি তেজার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। তিনি আমাকে বিষয়টি দু'তিনবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তেজা ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার অনীহাকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। জেনেভা অবস্থানকালে আগাগোড়াই তিনি আমার সাথে আন্তরিক মনোভাব নিয়ে চলেন এবং এ বিষয়টিকে তিনি পুঁজি করে আমার সাথে খারাপ আচরণ করেননি। বদলির প্রাক্কালে আমাকে দেয়া একটি বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তেজা ফরেন সার্ভিসের বহু কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বলেছিলেন, 'আমাদের পররাষ্ট্র সার্ভিসে আমি আপনার মতো লোক পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি।' তার এই উক্তিতে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, বিদেশে নিয়োগকালে 'র' কর্মকর্তারা তাদের মিশন প্রধানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যায় পড়তেন। এসব সম্পর্কের ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে কাও-এর সময় থেকেই সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কূটনৈতিক মিশনে যোগদানের পরপরই কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে কর্মরত 'র' কর্মকর্তা রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করবেন এবং তিনি তার দায়িত্ব সংক্রান্ত তথ্য লিখিতভাবে তার কাছে পেশ করবেন এবং রাষ্ট্রদূত স্থানীয় লোকজনের কাছে তার আসল পরিচয় গোপন রাখতে সহায়তা করবেন।

অনেক আইএফএস কর্মকর্তাই এটা করেন না। বিদেশে কর্মরত 'র' কর্মকর্তাদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকিটি আসে আইএফএস কর্মকর্তাদের পত্নীদের তরফ থেকে। তাদের অনেকেই লোকজনের কাছে এ ধরনের কথা বলে বেড়িয়ে বিকৃত আনন্দ পান যে, 'এই কর্মকর্তা তো আইএফএস-এর নন; তিনি আসলে 'র'-এর লোক।' সিআইএ কিংবা আইএসআই'র কোনো কর্মকর্তা যদি 'র'-এর কোনো কর্মকর্তাকে খুঁজে বের করতে চান তাহলে তাদের তেমন কিছুই করা লাগবে না। তারা আইএফএস-এর কোনো একজন কর্মকর্তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে নির্দ্বিধায়ই সে পরিচয় পেয়ে যাবেন। আমি প্যারিসে থাকাকালে একদিন এক পার্টিতে একজন আইএফএস কর্মকর্তার স্ত্রী সম্পূর্ণ মাদকাসক্ত অবস্থায় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মেহমানদের লক্ষ্য করে বলেন, 'ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার এই সুদর্শন লোকটির সাথে আপনারা সাক্ষাৎ করুন।' সৌভাগ্যবশত ওই পার্টিতে যারা ছিলেন তারা সবাই স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। তাতে কোনো বিদেশী কিংবা আইএসআই কর্মকর্তা ছিলেন না। অসাবধান আইএফএস কর্মকর্তারা এবং তাদের কারো কারো আরও বেশি অসাবধান

স্ত্রীরা বিদেশে কর্মরত 'র' কর্মকর্তাদের জন্য ক্রমাগত পেশাগত সমস্যার কারণ হচ্ছেন।

বিদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত 'র' কর্মকর্তারা টেকইন্ট সংগ্রহ করেন না। তারা কেবল হিউমিন্ট সংগ্রহ করে সেগুলো তাদের সদর দফতরে পাঠিয়ে দেন। তারা মুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্টও তৈরি করেন। তাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, হিউমিন্ট রিপোর্টের ক্ষেত্রে এসব রিপোর্ট সূত্রের পরিচয় গোপন রেখে মিশন প্রধানকে দেখাতে হবে এবং তিনি ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করে থাকলে তা সদর দফতরকে জানাতে হবে। সাধারণত মিশন প্রধানরা সূত্রের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন না। তবে কেউ যদি দেখেন যে, কোনো হিউমিন্ট রিপোর্ট ভালো, তাহলে তারা সোর্সের পরিচয় জানার চেষ্টা করেন এবং তারা চান যে, তারা নিজেরাই সোর্সকে ব্যবহার করবেন। এরপর 'র' কর্মকর্তারা যদি সোর্সের পরিচয় গোপন করতে চান তাহলে 'র' কর্মকর্তার সাথে সোর্সের (মহিলার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে মহিলা) ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে নানারকম গল্পের অবতারণা করা হয়। তেজা যখন আমার সোর্সকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আমার অনীহাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন এবং আমার ব্যাপারে তার ইতিবাচক মনোভাব এটার কারণে প্রভাবিত হয়নি দেখতে পেলাম তখন আমি সত্যিই মুগ্ধ হলাম। তবে এ ধরনের উদাহরণ বিরল।

কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে একজন গোয়েন্দার জন্য পেশাগত দিক থেকে জেনেভা বড়ই চ্যালেঞ্জিং কেন্দ্র ছিল। তবে পাশাপাশি পেশাগত তৃপ্তির উল্লেখযোগ্য সুযোগও ছিল। এরপরও কার্যকালে জেনেভার চেয়ে প্যারিসে আমি বেশি পেশাগত তৃপ্তিবোধ করি। প্যারিসে আমার দূতাবাস সংক্রান্ত কাজকর্ম ছিল কম। তাই যতটা সময় দরকার ছিল ততটা সময়ই আমি গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োগ করতে পেরেছিলাম। জেনেভায় আমার স্থায়ী মিশন সংক্রান্ত কাজকর্ম ছিল অত্যধিক। অধিকন্তু কনসাল জেনারেল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে আমাকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো ও অন্যান্য সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বেশি। ফলে গোয়েন্দাগিরির জন্য সময় আমি কমই পেয়েছি। অধিকন্তু আমাকে জেনেভায় ও বার্নে দু'দু'জন সিনিয়র রাষ্ট্রদূতের অধীনে কাজ করতে হতো বিধায় উত্তেজনার মধ্যে আমার সময় কাটতো। দুর্ভাগ্যবশত গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পছন্দ-অপছন্দ বলতে কিছু থাকে না।

আমার তিন বছরের কার্যকাল ১৯৮৮ সালের মে মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে আমি তৎকালীন 'র' প্রধান এ কে ভার্মার কাছ থেকে একটি বার্তা পাই। তিনি লিখেছেন, তিনি আমার অবস্থানের মেয়াদ আরও ১ বছর বৃদ্ধি করে তা ১৯৮৯ সালের মে মাস পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর তিন সপ্তাহ পর আমি অপর একটি বার্তা পাই, যাতে বলা হয়েছে, কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর প্রকল্প নিয়ে কাজ করার জন্য সদর দফতরে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব, আমার এক্সটেনশন বাতিল করে দেয়া হচ্ছে এবং আমাকে ১৯৮৮ সালের মে মাসে ফিরতে হবে।

১৯৮৮ সালের মে মাসে আমি সুবিয়াহ'র কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করি। তখন আমার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর এবং আমার চাকরির বয়স আরও ছয় বছর বাকি ছিল। আমি জানতাম আমি আর কখনও কোনো ফিল্ডে নিয়োগ পাব না।

বিমানে করে বাড়ি ফেরার পথে আমি 'র'-তে আমার ২০ বছরের কর্মজীবনের যেসব মজার মজার কাজ করেছি, সেগুলো নিয়ে ভাবতে থাকি। এ ২০ বছরের মধ্যে ৭ বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় আমি বিদেশে কাটিয়েছি। বাকি যে ছয় বছর রয়ে গেছে, এ সময়ে আমি ইতঃপূর্বে আইএসআই'কে তার নিজস্ব কিছু ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে যা করেছি তার চেয়ে বেশি মজার কিছু করতে পারব বলে আমার মনে হচ্ছিল না। আমি যেটুকু করতে পেরেছি, সেটুকুই আমাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দান করছিল। আমার মনে হলো আমার বয়স ১০ বছর কমে গেছে।

পরিচ্ছেদ : পনের

রাজিব গান্ধী এবং 'র'

পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময় রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে 'র'-এর প্রধান হিসেবে তিনজন দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে ইউপি ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা জিসি সাক্সেনা ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে 'র'-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালের মার্চে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মহারাষ্ট্র ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা এসআই জোশি 'র'-প্রধানের দায়িত্ব নেন। এ দায়িত্ব নেয়ার পর ১৫ মাস এই পদে বহাল থেকে ১৯৮৭ সালের জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজিব গান্ধী চেয়েছিলেন তার পূর্বসূরির মতো জোশি তিন বছরের মেয়াদ পূর্ণ করুক। কিন্তু জোশি তাতে সম্মত হননি। তিনি মনে করেন, এতে রাজি হলে তার উত্তরসূরির প্রতি অবিচার করা হবে। তামিলনাড়ু ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা জোশির স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু সুইডিশ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বফোর্স কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ সম্পর্কে শঙ্করণ নায়ার বেখবর ছিলেন বলে রাজিব গান্ধী তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি নিজেকে যৌথ গোয়েন্দা কমিটির প্রধানের পদে সরিয়ে নেন এবং মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা এ কে ভার্মাকে 'র' প্রধানের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিন বছরের পূর্ণ মেয়াদ 'র'-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এর মধ্যে কিছু সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজিব গান্ধী এবং বাকি সময় ছিলেন জনতা দলের ভিপি সিং।

কাও ও সানতুকের মতো আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় সাক্সেনা ছিলেন নিরেট ভদ্রলোক কিন্তু কাজের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। জোশি ও ভার্মা ছিলেন শঙ্করণ নায়ারের মতো কথাবার্তায় বিনয়ী ও স্পষ্টবাদী আর কাজের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। শঙ্করণ নায়ারের মতো সাক্সেনা, জোশি ও ভার্মা পাকিস্তান, রাজনৈতিক ইসলাম ও জঙ্গি ইসলামের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তবে সাক্সেনা, জোশি ও ভার্মা ভারত বা এর বাইরের যে কারো কাছ থেকে এ সম্পর্কে অধিক জানতেন। সাক্সেনা মুসলিম কোনো দেশে দায়িত্ব পালন করেননি। তবে 'র' গঠন হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই তিনি পাকিস্তান ডেস্কে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৭০-এর দশকে রেঙ্গুনে দায়িত্ব পালনের বাইরে পাকিস্তান নিয়ে খুব বেশি কিছু

তাকে করতে হয়নি। জোশি হলেন 'র'-এর একমাত্র প্রধান যিনি পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করেন। ভার্মা কাবুল ও আঙ্কারায় দায়িত্ব পালন করেন। সদর দফতরে থাকাকালীন অধিকাংশ সময় পাকিস্তান ও ইসলামি দেশগুলো নিয়ে তিনি কাজ করেন। শঙ্করণ নায়ার ও ভার্মা সম্পর্কে পাকিস্তানের গোয়েন্দা ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ভয় মেশানো সম্ভ্রম ও সম্মানবোধ ছিল। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কাওয়ের অধীনে নায়ারের সক্রিয় ভূমিকার কথা জানতেন। তারা নায়ারের মতো ভার্মারও একই ধরনের সুনাম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তারা জানতেন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তানকে আরেক দফা ভাঙার সিদ্ধান্ত দিলে এ কাজ তার চেয়ে ভালো কেউ করতে পারবেন না। জেনেভায় এবং এরপর সদর দফতরে দায়িত্ব পালনকালে আমাকে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের নাগরিকসমাজ ও সরকারের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে মিশতে হয়েছে। ভার্মার সাথে কথাবার্তা ও আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে, তিনি একেবারেই স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়ের একজন যিনি পাকিস্তানিদের মনস্তত্ত্ব এবং দেশটির সেনা কর্মকর্তাদের মাইন্ড সেট বা মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো বুঝতেন। আমার মনে কোনো সংশয় নেই যে ভার্মা যদি রাজিব গান্ধীর বাকি সময় বা আরও দুই বা তিন বছর 'র'-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন তাহলে ১৯৮৯ সালে রাজিব গান্ধীকে পরাজিত হতে হতো না। পাকিস্তান আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাও সম্ভব হতো না এবং জিহাদিদের হাতে নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণ হারাতে হতো না।

রাজিব গান্ধী ও ভার্মা মনে করতেন পাকিস্তানকে যদি ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ব্যবহারের কারণে চড়া মূল্য গুনতে না হয় তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের ব্যবহার থেকে দেশটিকে নিবৃত্ত করা যাবে না। মোরারজি দেশাইর সময় 'র'-এর গোপন তৎপরতা চালানোর সামর্থ্য বিস্তৃতির যে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা ১৯৮০ সালে ইন্দিরা ক্ষমতায় আসার পর আবার শুরু হয়। এ প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সানতুক, সাক্সেনা ও জোশি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তবে ভার্মাই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি 'র'-কে শক্ত দাঁত উপহার দিয়েছিলেন, যা ১৯৭৭ সালে ক্ষয় হতে শুরু করেছিল। তিনি 'র'-কে আবার আঘাত হানার উপযোগী করেছিলেন।

পাঞ্জাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কেপিএস গিলের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব পুলিশ, এম কে নারায়ণনের নেতৃত্বে আইবি, ভেড মারওয়ার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় আধা সামরিক ও সামরিক বাহিনীর ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনায় সাক্সেনা, জোশি ও ভার্মা পাঞ্জাবে সন্ত্রাস প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। সাক্সেনা ও জোশির নেতৃত্বে সন্ত্রাস সম্পর্কিত মানব তথ্য সংগ্রহ বা হিউমিন্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী লিয়াজোঁ নেটওয়ার্কের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। ভার্মা 'র'-কে আঘাত হানার মতো দাঁত তৈরি করে দিয়েছিলেন যাতে পাকিস্তান উপলব্ধি করতে পারে যে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতাকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না। এ তিনজনই

সৌভাগ্যবান যে রাজিব গান্ধী তাদের সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজিব গান্ধী গোয়েন্দা পেশা এবং ভারতের গোয়েন্দা সম্প্রদায় সম্পর্কে খুবই সীমিত ধারণা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে অপারেশন ব্লু স্টারের সময় তার দৈহিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় রাজিব সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ইন্দিরা গান্ধী বারবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে পাঞ্জাব সঙ্কটের একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। এসব বৈঠকে রাজিবকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন তিনি। সাক্সেনা প্রধান থাকাকালে 'র' এ ধরনের অনেক গোপন বৈঠকের আয়োজন করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে রাজিব গান্ধীর সাথে 'র'-এর আলোচনা বা মতবিনিময় ছিল খুবই সীমিত পর্যায়ে। 'র' সম্পর্কে তার ধারণাও খুব একটা ছিল না।

বলা হয় যে, রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম দিকে স্পর্শকাতর চলমান অপারেশন নিয়ে দু'জনের মধ্যকার একান্ত বৈঠক এবং 'র'-এর গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাক্সেনার ব্রিফিংয়ের সময় তিনি বিস্মিত হতেন। এমনকি কোনো কোনো সময় বিরক্তও হতেন। আরও শোনা যায় যে, পাকিস্তান, চীন ও বাংলাদেশ সংক্রান্ত 'র'-এর চলমান অপারেশন অব্যাহত রাখতে অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কম ইতস্তত করলেও শ্রীলঙ্কার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার মায়ের অপারেশন নীতি অনুসরণ উচিত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় বোধ করতেন। শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে মত স্থির করতে তিনি বেশ সময় নেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও তিনি মায়ের অনুসৃত নীতি অব্যাহত রাখার পক্ষেই মত দেন।

রাজিব গান্ধীর পাকিস্তান নীতিকে ইন্দিরার নীতির কার্বন কপি বলা ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে মায়ের অনুসৃত নীতির সাথে রাজিবের নীতির সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। ইন্দিরা গান্ধী নতুন করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রতি জোরালো অপছন্দ নিয়ে। তিনি জিয়াউল হককে বিশ্বাস করতেন না। ইন্দিরা মনে করতেন তার জন্য জিয়াউল হক মোটেই যথার্থ ব্যক্তি নন এবং ভারতীয়দের প্রতি তার উষ্ণতা ও আন্তরিকতার প্রকাশকে তিনি ছলাপূর্ণ মনে করতেন। সর্বোপরি জিয়াউল হক ও মোরারজি দেশাইর মধ্যে একে অন্যের প্রতি স্বাচ্ছন্দ্য থাকার বিষয়টি তার মনে হয়তোবা বৈরী মনোভাব তৈরি করতে পারে।

রাজিব গান্ধীর মধ্যে তার মায়ের সেই জিয়াউল হক-বিদ্বেষ সেভাবে ছিল না। তিনি পাঞ্জাবের সহিংসতার পেছনে আইএসআই'র সহায়তাদানের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। নিরাপত্তা প্রহরীদের হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পেছনে আইএসআই এবং জিয়াউল হকের হাত থাকার ব্যাপারে যে সন্দেহ করা হচ্ছিল, তার পক্ষে কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৮০'র দশকে আমার মতো অনেকেই মনে করতেন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বিষয়টি একেবারেই অসত্য নাও হতে পারে। এরপরও রাজিব গান্ধী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতার বিষয় বিবেচনায় আনেন। তার এ ধরনের মনোভাবের একটি উদাহরণ হলো আগের পরিচ্ছেদে উল্লিখিত জর্ডানের বাদশাহ হাসানের আইএসআই ও 'র' প্রধানের মধ্যে একটি সংলাপের প্রস্তাবে সাড়া দান। এই সময় রাজিব গান্ধীও তার মায়ের মতোই বিশ্বাস করতেন যে, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবিশেষের

বৈরী মানসিকতার সাথে ভারতকে মোকাবেলা করতে হবে তা নয় বরং ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে মাইন্ড সেট– সেটাই ভারতের জন্য মূল বিবেচ্য বিষয় হতে হবে। ভারতে পাকিস্তানের ব্যাপারে এ রকম অবরুদ্ধ চিন্তা বা মানসিকতা নেই। নেতা ও পরিবেশ ভেদে ভারতে ক্ষমতাসীনদের মনোভাবে পরিবর্তন আসে। অথচ ভারতকে দুর্বল, সঙ্ঘাতময় ও অস্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে সামরিক বা বেসামরিক নীতিনির্ধারক নির্বিশেষে পাকিস্তানে সবাই একই মানসিকতা পোষণ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে অপদস্থ ও নিগৃহীত হওয়ার ব্যাপারটিই যেকোনো পাকিস্তানি নেতার এই মানসিকতার যে কারণ তা নয়। ১৯৭১ সালের আগে এবং ১৯৭১ -এর পর সব সময় এই মানসিকতা লক্ষ করা গেছে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের মধ্যে। মৌলবাদী কিছু দলের নেতারা এ মানসিকতার বিষয়টি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন, অন্যদিকে বাকিরা বাহ্যিক উষ্ণ আচরণ বা ব্যবহারের আড়ালে এ মানসিকতাকে লুকিয়ে রাখেন। এ মানসিকতার পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারতের অপারেশনাল নীতি প্রণোদনা এবং অ-প্রণোদনাকে মিশেল করে প্রণয়ন করতে হয়। সহযোগিতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে থাকে ইনসেটিভ বা প্রণোদনা আর বৈরী আচরণকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে অসমাদৃত পদক্ষেপ।

পাকিস্তানের প্রতি কাম্য ও অকাম্য এই মিশ্র নীতির প্রয়োজনের ব্যাপারে রাজিব গান্ধী, সাক্সেনা, জোশি ও ভার্মার মধ্যে মতের কোনো ব্যবধান ছিল না। রাজিব গান্ধীর জর্ডানের বাদশাহ হাসানের সংলাপের প্রস্তাব গ্রহণ ছিল পাকিস্তানের প্রতি প্রণোদনামূলক বা কাম্য নীতির একটি উদাহরণ। এ সংলাপ থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো ফল আসবে না জেনেও কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই 'র' এ ব্যাপারে সমর্থন জুগিয়েছে।

অকাম্য বা অনাকাঙ্ক্ষিত নীতির একটি উদাহরণ হিসেবে কেউ কারগিল এবং লাদাখে ভারতীয় অবস্থানকে দুর্বল করতে সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে পাকিস্তান যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তা প্রতিরোধে সময়মতো ও কার্যকরভাবে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণকে সামনে রাখা যেতে পারে। এ সময় 'র' তার গোপন অপারেশন চালানোর ক্ষমতাকে কার্যকর করে পাকিস্তানকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, পাঞ্জাবে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদদ দেয়া হলে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।

রাজিব গান্ধীর সময় অপারেশনাল নীতির আরেকটি উপকরণ ছিল আফগানিস্তানে। কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে পাকিস্তানকে হতাশ করে তোলার জন্য এ নীতি গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানকে আফগানিস্তানে লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে নিরাশ করে তোলার নীতির সূচনা ইন্দিরা গান্ধীর সময় ১৯৬৮ সালে 'র' গঠনের পরপরই করেছিলেন কাও। এই নীতির আওতায় প্রকাশ্য ও গোপনে আফগানিস্তানের শাসক ও বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকদের পাশাপাশি পাকিস্তানি পশতুদের সাথেও অত্যন্ত সুসম্পর্ক তৈরি করা হয়। ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ্রহে ইতিবাচক সাড়া আফগান শাসক, জনগণ এবং পশতু নেতাদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়। ১৯৭০-এর দশকে সম্পর্কের যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল তা আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের এবং রুশপন্থী সরকারের

কাবুলের ক্ষমতা দখলের পরও অব্যাহত ছিল।

যে পদ্ধতিতেই এর বিকাশ ঘটুক না কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের এই নেটওয়ার্ককে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছিল। এই নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য আফগান মুজাহিদ নেতাদের সাথে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তারা সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন জানাতে ভারতের দোদুল্যমানতায় মর্মাহত ও হতাশ হন। তবে এই মর্মবেদনা ও হতাশা তাদেরকে ভারতের প্রতি একেবারে বৈরী করেনি। পশতু ও তাজিক অনেক মুজাহিদ নেতা আফগানিস্তানের সোভিয়েত-বিরোধী সংগ্রামে আইএসআই ও সিআইএ'র সহযোগিতা দানের সময়ও 'র'-এর সাথে গোপন সম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাজিব গান্ধী এ নীতির প্রতি পুরোপুরি সমর্থন জোগান। রাজিব গান্ধীর নেতৃত্বে সাক্সেনা, জোশি ও ভার্মা পাকিস্তানের ব্যাপারে ত্রিমুখী নীতি অনুসরণ করতেন। যেখানে সম্ভব হতো সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করা হতো, প্রয়োজন হলে আবার গোপন তৎপরতার কঠিন আঘাত হানা হতো আর একই সাথে আফগানিস্তানে নিবিড় সম্পর্কের নেটওয়ার্ক বা জাল তৈরি করা হতো।

রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এই নীতি পাঞ্জাবে ফল দিতে শুরু করে। খালিস্তানে আইএসআই'র মদদ দান কমতে থাকে। তবে ১৯৮৯ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে আইএসআই'র ব্যাপক আকারের হস্তক্ষেপ এতে বন্ধ হয়নি। রাজিব গান্ধীর পরে ক্ষমতায় আসা প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেন যে, এ অবস্থায় রাজিবের নীতির যুক্তিই শুধু খুঁজে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু এ নীতিকে আরও জোরদার ও সুসংহত করতে হবে। রাজিব গান্ধীর উত্তরসূরির সময় ত্রিমুখী কৌশল খানিকটা ব্যাপক বৈচিত্র্য নিয়েই বাস্তবায়ন হতে থাকে। তবে ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আই কে গুজরাল দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার 'গুজরাল ডকট্রিন'-এর আওতায় পুরনো নীতিতে ছেদ টানেন। পাকিস্তানের প্রতি একতরফা শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে 'র'-এর গোপন কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন আই কে গুজরাল। তিনি আশা করেছিলেন, পাকিস্তান এই শুভেচ্ছার বিনিময় দেবে। পাকিস্তানের প্রতি তার এ নীতি প্রতিদানমুক্ত একতরফা শুভেচ্ছা প্রদর্শনে পরিণত হয়। তবে আফগানিস্তানে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধী যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তাতে কোনো ব্যত্যয় ঘটাননি গুজরাল এবং এর সুফলও অব্যাহত থাকে। ১৯৯৭ সালের পর পাকিস্তানের সুসমন্বিত কৌশল ছিল না। ভারতকে আইএসআই'র সঙ্ঘাতময় ও রক্তরঞ্জিত করার কৌশলের অংশ হিসেবে এ সংস্থার মদদ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপ্রাপ্ত জিহাদিদের হাতে অনেক নিরীহ ভারতীয়কে জীবন দিতে হয়।

মোরারজি দেশাইয়ের বাজেট সঙ্কোচনের কারণে 'র'-এর মনোযুদ্ধ বিভাগ গুটিয়ে যাওয়ার পর আবার ক্ষমতায় ফিরে এসে ইন্দিরা গান্ধী এই বিভাগকে নতুন করে চালু ও সুংসহত করেছিলেন। রাজিব গান্ধী ক্ষমতায় এসে এ বিভাগকে আরও সুসংহত করেন।

১৯৭৭ সালের শেষ দিকে 'র'তে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় তথ্য সার্ভিসের একজন কর্মকর্তাকে মনোযুদ্ধ বিভাগ নতুনভাবে সচল করার দায়িত্ব দেয়া

হয়। এই বিভাগের মূল কাজ ছিল ভারতের বিরুদ্ধে আইএসআই'র প্রোপাগান্ডাকে কাউন্টার করা এবং পাকিস্তানের ভিন্নমতাবলম্বীদের মতামতকে সে দেশের ভেতরে ও বাইরে ছড়িয়ে দেয়া। ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৮৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে জিহাদি তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত মনোযুদ্ধ বিভাগ অত্যন্ত ভালো কাজ করে। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। 'র'কে আধুনিকায়ন ও কম্পিউটারায়ন করার ব্যাপারে রাজিব গান্ধী বিশেষ উদ্যোগ নেন। এই কর্মসূচির অধীনে টেকইন্ট বা কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে এআরসি'র মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ মনিটরিং জোরদার করার জন্য বাড়তি বিনিয়োগ সম্ভব হয়। একই সাথে হিউমিন্ট বা মানব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে কারিগরি মাধ্যম ব্যবহারও সহজ হয়। ১৯৮০ সালের আগে যোগাযোগ গোয়েন্দা তথ্য (কমইন্ট) সংগ্রহের ক্ষমতা বহুলাংশে ল্যান্ডফোনে আড়িপাতার মধ্যে সীমিত ছিল। এ কাজে মানুষের সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন হয়। ১৯৭১ সালের আগে এবং পরে মনিটরিং বিভাগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের টেলিযোগাযোগ ইন্টারসেপ্ট করত। তবে তখন পাকিস্তানের বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ ইন্টারসেপ্ট করার ক্ষমতা ছিল সীমিত। ১৯৮০-এর দশকে স্যাটেলাইট মনিটরিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বাড়ানোর ফলে এ সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্যভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে এআরসি'তে নতুন বিনিয়েগের ফলে 'র'-এর ইলেকট্রনিক গোয়েন্দা তথ্য (ইলইন্ট) ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে হিউমিন্ট বা মানব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে কারিগরি ল্যাবরেটরির বাড়তি ক্ষমতা যুক্ত হয়। গোপন লেখা, গোপন ঘাঁটির আলোকচিত্র, বৈরী পরিবেশে ওয়্যারলেস যোগাযোগ, গোপন ঘাঁটির যোগাযোগ এবং টেলিফোন যোগাযোগ ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা তৈরিতে এই বিনিয়োগ কাজে লাগানো হয়। এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পাকিস্তানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে ভালো ভূমিকা পালন করে।

ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধীর আমলের নতুন বিনিয়োগের প্রধান সুবিধা পেয়েছে 'র'-এর পাকিস্তান বিভাগ। মোরারজি দেশাইর বাজেট সঙ্কোচনে সংস্থার টেকইন্ট ক্ষমতায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে সক্ষমতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয় পরবর্তী সময়ে। তবে বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা তথ্যের সাথে বাস্তবতার ব্যবধান দেখা দেয়ায় সশস্ত্র বাহিনী অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বৈদেশিক সংগ্রহ, নতুন বিস্তৃতি, উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সামরিক মহড়া ও মহড়াকালে দৃশ্যমান ত্রুটি বিচ্যুতি, তাদের যুদ্ধকৌশল, ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে 'র'-এর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা সম্পর্কে আপত্তি জানায়। এরপর ভারতের সশস্ত্র বাহিনী বিশেষত সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতের বাইরে নিজস্ব জনবল সূত্র থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের টেকইন্ট ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একই ধরনের বিনিয়োগ করার দাবি জানাতে শুরু করে।

১৯৬৮ সালে 'র' গঠনের সময় ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন দেশের বাইরের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের একক দায়িত্ব ও এখতিয়ার থাকবে এ সংস্থার হাতে। কাও ও তার উত্তরসূরি 'র'-প্রধানরা হিউমিন্ট ও টেকইন্টের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন। আইবি ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বাইরের গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে 'র'-এর ওপর নির্ভরশীলতায় অসন্তোষ ব্যক্ত করে। বিশেষত পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের তৎপরতা ও কার্যক্রম সম্পর্কে 'র'-এর দেয়া তথ্যপ্রবাহ নিয়ে বিশেষভাবে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৮ সালে 'র' গঠনের সময় সংক্ষুব্ধ কিছু আইবি কর্মকর্তা জোরালোভাবে বলতে শুরু করেন যে ১৯৬৮ সালের 'র' গঠনের আদেশটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এমনকি তারা বিদেশী গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোর সাথে লিয়াজোঁর দায়িত্ব 'র'-এর ওপর অর্পণ এবং আইবিসহ অন্যান্য এজেন্সির বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে 'র'-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করার বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ইন্দিরা গান্ধীর আদেশটির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তারা মনে করেন, এ ক্ষেত্রে আইবি'র 'র'-এর ওপর নির্ভরশীল হওয়াটা মোটেই উচিত নয়।

পাকিস্তানিদের তৎপরতা মনিটরিংয়ের জন্য লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতীয় দূতাবাসে আইবি নিজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করে স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে লিয়াজোঁ শুরু করে। সাক্সেনা প্রধান থাকাকালে 'র' এ বিষয়ে সম্মত হয়। এর পর থেকে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রতিবেশী সব দেশের ভারতীয় মিশনে আইবি'র কর্মকর্তা নিয়োগ দানের দাবি আসতে থাকে। ভারতীয় মিশনগুলোর বাহ্যিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইবি অথবা রাজ্য ক্যাডার থেকে নিয়োগ দেয়া আইপিএস কর্মকর্তার বাইরে নতুন আইবি কর্মকর্তা নিয়োগদানের জন্য এ চাপ প্রয়োগ করা হয়। এরপর ইন্দিরা গান্ধীর ধারণার ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিদেশে 'র' এবং আইবি'র দুটো সমান্তরাল সেটআপ তৈরি করা হয়। ভারতীয় করদাতারা এর বোঝা বইতে কি সক্ষম? এর ফলে গোয়েন্দা তথ্যপ্রবাহে কি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়েছে? এসব প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ও সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে কূটনীতিকের পরিচয়ে নিয়োগ দেয়া আইএসআই কর্মকর্তাদের ওপর নজর রাখা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে আইবি'র প্রধান কর্তব্য ছিল। অন্যদিকে আইএসআই'র জন্য ইসলামাবাদ এবং ১৯৯৪ সালের আগে করাচিতে ভারতীয় কনসুলেট জেনারেল-এ কূটনীতিকের গোপন পরিচয়ে নিযুক্ত 'র' কর্মকর্তা এবং এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে রাখা ছিল প্রধান কর্তব্য। এমনকি ১৯৬৮ সালের আগে করাচি ও ইসলামাবাদে নিযুক্ত কূটনীতিক পরিচয়ের আইবি কর্মকর্তারা আইএসআই নজরদারির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সব দেশের গোয়েন্দা সংস্থা গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার জন্য সেসব দেশের বিদেশস্থ কূটনৈতিক মিশনে গোপন কূটনীতিক পরিচয়ে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়। এতে অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নেই।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো বিদেশী গোয়েন্দারা যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের

সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা বা নিরাপত্তা বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার প্রতি নজর রাখে। এ ধরনের প্রচেষ্টাকারীদের চিহ্নিত করে কোনো অসদাচরণ ছাড়া তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে। কাউন্টার টেররিজমের ক্ষেত্রে একধরনের নাগরিক সদাচরণ দেখানো হয়। ভারত ও পাকিস্তান একে অন্যের ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব গোয়েন্দা কর্মকর্তার ব্যাপারে এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের গোয়েন্দাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের দিল্লিতে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টার বিষয় আইবি চিহ্নিত করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতা নিয়ে কোনো স্পর্শকাতর পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে দেশ থেকে তাদের বহিষ্কারের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়।

তবে এ রীতি ভারত ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ব্যাপারে এদু'টি দেশে প্রয়োগ করা হয় না। আইএসআই সন্দেহভাজন ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মুক্তভাবে কাজ করতে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেয় না। তাদেরকে স্থায়ী নজরদারিতে রাখা হয় এবং তাদের ফোনে আড়িপাতা হয়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণের বিষয় গোপন কোনো কিছু নয়। যদি আইএসআই কোনো বিশেষ পরিবেশে 'র'-এর কোনো কর্মকর্তাকে ধরে ফেলে তাহলে বহিষ্কার করার আগে তার গ্রেফতার বা অসদাচরণের ব্যাপারে কূটনৈতিক পরিচয়ে অব্যাহতি পাবার বিধান থাকা সত্ত্বেও তা মানা হয় না।

এ ধরনের ক্ষেত্রে মারধর এবং ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত দেয়া হয়। কোনো অপরাধীকে তৃতীয় গ্রেডের শাস্তি দেয়া হলে তারা ন্যূনতমপক্ষে আদালত বা মানবাধিকার সংস্থার কাছে ন্যায়বিচার চাইতে পারেন। অথচ, গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের তৃতীয় গ্রেডের শাস্তি দেয়া হলেও তাদের তা নীরবে সহ্য করতে হয়।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি'র সবাই যে সাধুসন্ত তাও নয়। তারাও নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত আইএসআই কর্মকর্তাদের প্রতি একই ধরনের আচরণ করেন। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, আইবি ইলেকট্রিক শক দেয় না। অন্তত আমার কার্যকালে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়নি। ধরা পড়ার পর আইবি এবং আইএসআই'র সন্দেহভাজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উপর যেভাবে নির্দয় নিপীড়ন চালানো হয় তারপরও 'র' কর্মকর্তারা পাকিস্তানে এবং আইএসআই কর্মকর্তারা ভারতে স্বেচ্ছায় কিভাবে পোস্টিং নেয় তাতে বিস্মিত হতে হয়। তারা একে অন্যের দেশে নিয়োগ পাওয়ার পর কিভাবে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে তাও একটি বিস্ময়ের বিষয়।

১৯৭৬ সালে আমি আইবি'তে যোগদান করার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা একটি সাধারণ ঘটনাকে (তার মতে বিষয়টি সত্য ছিল) দেখিয়ে আইবি ও আইএসআই কর্মকর্তারা একে অন্যকে কী ধরনের শায়েস্তা করেন তার বর্ণনা দেন। আইবি নয়াদিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনে নিযুক্ত এক সন্দেহভাজন আইএসআই কর্মকর্তাকে স্থায়ীভাবে নিবিড় নজরদারিতে নিয়ে আসে। কোনো এক শীতকালে ঘন কুয়াশার কারণে সামনে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সন্দেহভাজন আইএসআই কর্মকর্তা কোনো এক নৈশভোজ শেষে ঘরে ফিরছিলেন। খুব কাছ

থেকে আইবি'র কর্মকর্তারা তাকে অনুসরণ করে আসছিলেন। সন্দেহভাজন আইএসআই কর্মকর্তা তার গাড়িটি থামান। আইবি'র গাড়িটিও থেমে যায়। আইএসআই কর্মকর্তা বেরিয়ে এসে হেঁটে আইবি'র গাড়ির কাছে এসে নজরদারি দলের প্রধানকে চা খেতে ভেতরে আসবেন কি না জানতে চান।

শুধু তখনই আইবি টীমের হুঁশ হয়, কুয়াশার কারণে তাদের গাড়িটি আইএসআই কর্মকর্তার গাড়িটির বাম্পারের সাথে একেবারেই লেগে গেছে। কোনো নোটিশ ছাড়াই আইবি'র নজরদারি টীম তার বাড়ির আঙিনায় চলে আসে। আইবি টীম বিব্রত হয়ে শেষে তার কাছে ক্ষমা চান এবং তার চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করেই ফিরে যান।

আইবি, 'র' এবং আইএসআই কর্মকর্তারা একে অন্যের দেশে কিভাবে গোয়েন্দাবৃত্তি করেন, প্রতিপক্ষের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে সাধারণ মানুষকে কিভাবে নিরুৎসাহিত করেন তা নিয়ে যে কেউ চমৎকার একটি রম্যবই লিখতে পারেন। ১৯৬৮ সালের আগে একজন আইবি কর্মকর্তাকে পাকিস্তান সামরিক সদর দফতরের একটি সূত্র জানান, এক ব্যক্তি পাক সেনাবাহিনীর একটি শ্রেণীকৃত দলিল সংগ্রহ করেছেন তবে তিনি ফটোকপি করার জন্য তা ভারতীয় মিশনে নিয়ে যেতে পারছেন না। তিনি বলেন, দলিলটি মনোযোগ সহকারে পড়া শেষ হলে তা আবার ফেরত নিয়ে আসবেন। কর্মকর্তাটি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি পার্ককে স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন। আইবি কর্মকর্তা একটি বহনযোগ্য টাইপ রাইটারসহ তার ব্যক্তিগত সহকারীকে সাথে নিয়ে পার্কে যান। সোর্সের কাছ থেকে তিনি দলিলটি গ্রহণ করেন এবং তার পিএ তা টাইপ করতে শুরু করেন। আইএসআই'র নজরদারি দল ওই কর্মকর্তা ও তার পিএকে পাকড়াও করে ফেলেন এবং তাদেরকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করেন। এই ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য।

নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে গুজব সৃষ্টি হয় যে, পাকিস্তানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বলিউডের এক নামকরা তারকার বোনের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এখবরে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। সব সরকারি কর্মকর্তার উদ্দেশে আইএসআই গোপন সার্কুলার জারি করে বলে, 'র' সুন্দরী রমণীদের দিয়ে ফাঁদে ফেলার কৌশল নিয়েছে এবং এ ধরনের কোনো সুন্দরী যদি তাদের কাছে রোমান্টিক কোনো প্রস্তাব দেয় তাহলে এ ব্যাপারে যেন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। এতে আরও বলা হয়, জনা পঞ্চাশেক ভারতীয় সুন্দরী নারীকে 'র' পাঞ্জাবে অনুপ্রবেশ করিয়েছে যাতে তাদের মধুর ফাঁদে আটকে গোয়েন্দারা স্বার্থসিদ্ধি করতে পারেন। এ সার্কুলারের বিষয়টি পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পেশোয়ারের পত্রিকা 'ফ্রন্টিয়ার পোস্ট' এ নিয়ে এক রসাত্মক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে 'র'-এর কাছে আবেদন জানানো হয় 'সুন্দরীদের গন্তব্য শুধু পাঞ্জাব হবে কেন? কেন আকর্ষণীয় ললনাদের শুধু তাদের জন্য পাঠাবেন? আমরা পেশোয়ারিরাও সুন্দরীদের পছন্দ করি। আমাদের জন্য অন্তত জনা দশেক হলেও পাঠান। দেখবেন আমাদের অনেকেই সুন্দরী ভারতীয় ললনার মধুর প্রেমে হাবুডুবু

খাচ্ছেন।'

ভারতের তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী শারদ পাওয়ার দিল্লির এক পত্রিকার তরুণী সাংবাদিককে বলেন, নওয়াজ শরিফ এবং এক ভারতীয় নায়কের আকর্ষণীয়া বোনের ফোনালাপে 'র' আড়ি পেতেছে। তার রেকর্ডে দেখা গেছে, নওয়াজ শরিফ সেই নায়কের বোনকে প্রেমের গান শুনিয়েছেন।

সাংবাদিক মেয়েটি চমৎকার এক স্কুপ নিউজ ভেবে সেটাকে পরদিন তার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। এর দু'দিন পর নায়কের বোনের কাছ থেকে সাংবাদিক তরুণীটি মানহানির এক নোটিশ লাভ করেন। মেয়েটি দৌড়ে শারদ পাওয়ারের কাছে যান এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করেন যাতে মানহানির মামলায় তিনি এক কঠিন লড়াই লড়তে পারেন। মেয়ে সাংবাদিকটি অন্তত সরকারি কোনো কর্মকর্তার কাছে এ মর্মে একটি চিঠি পেতে চান যে তিনি সঠিক খবরটিই পরিবেশন করেছেন। শারদ পাওয়ার নওয়াজ শরিফের সাথে মহিলাটির সম্পর্কের ব্যাপারে নারী সাংবাদিককে কোনো কিছু যে বলেছেন তা-ই বেমালুম অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'মেয়েটি কে তা-ই আমি জানি না। তার ব্যাপারে কিছু বলার প্রশ্ন কেন আসবে?'

আতঙ্কিত হয়ে সাংবাদিক মেয়েটি 'র'-এ প্রেষণে কর্মরত ভারতীয় তথ্য সার্ভিসের পরলোকগত কর্মকর্তা অমিতাভ চক্রবর্তীকে বিষয়টি জানান এবং মানহানি নোটিশের জবাব দিতে সহায়তা কামনা করেন। আমি অমিতাভকে বলি, নওয়াজ শরিফ ও নায়কের বোনের সম্পর্ক নিয়ে আমরা যেখানে কিছুই জানি না সেখানে এ বিষয়ে কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না।এ ধরনের হালকা রসাত্মক বিষয়ের অবতারণা মাঝে মধ্যেই হতে দেখা যায়।

অধিকাংশ সময় ভারত ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একে অন্যের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মম হয়ে থাকে। মাঝে মধ্যেই নয়াদিল্লিতে আইএসআই কর্মকর্তার সাথে আইবি'র নির্মম ব্যবহারের অভিযোগে পাকিস্তানে নিযুক্ত 'র' কর্মকর্তাদের সাথেও পাল্টা নির্মম আচরণ করা হয়। ভারতে রাজিব গান্ধী এবং পাকিস্তানে জিয়াউল হকের সময় এ ধরনের নির্মম ঘটনার অনেক নজির রয়েছে। ১৯৮৮ সালে নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশনে সামরিক এটাচি হিসেবে নিযুক্ত সন্দেহভাজন আইএসআই কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জহিরুল ইসলাম আব্বাসীকে আইবি ফাঁদে আটকায় এবং নির্মমভাবে মারধর করে। আইএসআই তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে এর প্রতিশোধ নেয় ইসলামাবাদে 'র' কর্মকর্তা হিসেবে সন্দেহভাজন এক ভারতীয় কূটনীতিকের ওপর। 'র' আইবি'কে আগাম সতর্ক করা ছাড়াই নয়াদিল্লিতে আইএসআই কর্মকর্তাকে নিয়ে এ ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারে কড়া প্রতিবাদ জানায়। আইবি 'র'-এর সেই আপত্তিকে উড়িয়ে দেয়। দু' দেশের রাজধানীতে নিয়োজিত গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের প্রতি এ ধরনের অসদাচরণ এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের অর্থহীন ঘটনা বন্ধ করা উচিত। এ জাতীয় ঘটনা শুধু পরস্পরের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণতাকেই বাড়িয়ে তোলে। ভারত ও চীনের মধ্যে বৈরী সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে 'র'-এর অবদান উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে

রাজিব গান্ধীর পক্ষ থেকে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের আগে 'র'-এর সাথে বৈদেশিক লিয়াজোঁর অংশীদার যুগোস্লাভ ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে চীনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় (এমএসএস) হিসেবে পরিচিত এক্সটারনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির পক্ষ থেকে কাওয়ের জন্য চীন সফরের এক আমন্ত্রণপত্র জোগাড় করেন। কাও টোকিও হয়ে বেইজিং যান। তিনি সাথে নিয়ে যান চীনে কয়েক বছর দায়িত্ব পালনকারী 'র'-এর শীর্ষ পর্যায়ের চীন বিশেষজ্ঞ জিএস মিত্র, 'র'-এর অর্থনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ড. এস কে চতুর্বেদি ও তামিলনাড়ু ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা এবং কাও'য়ের স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী বি কে রত্নাকর রাওকে।

কাওয়ের চীন সফরের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, চীনা বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার সাথে 'র'-এর লিয়াজোঁ এবং অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয়ত, চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সম্ভাব্য চীন সফরের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিনিধি হিসেবে এই দল চীনা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে যখন ভালোভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এমন এক সময় সফরের দুই দিনের মাথায় ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন। এতে কাও সফর সংক্ষিপ্ত করে হংকং হয়ে দিল্লি ফিরে আসেন।

রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর 'র' নতুন সরকার প্রধানকে কাওয়ের বেইজিং সফর ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। রাজিব গান্ধী কাও ও 'র'-এর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে লিয়াজোঁ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং বেইজিংয়ে তার সফরের ব্যবস্থা করতে তাগিদ দেন। 'র' চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। শুধু তাই নয়, দুই গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি হটলাইনও স্থাপিত হয়। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্পর্শকাতর যোগাযোগের জন্য এই হটলাইন ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে দু' দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক কূটনৈতিক চ্যানেলকে এ ক্ষেত্রে পরিহার করা যায়।

রাজিব গান্ধী ১৯৮৮ সালে চীন সফরে যাওয়ার ব্যাপারে চীনা নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এর আগে স্থাপিত হটলাইনের মাধ্যমে দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক শেষে দেয়ার জন্য দু' দেশের সীমান্ত বিরোধের ওপর যৌথ ঘোষণা ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়। রাজীব গান্ধী তার চীন সফর যাতে সফল হয় তার জন্য 'র' প্রধান এ কে ভার্মাকে অতি গোপন সফরে বেইজিং পাঠান। রাজিব গান্ধী চীন সফরের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেন। তিনি ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও 'র'-এর তৈরি চীন ভারত সম্পর্ক নিয়ে তৈরি করা ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়েন এবং ভারতের বেশ কয়েকজন চীন বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করেন। তার অনুরোধে ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (এসআইএস) দু'জন চীন বিশেষজ্ঞের চীনের নেগোসিয়েশন কৌশল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অবহিত করার জন্য দিল্লি সফরের ব্যবস্থা করে 'র'।

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে রাজিব গান্ধীর চীন সফর ছিল অত্যন্ত উঁচুমাত্রায়

সফল। দু' দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। চীনের শীর্ষ নেতা দেং শিয়াও পিংয়ের সাথে তার উষ্ণ পরিবেশের বৈঠক দু' দেশের জনগণের এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য দু' দেশের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান করে। দেশে ফেরার পর রাজিব গান্ধী 'র' এবং এর প্রধান ভার্মাকে এ সফর সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য সর্বোচ্চ মাত্রার প্রশংসা করেন।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরসীমা রাও যখন চীন সফরে যান তখন তার সফরসূচি ছিল অনেকটাই রাজিব গান্ধীর সফরের কার্বন কপি। শুধু একটি ব্যতিক্রম ছিল চীনা নেতা দেং শিয়াও পিংয়ের সাথে তার সাক্ষাতের কোনো কর্মসূচি এতে ছিল না। দেংয়ের সাথে বৈঠকের কর্মসূচি না থাকায় হতাশা ব্যক্ত করেন রাও। পরে চীনা কর্তৃপক্ষ দেং শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় এ বৈঠকের ব্যাপারে অপারগতার কথা জানায়। রাজিব গান্ধীর চীন সফরের সময় 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে জানতেন নরসিমা রাও। তিনি দেংয়ের সাথে অন্তত একটি সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে 'র'-এর সাহায্য চান। 'র' হটলাইনের মাধ্যমে চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে। জবাবে জানানো হয়, অসুস্থতার কারণে দেং রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনকে স্বাগত জানাতে পারেননি। রাওয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হলে মস্কো তাদের ভুল বুঝতে পারে। দৃশ্যত এটাই মনে হয় যে, চীন দেংয়ের সাথে রাজিব গান্ধীর বৈঠকের ব্যবস্থা করে কার্যত ইন্দিরা গান্ধীর ছেলের প্রতি বিশেষ শুভেচ্ছা হিসেবে। একই ধরনের শুভেচ্ছা তারা রাওকে দেখাতে সম্মত ছিলেন না।

১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় চীনা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বেইজিংয়ে 'র'-এর লিয়াজোঁ অফিসের মাধ্যমে যুদ্ধের কারণে তেলের সঙ্কট হলে তা সরবরাহের প্রস্তাব দেয়। এ সময় ভারতে রাজিব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইন্দিরা কংগ্রেস সমর্থিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চন্দ্র শেখর। ভারত সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেনি। 'র' এবং চীনা ইন্টেলিজেন্সের নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত নিয়মিত বৈঠকে 'র' কর্মকর্তারা চীনা নেতৃবৃন্দের কাছে পাকিস্তানের সাথে চীনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন উঠাত এবং বলত পূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক তৈরিতে এটি কিভাবে সহায়ক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে চীনা জবাব ছিল, চীন শুধু পাকিস্তানকে সেসব প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করছে যা ভারতের জন্য কোনো হুমকি সৃষ্টি করবে না, আর ভারতও যদি চীনের কাছে পাকিস্তানের জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে না এমন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের সরবরাহ চায় তাহলে বেইজিং তা বিবেচনা করবে।

আলোচনার সময় দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়া, জাপানের সাথে মার্কিন সম্পর্ক এবং পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্কের বিষয়াদি উত্থাপিত হতো। এর বাইরে চীনারা ভারতীয় ভূখণ্ডে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামা ও তার অনুসারীদের তৎপরতার বিষয় উল্লেখ করত। আমরা দালাইলামা ও তার অনুসারীদের অবস্থান কোনোভাবে ভারত সফরকারী চীনা নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা

বিঘ্নিত করার কারণ হতে দেয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করি। কিন্তু এরপরও ভারতে তাদের অবস্থান নিয়ে অব্যাহতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে চীনারা। তবে দু' দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ইস্যুকে কোনো সময় বেইজিং অচলাবস্থা তৈরি হওয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায়নি।

অন্যদিকে 'র' এবং চীনা ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে লিয়াজোঁ সম্পর্ক অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে এগোতে থাকে এবং তা রাজিব গান্ধীর চীন সফরকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তবে চীনের ব্যাপারে বিশেষত সামরিক গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বারবার 'র'-এর সমালোচনা করতে থাকে। 'র'-এর কাছে চীনের সামরিক গোয়েন্দা তথ্যের দু'টি মাত্র সূত্র ছিল। প্রথমত, পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে লিয়াজোঁ। দ্বিতীয়ত, তিব্বতের ওপারের সূত্রগুলো। উভয় সূত্রই চীনের সামরিক সক্ষমতা এবং তিব্বতের সামরিক উন্নয়নের ব্যাপারে রঙ ছড়ানো তথ্য দিতো। সামরিক গোয়েন্দারা তিব্বতে চীনা সেনা মোতায়েন নিয়ে অতিরঞ্জিত তথ্য ও প্রক্ষেপণ করার অভিযোগ এনে এ তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করত। দীর্ঘ দিন ধরে সামরিক গোয়েন্দাদের এ ধরনের চ্যালেঞ্জের বাস্তবতাকে 'র' এক সময় স্বীকার করে নেয় এবং বলে যে তাদের প্রক্ষেপণকে হালকাভাবে দেখা যেতে পারে।

সামরিক বাহিনীর মতো একই ধরনের অভিযোগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও আসত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশের রাজনৈতিক তথ্যাবলির ব্যাপারে বলে, 'র' সব তথ্য না হলেও অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করে উন্মুক্ত সূত্র থেকে। শুধু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই নয়, কিছু লিয়াজোঁ এজেন্সিও 'র'-এর সাপ্তাহিক প্রতিবেদন সম্পর্কে বলে, এসব তথ্য চীনা গণমাধ্যমের উন্মুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিছু লিয়াজোঁ এজেন্সি এত দূর পর্যন্ত বলে বসে, এ ধরনের উন্মুক্ত তথ্য শেয়ার করা বা বিনিময়ের কোনো অর্থ হয় না। কোনো কাজেই আসে না এসব। 'র'-এর বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন ও প্রক্ষেপণও সমালোচিত হতে থাকে। বলা হয়, এসব প্রতিবেদনে গভীরতা এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। শুধু অর্থমন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন চীনা অর্থনীতির ওপর 'র'-এর প্রতিবেদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। এসব প্রতিবেদনও বহুলাংশে উন্মুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে তৈরি ছিল; কিন্তু এতে অর্থমন্ত্রণালয় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ খুঁজে পায়। অধিকন্তু ১৯৮০'র দশকে চীনা নেতৃত্ব তাদের অর্থনীতিকে সবেমাত্র উন্মুক্ত করছে এমন এক প্রেক্ষাপটে 'র' ছিল ভারতের একমাত্র সরকারি সংস্থা যেটি চীনা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেশ পদ্ধতিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

রাজিব গান্ধীর আমলে 'র'-এর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি থেকে পাকিস্তান শাখা যে সুফল লাভ করে চীনের ক্ষেত্রে ততটা সুফল পাওয়া যায়নি। ১৯৬৮ সালের পরবর্তী সময়ে 'র'-এর নামকরা চীনা বিশেষজ্ঞ জি এস মিশ্র, এসএন ওয়ারটি, দিপঙ্কর স্যান্যাল, এন নরসিমান প্রমুখ আইবি'র বিশেষভাবে বাছাই করা কর্মকর্তা ছিলেন যারা মল্লিকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি নিজেও ভারত, হংকং ও চীনের ভাষা বিশেষজ্ঞের কাছ

থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তারা 'র'-কে বিরাটভাবে সার্ভিস দিয়ে গেছেন। আইবি'র প্রশিক্ষণ দেয়া সর্বশেষ কর্মকর্তা ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার পর যেসব চীন বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছেন তারাও ভালো। তবে তাদের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা হলো আইবি'র উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সাথে তাদের তুলনা চলে না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'র'-তে চীন বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য যে মানব ও বস্তুগত সম্পদের জোগান দেয়া হয় তা পাকিস্তান বিভাগের ধারেকাছেও ছিল না। ১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার পর থেকে এ সংস্থার প্রধান হিসেবে ১৬ জন নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের মধ্যে শুধু একজনকে (এন নরসিমান-১৯৯১ থেকে ৯৩ পর্যন্ত) চীন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চীনের ব্যাপারে এ ঘাটতি এখনো অব্যাহত রয়েছে। কারগিল রিভিউ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গোয়েন্দা উপায়-উপকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারত সরকার ২০০০ সালে যে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে তা পাকিস্তান ও কাউন্টার টেররিজমের সাথে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বাড়ানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। টাস্কফোর্স অর্থনৈতিক গোয়েন্দা বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বিধানের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়নি। এখন চীন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঘাটতিসমূহ দূর করার ব্যাপারে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এসেছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও চীনের সাথে জড়িত অপারেশনাল নীতিতে উদ্ভাবনী পরিবর্তন রাজিব গান্ধীরই অবদান। ইন্দিরা গান্ধী এসব পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। এসব নীতির উত্তরাধিকার পাওয়ার পর এগুলোকে আরও শাণিত এবং নতুন সৌকর্য দান করেন রাজিব গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের আগে যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে বলে রাজিব মনে করেছিলেন তা নিরসনের জন্য তিনি উদ্যোগ নেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত 'র'-এর আঘাত করার ক্ষমতা যেভাবে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল তাকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। তার চেষ্টায় শুধু গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণই নয়, অধিকন্তু যেখানে কূটনৈতিক নীতিপদ্ধতি পর্যাপ্ত বা ফলপ্রসূ বলে মনে না হবে সেসব প্রতিরক্ষা ও জাতীয় স্বার্থে প্রতিবেশী দেশগুলোতে গোপন অকূটনৈতিক উপায় উপকরণ ব্যবহারের সক্ষমতা আবার ১৯৭৭ সালের আগের শক্তিশালী অবস্থায় ফিরে যায়। সার্বিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাজিব গান্ধীর আমলে গোপন তৎপরতা চালানোর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। একইসাথে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কর্মকাণ্ড দেশ ও সময়ের প্রয়োজনে নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়।

রাজিব গান্ধী শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে অপারেশনাল নীতিতে উদ্ভাবনী পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তবে তার এ নীতি নানা ধরনের বিভ্রান্তি এবং সংশয়ও সৃষ্টি করে, যা ১৯৯১ সালের মে মাসে বিরোধীদলীয় নেতা থাকাকালে তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি এটাকে 'র'-এর নীতি না বলে সরকারের অপারেশনাল নীতি বলতে চাই। কারণ ভারত সরকারের নীতিকে শুধু একটি সংস্থা পরিবর্তন করতে পারে না,

এতে অনেক সংস্থারই ভূমিকা থাকে। আমাদের অপারেশনাল নীতিকে যিনি ব্যাখ্যা করতে যাবেন তিনি নানা ধরনের সংশয়ে পড়ে যাবেন। রাজিব গান্ধী এবং তার উত্তরসূরি ভিপি সিংয়ের সময় যেভাবে এই অপারেশনাল নীতিকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত কোনো সমীক্ষা হয়নি। একটি স্পর্শকাতর অপারেশন কিভাবে চালানো উচিত নয় তার একটি দৃষ্টান্ত ছিল এটি।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, রাজিব গান্ধী ক্ষমতায় বসার পরই পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মায়ের সূচিত অপারেশন নীতির বিচক্ষণতার দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে তিনি তামিলদের সমর্থনে ইন্দিরা গান্ধী গোপন তৎপরতার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা কেন নিয়েছিলেন এ ব্যাপারে সংশয়ে পড়েন। প্রথম দিকে ইন্দিরার এসব গোপন পদক্ষেপ জানাজানি হয়নি। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই নয়াদিল্লির একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে ভারতের নেয়া গোপন কার্যক্রমের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের অনেক কিছু অসত্য হলেও এর মধ্যে সত্যতাও কম ছিল না। ইন্দিরা সূচিত গোপন কার্যক্রম নীতির যথার্থতার ব্যাপারে যে যা-ই বলুক না কেন এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তিনি গোপন কার্যক্রম একটি একক সংস্থার মাধ্যমে চালানোর গুরুত্ব তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টত এই নীতির দু'টো পরিষ্কার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন– প্রথমত. ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ নিরসনে শ্রীলঙ্কা সরকার থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া; দ্বিতীয়ত. ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়ায় তামিলদের জন্য সমঝোতা আলোচনা করতে পারার মতো শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করা।

রাজিব গান্ধী প্রাথমিকভাবে তার মায়ের নীতি অনুসরণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। পরে তার সূচিত নীতির ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে পড়েন, যা শেষ পর্যন্ত বৈরী ফল এবং চূড়ান্তভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে। কেন তার মধ্যে এ পরিবর্তন ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা আমার কাছে কোনো দিন স্পষ্ট হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী তার অপারেশনাল নীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে এককভাবে 'র'-এর ওপর নির্ভর করতেন এবং তিনি কাও, সাক্সেনা ও পরলোকগত জি পার্থসারথী এ তিন জনের উপর দৃঢ় আস্থা রাখতেন। তারা ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশনাকে সতর্ক পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় বিন্যাসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতেন। ইন্দিরা তাদের পরামর্শ শুনতেন এবং গুরুত্ব দিতেন।

রাজিব গান্ধীর আমলে অপারেশনাল নীতি বাস্তবায়নে একক প্রভাবশালী কোনো সংস্থা ছিল না। রাজিব তার অতি উৎসাহমূলক নীতি বাস্তবায়ন করেন 'র', আইবি, তামিলনাড়ু পুলিশ, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএমআই), সেনাবাহিনী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে। বহুসংখ্যক সংস্থা ও ব্যক্তি দৃশ্যপটে ভূমিকা রাখে। এসব সংস্থা একে অপরের এখতিয়ারের মধ্যে গিয়েও পদক্ষেপ নেয়। এসবের মধ্যে সুসমন্বয়েরও অভাব লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এসব সংস্থার প্রধান ও শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা রাজিব গান্ধীর চিন্তা ও কর্মনির্দেশনাকে সতর্ক ও বাস্তবানুগ করার পরিবর্তে একে অপরকে প্ররোচিত করে একটার পর একটা অদূরদর্শী কাজ করার রাস্তা করে দেয়। নীতিনির্ধারকদের মধ্যে

সুসমন্বয়ের ব্যাপক অভাব ছিল। এ ক্ষেত্রে চিন্তা ও কাজের সমন্বয়সাধনের ফোরাম জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি (জেআইসি) তার কর্তব্য পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

ভারতের মদদ নিয়ে শ্রীলঙ্কার তামিল সংগঠনগুলো দেশটির সার্বিক তামিল স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে পড়ে। তারা নয়াদিল্লির বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় ও সংহতির মধ্যে বিদ্যমান ঘাটতির সুযোগ নিয়ে ভারতের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন সূত্র থেকে সহায়তা গ্রহণ করে। তারা শুধু সিংহলিদের বিরুদ্ধেই নয়, অধিকন্তু নিজেরাই এক উপদলের বিপরীতে অন্য উপদল শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করে।

তারা আইবি এবং ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দার অজান্তেই 'র' থেকে টাকা নেয়, আবার সামরিক গোয়েন্দা থেকে টাকা গ্রহণ করে 'র' অথবা আইবি'কে না জানিয়ে। একইসাথে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কোনোটাকেই না জানিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান গ্রহণ করে। তামিলনাড়ু পুলিশের কাছ থেকে টাকা নেয় তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে না জানিয়ে। তারা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নানা সহায়তা নিয়েছে আবার একইসাথে আইএসআই'র মদদপুষ্ট সংগঠন হরকত উল মুজাহেদীন, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়াসির আরাফাতের ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও), জর্জ হাবাসের পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের (পিএফএলপি) সহায়তা নিতে কোনো দ্বিধা করেনি।

লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এলটিটিই) নেতা প্রভাকরণ ১৯৮৭ সালে ইন্দো-শ্রীলঙ্কা চুক্তির আওতায় শ্রীলঙ্কার তামিল এলাকায় ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পর পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত প্রভাকরণকে এ প্রস্তাব গ্রহণে রাজি করানোর জন্য তার সম্পর্ককে কাজে লাগানোর কথা বলেন। ভদ্রতার সাথে এ প্রস্তাব 'না' করে দেয়ার পর রাজিব গান্ধী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন যে ইয়াসির আরাফাত কিভাবে প্রভাকরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হতেন। তদন্তে জানা যায়, নয়াদিল্লির ফিলিস্তিনি মিশনের মাধ্যমে পিএলও'র সাথে এলটিটিই গোপন সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সিনিয়র পিএলও কর্মকর্তারা এলটিটিই নেতাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গোপনে চেন্নাই সফর করেন।

এ সময় শুধু বহুসংখ্যক ভারতীয় সরকারি বিভাগ ও এজেন্সিই শ্রীলঙ্কার তামিলদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন না একইসাথে প্রভাকরণ ও অন্যান্য তামিল নেতার সাথে রাজিব গান্ধীর পক্ষ থেকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত আলোচকরাও গোপন আলোচনায় মিলিত হতেন। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন কী আলোচনা করছে সে সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। শ্রীলঙ্কার তামিল এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ভারতীয় শান্তিরক্ষী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত এবং ভারত নির্দেশিত শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণে তামিলদের বাধ্য করার উদ্যোগ নেয়ার সময় সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতি কী তা যাচাই-বাছাই করা হয়নি এবং বিদেশের মাটিতে অন্তর্ঘাত প্রতিহত করার জটিল অবস্থার বিষয়টিও নজরে আনা হয়নি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল নিজ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অন্তর্ঘাত প্রতিহত করার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাকে কাজে লাগানো যাবে শ্রীলঙ্কার তামিল এলাকায়। তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল সুন্দরজি অতি আস্থা ও উৎসাহের আতিশয্যে রাজিব গান্ধীকে বলেন, শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তিবাহিনীর কাজ শেষ করতে এক মাসের বেশি সময় লাগবে না। বাস্তবে যখন তা ঘটেনি এবং ভারতীয় শান্তিরক্ষীরা অনেক বড় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তখন জেনারেল সুন্দরজি এর দায়দায়িত্ব 'র'-এর ওপর চাপিয়ে বলেন, এ সংস্থা সেনাবাহিনীকে এলটিটিই'র ক্ষমতা সংহতি ও তাদের উদ্দীপনার ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করেনি। জেনারেল সুন্দরজিকে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির থেকে খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের বের করে আনার জন্য অপারেশন ব্লু স্টারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব পালনে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ার পর তখনও তিনি একইভাবে 'র'-এর ওপর দোষ চাপান এবং বলেন মন্দিরের অভ্যন্তরে শিখ খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের ক্ষমতা সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থা পর্যাপ্ত তথ্য ও ধারণা দেয়নি।

পরিচ্ছেদ : ষোল

ভিপি সিং এবং চন্দ্রশেখর

প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের আমলে ভার্মা এবং জিএম বাজপাই ছিলেন 'র'-প্রধান। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে রাজিব গান্ধী ভার্মাকে 'র'-প্রধান নিয়োগ করেন। ভিপি সিং ক্ষমতায় আসার পরও ১৯৯০ সালের ৩০ মে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পর রাজিব গান্ধীর নিয়োগ করা আইবি ও সিবিআই-প্রধানকে পদচ্যুত করে নিজের মনোনীত ব্যক্তিদ্বয়কে এ দুই পদে বসান। এ দুই পদে তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, রাজিব গান্ধী তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে অপব্যবহার এবং বফোর্স কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দেয়ার কাজে লাগিয়েছিলেন। এ সময় রাজিব গান্ধীর পূর্ণ আস্থাভাজন ভার্মাকেও একইভাবে ভিপি সিং 'র'-প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেবেন বলে ধারণা করা হয়। শুরুর দিকে 'র'-এর ব্যাপারে সরকারপ্রধানের কিছু ভুল ধারণা ছিল বলে মনে করা হয়। ভিপি সিং সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি সাঈদের মেয়ে রুবাইয়া সাঈদকে ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) জঙ্গিরা অপহরণ করার পর সৃষ্ট সঙ্কটের সমাধানের ব্যাপারে 'র'-কে তেমন একটা সম্পৃক্ত করা হয়নি। জঙ্গিরা রুবাইয়ার মুক্তির বিনিময়ে তাদের কয়েকজন সহযোগীকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ার দাবি জানান। জঙ্গিদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-তনয়ার মুক্তির বিনিময়ে দাবিকৃত জেকেএলএফ সহযোগীদের ছেড়ে দেয়া হয়। জঙ্গিদের দাবির কাছে এভাবে নতি স্বীকার করায় সরকারের দুর্বল ভাবমর্যাদা তৈরি হয় এবং কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এটিই ছিল মূলত রাজ্যটিতে ব্যাপকভিত্তিক সন্ত্রাসের সূচনা। আইএসআই'র মদদে এরপর দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে এখানে সহিংসতা চলে আসছে।

এরপর ১৯৯০ সালের এপ্রিলে জেকেএলএফ জঙ্গিরা শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মুশিরউল হক ও তার সেক্রেটারি আবদুল গণিকে অপহরণ করে তাদের আরও কয়েকজন সহযোগীর মুক্তির দাবি জানায়। ভিপি সিং সরকার এর আগে অপহরণকারীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করার ফলে সমালোচনার মুখে পড়ায় এবার নতুন নীতি গ্রহণ করেন এবং বন্দী জঙ্গিদের মুক্তি দানে অস্বীকৃতি

জানান। এতে অপহৃত দু'জনকেই হত্যা করা হয়।

এ ঘটনার পর সরকারের দ্বৈত নীতি নতুন সমালোচনার জন্ম দেয়। বলা হয়, আগেরবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্যা অপহৃত হওয়ার কারণে অপহরণকারীদের দাবি মেনে নিয়ে জঙ্গিদের মুক্তি দেয়া হয় আর এবার তাদের দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানানোয় দু'জন সাধারণ নাগরিক নির্মম হত্যার শিকার হলেন। দাফনের জন্য নিহত দুই ব্যক্তির লাশ নয়াদিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরাল ও রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে তারা নিহতদের সমবেত আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েন। দাফন অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিত থাকতে দিতে তারা অস্বীকৃতি জানান এবং দুই মন্ত্রী সেখানে অপদস্থ হন। পুলিশের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তারা সে স্থান ত্যাগ করেন।

যেকোনো কারণে ভিপি সিং এ দু'টি অপহরণের ঘটনায় সৃষ্ট সঙ্কট নিরসনে 'র'কে সম্পৃক্ত করেননি। এ দুই অপহরণের ঘটনা যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে, তা ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করে। 'র' সম্পৃক্ত না থাকায় এ সমালোচনা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

ভিপি সিং শুধু জম্মু ও কাশ্মীরেই নয়, একই সাথে পাঞ্জাবেরও চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে চেষ্টা করেন। খালিস্তানপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে সন্দেহভাজন সিমরঞ্জিত সিং মানের মতো ব্যক্তিকেও তিনি নমনীয়তা দেখান। ভিপি সিং'য়ের এই সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার নীতির কারণে পাঞ্জাবের পুলিশ প্রশাসনের নৈতিক মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। এত দিন তারা খালিস্তানপন্থী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন।

কাশ্মীর পরিস্থিতির পুরো সুযোগ গ্রহণ করে আইএসআই। কাশ্মীর থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তান অধিকৃত অংশে যাওয়া বিপুলসংখ্যক চরমপন্থী কাশ্মীরিকে তারা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে আবার কাশ্মীর উপত্যকায় অনুপ্রবেশে সহায়তা করে। পাকিস্তানের রেডিও ও টিভি স্টেশনগুলো জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলমানদের নিয়ে বিশেষ খবর ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে থাকে। জম্মু ও কাশ্মীরে সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটে, যখন বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া এবং রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি টেলিভিশন এসব উত্তাল বিক্ষোভের ভিডিওচিত্র প্রচার করে অধিকার আদায়ের জন্য একইভাবে রাজপথে নামতে কাশ্মীরিদের প্ররোচনা দেয়। কাশ্মীরিদের প্রতি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান সংবলিত হাজার হাজার ভিডিও ক্যাসেট কাশ্মীরে এনে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। কাশ্মীর উপত্যকার আদি বাসিন্দা হিন্দু পণ্ডিতদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে এবং তারা জম্মু ও দিল্লি পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

নতুন পরিস্থিতিতে ভিপি সিংকে সমর্থনদানকারী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জম্মু-কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে দুর্বলভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য সরকারের সমালোচনা করে। ভিপি সিং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালের মে মাসে তিনি সাবেক 'র'-প্রধান জি সি

সাক্সেনাকে জগমোহনের পরিবর্তে জম্মু ও কাশ্মীরের গভর্নর নিয়োগ করেন। সাক্সেনা এর আগে কেবিনেট সচিব বিনোদ পান্ডের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। সাক্সেনা আইএসআই'র বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'র'কে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন। তিনি 'র'কে পাকিস্তানে গোপন কার্যক্রম শুরু করতে বলেন। তিনি 'র' আইবি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পাল্টা 'মনোযুদ্ধ কমিটি' গঠন করেন। তিনি রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইএসআই'র প্রচারণার ব্যাপারে পাল্টা পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন এই কমিটিকে। ভারতীয় তথ্য সার্ভিসের এক কর্মকর্তাকে এ কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। তিনি এর আগে প্রেষণে 'র'তে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এই কমিটি জরুরিভাবে পাকিস্তানের রেডিও-টিভির প্রচারণা বন্ধ করতে বেতারপ্রবাহ ও সম্প্রচারে জ্যাম সৃষ্টির বিপুলসংখ্যক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য 'র'কে তহবিল প্রদানের সুপারিশ করেন এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) এসব জ্যামার চালানোর জন্য নির্দেশনা কামনা করেন। কমিটির সুপারিশে উত্তরাঞ্চলের গিলগিট ও বাল্টিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরিদের লক্ষ্য করে একটি মোবাইল ব্রডকাস্টিং স্টেশন স্থাপন করা হয়। চরমপন্থীরা কাশ্মীরে কলেজছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করলে কমিটির সুপারিশে সরকারি খরচে তাদের জম্মু নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের শুকনো ফলমূল, জাফরান ও স্থানীয় কুটিরশিল্প-সামগ্রী কিনতে কাশ্মীরে যেতে বাধা দিলে এসবের উৎপাদনকারীদের বিমানে দিল্লি নিয়ে গিয়ে সেখানে বিক্রির জন্য মেলার আয়োজন করে কমিটি। বিনোদ পান্ডে এ স্কিম বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেন 'র'-কে। 'র'-এর অপারেশনাল দক্ষতায় অভিভূত হয়ে নতুন সরকার সংস্থার সব ধরনের পাল্টা পদক্ষেপে সর্বোতভাবে সহায়তা প্রদান করে। কমিটির বিভিন্ন পদক্ষেপ নতুন গভর্নর সাক্সেনাকে গোয়েন্দা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ কার্যক্রম চাঙ্গা করে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মতো সময় এনে দেয়। সাক্সেনাকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পুরো পরিস্থিতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তার প্রতি সব দলেরই বিশেষভাবে কংগ্রেস আই ও রাজিব গান্ধীর প্রভূত আস্থা ছিল। সাক্সেনার পেশাদারিত্বের প্রতি রাজিব গান্ধীর উচ্চপর্যায়ের সম্মানবোধ ছিল।

এ সময় এক চরম বিতর্কিত পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন কেবিনেট সচিব বিনোদ পান্ডে। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সহায়তাপুষ্ট চরমপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য 'র' জম্মু এলাকায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) ক্যাডারদের সংঘটিত করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুক। এ প্রসঙ্গে জানা যায়, বিজেপি নেতা এল কে আদভানি এ ধারণার স্রষ্টা এবং তিনি দ্রুত আরএসএস ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ শুরু করার ব্যাপারে চাপ দিয়ে আসছিলেন সরকারকে। 'র' বিষয়টি কার্যকর করতে বেশ অস্বস্তি বোধ করে। পান্ডের চাপের মুখে আরএসএস'র জম্মু শাখার সাথে 'র' দু'টি গোপন বৈঠক করে। প্রথম বৈঠকটি হয় জম্মু হোটেলে আর দ্বিতীয়টির আয়োজন করা হয় দিল্লির হোটেল অ্যাম্বাসেডরে। এরপর বাবরি মসজিদের স্থানে

রাম মন্দির নির্মাণে জনসমর্থন আদায়ের জন্য অযোধ্যা অভিমুখে এল কে আদভানির রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভিপি সিংয়ের সাথে বিজেপি'র মতানৈক্য বেড়ে যায়। পান্ডে 'র'-কে এ প্রকল্প নিয়ে সামনে আর না এগোনোর পরামর্শ দেন এবং শেষ পর্যন্ত আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ আর শুরুই করা হয়নি।

ভিপি সিং এক দফা এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সেই এজেন্ডাটি ছিল– বফোর্স কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে রাজিব গান্ধীকে হেস্তনেস্ত করা এবং তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে চূড়ান্তভাবে শেষ করে দেয়া। হঠাৎ করে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস-সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায় তার এই এজেন্ডায় কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে। তবে জম্মু ও কাশ্মীর সঙ্কট নিয়ে তার ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজিব গান্ধী ও কংগ্রেস আই'র বিরুদ্ধে বফোর্স ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখা হয়। কেবিনেট সচিব বিনোদ পান্ডেকে এ কার্যক্রমে সমন্বয়কারী নিয়োগ করা হয়। বফোর্স আয়োজনে আইবি, 'র' সিবিআই, ইউরোপের একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা এবং বহু সাংবাদিক স্বেচ্ছায় তাদের সহায়তা দানে এগিয়ে আসে। বফোর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে এত আয়োজন সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কোনো ফল লাভ না হওয়ায় তিনি দৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেন। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়, তাদের কেউ কেউ এর প্রতিবাদে আত্মহননের চেষ্টা করে। যে সময়টাতে গোটা জাতির দৃষ্টি পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাস-সহিংসতা বন্ধের দিকে থাকার প্রয়োজন ছিল, তখন মণ্ডল কমিশন ইস্যুতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী অরুণ নেহরু ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র গ্রুপের মালিক রামনাথ গোয়েঙ্কার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আইনজীবী রাম জেটমালিনি ভিপি সিংয়ের কাছে অভিযোগ করেন যে, রাজিব গান্ধীর নির্দেশে 'র' তাদেরকে বিদেশ সফরের সময় গোপন নজরদারিতে রাখত। অরুণ নেহরু এক আধা সরকারি পত্রে লিখিতভাবে ভিপি সিংয়ের কাছে এ অভিযোগ করেন আর জেটমালিনি অভিযোগ করেন মৌখিকভাবে।

ভিপি সিংয়ের নির্দেশে বিনোদ পান্ডে 'র'কে অরুণ নেহরু ও জেটমালিনীর অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার নির্দেশ দেন। 'র' পান্ডেকে জানায় যে, অরুণ নেহরুর অভিযোগ সত্য ছিল না। তদন্তে দেখা যায় যে, নেহরু যুক্তরাজ্যে যাওয়ার পর লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনে কর্মরত একজন আইবি কর্মকর্তাকে তার তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য বলা হয়। আইবি'তে যাওয়ার আগে এই কর্মকর্তা কয়েক বছর 'র'তে কাজ করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যুক্তরাজ্যে অরুণ নেহরুর তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার জন্য যখন বলা হয় তখন তিনি 'র'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন না।

বিনোদ পান্ডেকে 'র' আরও জানায় যে, জেটমালিনী কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেছিল। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজিব গান্ধী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে

পাঠানো এই রিপোর্টটি ছিল মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণ ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক ভারতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এসব পত্রিকা তার সফরকে ব্যাপকভাবে কাভার করে। এর বাইরে তার বক্তৃতা-বিবৃতি থেকেও রিপোর্টের তথ্য নেয়া হয়। 'র' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এ সংক্রান্ত কয়েকটি রিপোর্টের কপিসহ সারসংক্ষেপ বিনোদ পান্ডের কাছে পৌঁছায়। 'র' বিনোদ পান্ডেকে আরও জানায় যে, জেটমালিনীকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা অথবা গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে তার কার্যক্রম যাচাইয়ের মতো কোনো কিছু করার অভিযোগ সত্য নয়।

বিনোদ পান্ডে 'র'-এর জবাব দেখেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে জেটমালিনীর সফর সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ ফাইলটি তার কাছে পাঠাতে বলেন 'র'কে। 'র' এ ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান নিয়ে বলে যে, শুধু প্রধানমন্ত্রীই 'র'-এর কাছে ফাইল চাইতে পারেন। ১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার পর থেকে এ বিষয়ে কোনো লিখিত আদেশ না থাকলেও কনভেনশন বা ঐতিহ্য হিসেবে এটি চলে আসছে। পান্ডে বিষয়টির ব্যাপারে আদেশের জন্য ভিপি সিংয়ের কাছে পাঠান। তিনি আদেশ দেন যে, 'র'-এর একজন কর্মকর্তা ফাইলটি পান্ডের কাছে নিয়ে যাবেন এবং ফাইলটি দেখার পর সাথে সাথেই ওই কর্মকর্তা তা ফেরত নিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। পান্ডে জেটমালিনীর বিষয়ে 'র'-এর জবাবে সন্তুষ্ট হন এবং বিষয়টির এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও কেবিনেট সচিবের 'র'-এর প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ফাইল দেখার অধিকারের বিষয়টি মাঝে মধ্যে উত্থাপিত হয়। একসময় 'র'-এর অবস্থান শুধু প্রধানমন্ত্রীই 'র'-এর প্রশাসনিক অপারেশনাল ফাইল দেখতে পারার পক্ষে ছিল। কোনো একসময় কেবিনেট সচিব 'র'-এর একজন সিনিয়র কর্মকর্তার পদোন্নতি সংক্রান্ত ফাইল না দেখে এ ব্যাপারে 'র'-প্রধানের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে কোনো 'র'-কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হলে কূটনীতিক হিসেবে তার সাফল্য মূল্যায়ন করেন সংশ্লিষ্ট মিশনের প্রধান। আর গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে তার সাফল্য মূল্যায়ন করেন 'র'-এর সদর দফতরের নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তারা। 'র'-কর্মকর্তাদের কাজকর্ম ও আচরণ নিয়ে মিশনের মূল্যায়নকে পদোন্নতির বিবেচনার সময় আমলে নেয়া হয় না। তাদের পদোন্নতির জন্য যোগ্য বিবেচনা করার বিষয়টি একান্তভাবেই 'র'-সদর দফতরের নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তার মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে। মিশন প্রধানের মূল্যায়ন এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হয় না। পদোন্নতির সময় মিশন প্রধানের মূল্যায়নকে আলাদা ফাইলে কেবিনেট সচিবের কাছে পাঠানো হয়। তাকে মিশন প্রধানের মূল্যায়ন রিপোর্ট দেখানোই হয় না। একজন কেবিনেট সচিব এ বিষয়টিকে একটি বড় ইস্যুতে পরিণত করেন। তিনি পদোন্নতির প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা মিশন প্রধানেরই হোক অথবা 'র' সদর দফতরের নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তারই হোক, সব মূল্যায়ন এক সাথে পেশ করা না হলে তা উপরে পাঠানো হবে না বলে জানিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত 'র' সংস্থার নিজস্ব মূল্যায়নের পাশাপাশি মিশন প্রধানের মূল্যায়নও একসাথে করে ফাইল

পাঠায়। জেটমালিনীর ক্ষেত্রে 'র'-এর অপারেশনাল ফাইল পর্যন্ত দেখতে কেবিনেট সচিব জেদ ধরেছিলেন। এ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং তার দেখার অধিকার মেনে নিয়েছিলেন, তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো সাধারণ আদেশ জারি করেননি।

নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর 'র'-প্রধান তার নিজস্ব বিবেচনা থেকে অপারেশনাল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো অতি স্পর্শকাতর ফাইলগুলোর কপিও কেবিনেট সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের কাছে পাঠানো শুরু করেন। তার এ কাজ শুরু করার পেছনে একটি যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন এর মাধ্যমে 'র'-এর অপারেশনাল সাফল্য সম্পর্কে এ দুই কর্মকর্তার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। একদিন রুশ বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ইয়েব গিনি প্রিমাকভ রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে 'র'-প্রধানের সাথে আলোচনার জন্য একটি অতি গোপন সফরে নয়াদিল্লি আসেন। তিনি একই সাথে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। প্রিমাকভের এই সফর সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর সব রিপোর্টের কপি তখনকার 'র'-প্রধান মুখ্য সচিবের কাছে মার্ক করে পাঠান। রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক সংক্রান্ত অতি গোপনীয় সফরের এ বিষয়ের বরাত দিয়ে নয়াদিল্লির একটি শীর্ষ দৈনিক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরে তদন্তে জানা যায়, মুখ্য সচিব পত্রিকাটির প্রতিবেদকের সাথে সফরটি নিয়ে কথা বলেছেন। বিষয়টি জানার পর প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও স্পর্শকাতর অপারেশনাল রিপোর্টের কপি কেবিনেট সচিব বা মুখ্য সচিবের কাছে না পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অটল বিহারি বাজপেয়ি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপটির আবার ব্যত্যয় ঘটে। তিনি অতি স্পর্শকাতর বিষয়ও দেখাশুনার জন্য তার মুখ্য সচিব ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রের কাছে ছেড়ে দিতেন। বাজপেয়ির মেয়াদকালে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের এই প্রশাসনিক প্রধান স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে যত কথা জানতেন অন্য কোনো মুখ্য সচিব ততটা জানতেন না। এ ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব হলো এর কোনো কিছুই ফাঁস হয়নি। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে 'র'-এর গোপনীয়তার বিষয়টি রক্ষা করতেন।

ভিপি সিংয়ের সময় ১৯৪৭ সালের পর থেকে প্রথমবারের মতো গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রমকে সংসদীয় কমিটির তদারকিতে আনার সময় এসেছে কি না তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। বিজেপি'র জশোবন্ত সিংয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের কমিটি গঠনের প্রথম প্রস্তাব আসে। ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে এবং নিজের অবৈধ কর্মকাণ্ড ঢাকা দিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন কিভাবে গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করেছেন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এর পর গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম তদারকির জন্য কিছু ক্ষমতা দেয়ার লক্ষ্যে সংস্কার আনতে কংগ্রেসের দুই কক্ষকেই এখতিয়ার দেয়া হয়। কংগ্রেসকে এই তদারকির ক্ষমতা দেয়ার পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থে সরকার প্রধানের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, একইসাথে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার যে উদ্দেশ্যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছে তাদের কার্যক্রমে এই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে কি না সেটা মূল্যায়নও এর

অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

ইসরাইলসহ অন্য অনেক দেশেই প্রাথমিকভাবে এ ধারণা সমালোচিত হয় কিন্তু পরে গোয়েন্দা কার্যক্রমের ওপর সংসদীয় তদারকির মার্কিন মডেল তারা গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশে গোয়েন্দা কার্যক্রম তদারকির জন্য কংগ্রেস বা সংসদ নিজেই কমিটি করে দেয় যাতে সংবিধান অনুযায়ী সরকার প্রধানের কিছু করার থাকে না। যুক্তরাজ্যসহ অন্য কয়েকটি দেশে সংসদীয় তদারকি কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে।

বর্তমানে ভারত পৃথিবীর একেবারেই হাতেগোনা কয়েকটি গণতান্ত্রিক দেশের একটি যেখানে গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম তদারকির দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা একান্তভাবেই সরকার প্রধানের হাতে রয়েছে। এখানে সংসদের দুই কক্ষের কোনোটারই গোয়েন্দা সংস্থার তদারকির ক্ষেত্রে কিছু করার নেই। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষেত্রে সীমিত তদারকির ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদীয় কমিটি রয়েছে কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষেত্রে তাও নেই। সাধারণের মধ্যে ধারণা হলো ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাদের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সংসদীয় তদারকির ধারণার বিরোধিতা করেন। বাস্তবে এটা ঠিক নয়। অন্তত 'র'-এর ক্ষেত্রে এ ধারণা যথার্থ নয়। আমি 'র'তে কর্মরত থাকাকালে সেটাই দেখেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই অপারেশনাল কাজগুলোতে সংসদীয় তদারকির বিরোধিতা করেছেন সত্য। তবে তারা নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, অপারেশন-বহির্ভূত ব্যয়নির্বাহ, ভ্রমণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংসদীয় তদারকির পক্ষে ছিলেন। তাদের কেউ কেউ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়নে সীমিত সংসদীয় তদারকি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার সীমিত বহিঃনিরীক্ষারও পক্ষে ছিলেন।

এ ধরনের তদারকির অনেক সুবিধা রয়েছে। এতে সংসদ সদস্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটে। এতে সংস্থার স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি প্রতিরোধ হয়। এর মাধ্যমে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে সরকার প্রধানের গোয়েন্দা সংস্থার অপব্যবহার বাধাপ্রাপ্ত হয়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ওপর অর্পিত জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখাও এটি নিশ্চিত করতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতে গোয়েন্দা সংস্থার ওপর সংসদীয় তদারকির বিরোধিতা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে বেশি এসেছে। এটি সম্ভবত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এই ভাবনা থেকে যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদারকিতে সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ এলে তাদের কর্তৃত্ব হুমকির মুখে পড়ে যাবে এবং দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে এজেন্সির অপব্যবহার সম্ভব হবে না।

জশোবন্ত সিংয়ের প্রস্তাবক্রমে ভিপি সিং গোয়েন্দা সংস্থার তদারকির জন্য সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বিনোদ পান্ডেকে নির্দেশ দিলে তিনি এ বিষয়ে আইবি এবং 'র'-এর মতামত চান। তখনকার 'র'-প্রধান জিএস বাজপাই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে

বৈঠকে বসেন। ব্যতিক্রম ছাড়াই সব কর্মকর্তা এ ধারণাকে সমর্থন করেন। বাজপাই পান্ডের কাছে কী ধরনের সুপারিশ পেশ করেছিলেন তা আমি জানি না। আইবি কী ধরনের মতামত এ ব্যাপারে দিয়েছিল তাও জানি না। তবে এ বিষয়টি নিয়ে চর্চার চূড়ান্ত ফলাফল কিছু দেখা যায়নি। ভিপি সিং ন্যাশনাল ফ্রন্ট কোয়ালিশনের অংশীদার দলগুলো থেকে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন এবং গোয়েন্দা সংস্থার তদারকি নিয়ে যেকোনো সংস্কারের ব্যাপারে তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

এখন সময় এসেছে এ বিষয়টি নতুন করে তোলার। জনমত রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদারকির একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করবে। এ ধরনের তদারকির ব্যবস্থা না থাকলে গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা নিজেরাই নিজেদের সাফল্য-ব্যর্থতা ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন করবেন। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের সাথে কার্গিল যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত 'র'-এর তথ্য ঘাটতি অথবা সিআইএ'র চর রবিন্দর সিংয়ের বিষয়টির মতো জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় কোনো সঙ্কট দেখা দিলে এ বিষয়টি দৃষ্টিতে আসে। সংসদ কার্গিল সঙ্ঘাত ও রবিন্দর সিংয়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জরুরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ বা এ নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনবোধ করেনি। রাজনৈতিক নেতৃত্বও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা বা কার্যকারিতার মতো একটি বড় বিষয়ে তেমন উদ্যোগী হয়নি। এটি নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। একটি পুরনো প্রবচন রয়েছে যে, সব দেশই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকে শুধু তাই পায় যা দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সেখানে বসানো হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরিই সত্যি।

ভিপি সিংয়ের আমলে সেনাবাহিনী বিদেশের ভারতীয় মিশনে তাদের নিজস্ব সোর্স নিয়োগের ইস্যুটি উত্থাপন করে। বিষয়টি সতর্কভাবে যাচাই-বাছাই করে ভিপি সিং ইন্দিরা গান্ধীর এ সম্পর্কিত পুরনো সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। ইন্দিরা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, সামরিক বাহিনীর জন্য সীমান্তের বাইরে থেকে কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু দেশের বাইরে কোনো গোপন বা কাভার পোস্টিং তাদের জন্য থাকবে না। ভিপি সিং ভারতীয় ভূখণ্ডের বাইরে সেনাবাহিনীর নিজস্ব সোর্স রাখার ব্যাপারে পূর্বসূরির আরওপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

একে ভার্মা ১৯৯০ সালের ৩১ মে 'র' প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ভার্মার এই তিন বছরে ১৯৬৮ সালে 'র' গঠিত হওয়ার পর কাওয়ের সময়ের মতো 'র' অপারেশনাল সক্ষমতা আবার ফিরে পায়। তিনি 'র'-এর মূল ভাবাদর্শে তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। সিআইএ'র পুরনো এক প্রবচন উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'ভার্মা ছিলেন ঝুঁকি গ্রহণকারী, ঝুঁকি কামনাকারী নন।' তিনি সেসব কর্মকর্তাকে পছন্দ করতেন যারা উদ্যোগী ছিলেন এবং মৌলিক চিন্তা করতেন আর রোমাঞ্চ ছাড়াই ঝুঁকি গ্রহণের সাহস রাখেন। তিনি 'র'-এর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গতানুগতিক মাঝারি মানের কাজ চাইতেন না এবং বারবার বৈরিতা দেখানো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এড়িয়ে চলতেন। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো কাজ দেখাতে পারতেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অর্জনে সক্ষম হতেন ততক্ষণ কে কী বলল তার পরোয়া করতেন না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার সময় আইবি এবং ডিরেক্টরেট

জেনারেল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বা সামরিক গোয়েন্দার সাথে 'র'-এর সম্পর্ক ভালো ছিল না। এ অম্ল সম্পর্ক এজেন্সিগুলোর কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে। রাজিব গান্ধী দৃশ্যত এটি বুঝতে পেরে সমন্বয় বাড়ানোর পরামর্শ দিতেন। তিনি চাইতেন 'র'-এর একজন কর্মকর্তা আইবি'র পরিচালকের স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করবেন আর একইভাবে আইবি'র একজন কর্মকর্তা 'র' প্রধানের স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করবেন। একই ধরনের ব্যবস্থা তিনি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগেও চাইতেন। ভার্মা এর সাথে একমত হন কিন্তু আইবি এবং সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এর বিরোধিতা আসে। শেষ পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন আর শুরু করা যায়নি।

ভার্মার পর 'র'-প্রধানের দায়িত্ব নেন উত্তর প্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা জিএম বাজপাই। তিনি ১৯৬৮ সালে 'র' গঠনের আগে আইবি'তে কর্মরত ছিলেন। জেনেভা ও নিউইয়র্কে 'র'-এর স্টেশন চিফ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভৌত নিরাপত্তা এবং বিদেশের ভারতীয় মিশনগুলোর নিরাপত্তা সেটআপের প্রধান হিসেবেও অনেক বছর কাজ করেন। তিনি খালিস্তানি বিমান ছিনতাইকারীদের বহিষ্কার ও ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পশ্চিম এশিয়ার সংযুক্ত আরব আমিরাতে পররাষ্ট্র সচিব রমেশ ভান্ডারির সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'র'-প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে ভার্মা নিরাপত্তাবিষয়ক সচিব হিসেবে ভারত সরকারের যৌথ গোয়েন্দা কমিটির (জেআইসি) চেয়ারম্যান ছিলেন। সচিব (নিরাপত্তা) হিসেবে তিনি ভিপি সিংয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি ভিপি সিংয়ের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখরের অধীনেও ১৪ মাস 'র' প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উভয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে চমৎকার সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের আস্থা অর্জন করেন।

বাজপাই প্রধান থাকাকালে 'র'-এর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি আসে। ১৯৬৮ সালের পর মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ছিল 'র'-এর একটি দুর্বল দিক। কাওসহ বাজপাইয়ের আগ পর্যন্ত সব 'র' প্রধান সংস্থাটিতে এক অভিজাত সংস্কৃতি সৃষ্টি করেন। তারা নিজেদের আইভরি টাওয়ারে রাখতে পছন্দ করতেন এবং তাদের আলাপ-আলোচনা সীমিত থাকত কর্মকর্তা শ্রেণীর মধ্যে। বিভিন্ন ক্যাডারের জুনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে তারা কদাচিৎ কথাবার্তা বলতেন। ফলে জুনিয়র কর্মকর্তাদের কাছে তারা অধরাই থেকে যেতেন। আমি চাকরিতে থাকাকালে বাজপাই প্রথম 'র' প্রধান যিনি এই অভিজাত সংস্কৃতি ভেঙে দিয়ে আইভরি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সব স্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তা তার কাছে যেতে পারতেন। জম্মু ও কাশ্মীরের অবনতিশীল অবস্থা এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সঙ্কটের কারণে তাকেও খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। এরপরও তিনি সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বঞ্চনা, ক্ষোভ ও সমস্যার কথা শুনতে সময় বের করে নিতেন। তার সময় প্রথমবারের মতো 'র'-এর ইতিহাসে স্টাফদের নৈতিক মনোবল ছিল অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে। আমার অবসর গ্রহণের পর কর্মরত

কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমি শুনেছি বাজপাইয়ের পর অন্য একজন 'র' প্রধান ছিলেন এ এস দুলত যিনি স্টাফদের সমস্যার কথা শুনতেন এবং তাদের কাছে সহজলভ্য ছিলেন। আইবি'র এই কর্মকর্তা ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সালের শুরু পর্যন্ত 'র' প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্যাডার ও জ্যেষ্ঠতা নির্বিশেষে একটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মচারীদের অত্যন্ত জটিল এক পরিবেশে কাজ করতে হয়। তারা নিজেদের বঞ্চনা বা ক্ষোভের কথা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন অথবা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনকে জানানোর সুযোগ পান না। যদি সংস্থার প্রধানই তাদের কথা না শোনেন অথবা তাদের সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ না নেন বা সহায়তা না করেন তাহলে পৃথিবীতে এ ব্যাপারে তাদের সহায়তাকারী আর কেউ থাকে না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'র'-এর ৪০ বছরের ইতিহাসে মাত্র দু'জন প্রধান সংস্থার সব সদস্যের কথা শোনা ও তাদের অনুভূতির সাথে একাত্ম হওয়া এবং তাদের মতামতকে মূল্য দেয়ার মানসিকতা পোষণ করতেন। বাজপাইয়ের মেয়াদকালে সংস্থার জন্য খুবই ক্ষতিকর বেনামী অভিযোগ এবং গণমাধ্যমে কলাম লেখার মাধ্যমে ক্ষোভ ও বঞ্চনার প্রকাশ ঘটানোর দৃষ্টান্ত একেবারেই কমে আসে। বাজপাইয়ের আরও একটি ইতিবাচক দিক ছিল তার সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এবং আইবি'র সাথে 'র'-এর সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটে। এসব সংস্থাই 'র'-এর সহায়তা গ্রহণ করতো এবং তার রিপোর্টের প্রধান গ্রাহক ছিল।

বাজপাই পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ উদ্যোগ নেয়ার পর বেনজিরের সাথে দেশটির সেনাবাহিনী ও আইএসআই'র সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে শুরু করে। সেনাবাহিনী ও আইএসআই প্রচারণা শুরু করে যে, বেনজির 'র'-এর এজেন্ট। খালিস্তান আন্দোলনকারীদের সহায়তা বন্ধ করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বেনজির বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সেনাবাহিনী ও আইএসআই'র প্রিয়ভাজন পাঞ্জাবের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সাথে বেনজিরের সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। তখনকার পাকিস্তানি সেনাপ্রধান জেনারেল মির্জা আসলাম বেগ ও জেনারেল হামিদ গুলের অভিযোগের মুখে বেনজির ভুট্টো রক্ষণশীল অবস্থানে চলে যান। এই বিব্রতকর অবস্থায় তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে আইএসআই'র মাধ্যমে জিহাদিদের মদদ দিতে শুরু করেন এবং কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গোপন তৎপরতায় ইন্ধন দেন। তার এসব কাজেও শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি। জেনারেল আসলাম বেগ ও হামিদ গুলের প্ররোচনায় ১৯৯০ সালের আগস্টে প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান বেনজিরকে বরখাস্ত করেন। বেনজিরকে বরখাস্তের পর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরে যুদ্ধ পরিচালনায় আইএসআইকে সর্বোত ক্ষমতা দেন।

এর ফলে বাজপাই 'র' প্রধানের দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম দিকটাতে জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভারতের অন্য অংশে আইএসআই'র তৎপরতা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য

সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং 'র'-এর গোপন তৎপরতা শাখার কার্যক্রম চাঙ্গা রাখতে সময় চলে যায়। বাজপাই ভারতের প্রতি তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী পাকিস্তানের রাজনীতিক এবং সুশীল সমাজের লোকদের মধ্যকার নেটওয়ার্ককে জোরদার করার পদক্ষেপ নেন। প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং তার ন্যাশনাল ফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের অংশীদারদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট নানা সঙ্কট মোকাবেলায় অধিক মনোযোগী হওয়ার কারণে জম্মু ও কাশ্মীরের অবনতিশীল পরিস্থিতি এবং সেখানে সৃষ্ট পাকিস্তান ও আইএসআই'র হুমকির প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিতে পারেননি। ভিপি সিং তার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম পর্যায়ে রাজনৈতিক ঝুটঝামেলা কম থাকার সময় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি যতটা নজর দিতে পেরেছিলেন শেষার্ধে তা আর দেখা যায়নি। এরপরও জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি। এর কৃতিত্ব বহুলাংশে নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রাপ্য। তারা এ সময় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও নির্দেশনা ছাড়াই নিজস্ব বিবেচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন।

১৯৯০ সালের ১০ নভেম্বর কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থনে ভিপি সিংয়ের উত্তরসূরি চন্দ্র শেখর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে ভালোরকম উন্নতি ঘটে। ক্ষমতা গ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমলাতন্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর প্রধানদের জন্য ছিলেন বেশ সহজলভ্য এবং জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুগুলোতে পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা দানে ছিলেন স্বচ্ছ ও দ্বিধাহীন। চন্দ্র শেখর গোয়েন্দা প্রধানদের মূল্যবান পরামর্শ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন দৃঢ়তার সাথে। তিনি বাজপাইকে বেশ চাঙ্গা রাখেন এবং যেকোনো জাতীয় ইস্যুতে তার পরামর্শ নিতে দ্বিধা করতেন না।

চন্দ্র শেখর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৯০ সালের আগস্টে ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে উপসাগরীয় এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়। কুয়েতে ইরাকি আগ্রাসনের শিকার ভারতীয় নাগরিকদের উদ্ধারের ব্যাপারে 'র'-এর তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব হিসেবে নিযুক্ত আইবি কর্মকর্তা রতন শেগাল এ বিষয়টি ভালোভাবে দেখাশোনা করেন।

'র' দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ ব্যাপারে ধারণা বিনিময়ের জন্য 'র' চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। এ সময় সাদ্দাম সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবিদার চন্দ্র শেখর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ইরাকি প্রেসিডেন্ট ভারতীয় জ্বালানি চাহিদা মেটাতে চান এ মর্মে একটি প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন। এ মন্ত্রী চন্দ্র শেখরের কাছে পরামর্শ রাখেন যে, প্রধানমন্ত্রী 'র'-এর একজন কর্মকর্তাকে সাদ্দামের এই ব্যক্তিগত প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক যাচাই-বাছাই করার জন্য নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এ প্রস্তাবটি বেশ বিব্রতকর প্রমাণিত হয় এবং তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুই করা হয়নি। এ সময় ইরাকি নেতৃত্বে ওই মন্ত্রীর প্রবেশাধিকারের

যথার্থতা নিয়েই সংশয় দেখা দেয়।

কুয়েতকে মুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কোয়ালিশন উদ্যোগ জোরালো হলে এবং যুদ্ধ নিশ্চিত সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছলে ভারত সরকার গোপনে প্যাসিফিক কমান্ড থেকে উপসাগরীয় লক্ষ্যবস্তুগামী বিমানগুলোকে জ্বালানি ভরণ ও অন্যান্য সুবিধা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে। একটি ভারতীয় সংবাদপত্রে ভারতের এক বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ মার্কিন বিমানের ছবিসহ বিবরণী প্রকাশ করলে এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যুদ্ধ চলাকালে চন্দ্র শেখর প্রথমবারের মতো 'র'-এর সদর দফতর পরিদর্শন করেন। তিনি 'র'-এর পদস্থ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে উপসাগরীয় যুদ্ধের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তার হালকা রস মেশানো চমৎকার বক্তব্য 'র'-কর্মকর্তাদের বিমোহিত করে এবং প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বিষয় সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটে।

উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে চীনা ইন্টেলিজেন্সের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল 'র'-এর আমন্ত্রণে আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে দু'সংস্থার মধ্যে নিয়মিত আলোচনার জন্য ভারত সফরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সফররত প্রতিনিধিদল এবং 'র'-এর আলোচনাকারীদের সাথে 'র'-এর অতিথি ভবনে এক মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন। এ মধ্যাহ্নভোজ সভার আগে চন্দ্রশেখরকে চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে 'র'-এর লিয়াজোঁ সৃষ্টি এবং এর বিবর্তন সম্পর্কে সংস্থার পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়। চন্দ্র শেখর এ সম্পর্ক স্থাপনে কাওয়ের উদ্যোগের এবং এটাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য সাক্সেনা ও তার উত্তরসূরিদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চীনা এক্সটারনাল ইন্টেলিজেন্সের আমন্ত্রণে বাজপাই চীন সফরে যান। তার স্ত্রীও বাজপাইয়ের সফরসঙ্গী হন। স্টাফ অফিসার হিসেবে আমাকেও তিনি সাথে নিয়ে যান। চীনা গোয়েন্দা প্রধান ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ছাড়াও চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেংয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন বাজপাই ও তার স্ত্রী। এটি চীনা নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের ওপর চমৎকার প্রভাব ফেলে। তারা উভয়ে খোলামেলা ও হৃদ্যতার সাথে সবার সাথে কথা বলেন। প্রকৃতিগতভাবে বাজপাইয়ের উষ্ণ ও আন্তরিক আচরণ 'র'-এর সাথে লিয়াজোঁ সম্পর্ক রয়েছে এমন অন্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে যেমন ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে তেমনিভাবে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথেও তার সময় ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। বাজপাই কখনও সম্পর্কের সেতু বিচ্ছিন্নকারী ছিলেন না, ছিলেন সেতুবন্ধ রচনাকারী। এ ধরনের বেশি বেশি কর্মকর্তার প্রয়োজন রয়েছে 'র'তে।

আফগানিস্তানে ভারতের প্রতি বন্ধুবৎসল প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর সরকার সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পরও বিস্ময়করভাবে স্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের শুরুতে নজিবুল্লাহর বাহিনী আফগান মুজাহিদ, ওসামা বিন লাদেনের আরব অনুসারী এবং পাকিস্তানের সাবেক কর্মচারীদের সমন্বিত যৌথ বাহিনীকে

জালালাবাদে একটি আফগান সেনাচৌকি দখল প্রচেষ্টায় পিছু হটতে বাধ্য করে। সংখ্যায় বিপুল ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও আফগান সেনারা ব্যাপক ক্ষতিসহ সাফল্যের সাথে হামলাকারী যৌথ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।

জালালাবাদের এই বিপর্যয়ের আগেও আফগানিস্তানে পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়নে আইএসআই'র প্রচেষ্টা নিয়ে আফগান মুজাহিদ শিবিরগুলোতে মতানৈক্যের খবর পাওয়া যায়। জালালাবাদে বিপর্যয়ের পর তাদের মতানৈক্য আরও বেড়ে যায়। ভারতের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ও একজন প্রভাবশালী মুজাহিদ নেতা লন্ডনে 'র' প্রধানের সাথে এক বৈঠকের প্রস্তাব দেন। চন্দ্র শেখরের অনুমতি নিয়ে বাজপাই লন্ডন গমন করেন এবং তার সাথে বৈঠক শেষ করেই দিল্লি ফিরে আসেন। এটিই ছিল আইএসআই'র ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মুজাহিদ নেতাদের সাথে ভারতের যোগাযোগের সূচনা।

আফগান মুজাহিদ নেতাদের ওপর কড়া নজর রাখা ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা মুজাহিদ নেতার সাথে বাজপাইয়ের বৈঠকের কথা জানতে পারে। বাজপাইয়ের অবসর গ্রহণের পর তার নাম উল্লেখ না করে মুজাহিদ নেতার সাথে এ বৈঠকের তীব্র সমালোচনা করে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের এ ক্ষোভের কারণ বৈঠক অনুষ্ঠান নিয়ে ছিল না, ছিল বৈঠক সম্পর্কে আগে না জানানোর কারণে। এটি হলো পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অনুসৃত দ্বৈত নীতিরই একটি দৃষ্টান্ত। নয়াদিল্লিতে তাদের কর্মকর্তারা 'র'কে অবহিত না করেই নাজিবুল্লাহর সমালোচকদের সাথে গোপনে বৈঠক করেন অথচ লন্ডনে 'র'-এর বৈঠকের ব্যাপারে ভিন্নভাবে কথা বলছেন। আফগানিস্তানের উজবেক নেতা রশিদ দোস্তাম মেডিক্যাল চেক আপের লক্ষ্যে ভারতীয় সেনা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসার পর দিল্লিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা গোপনে তার সাথে বৈঠক করেন এবং তাকে নজিবুল্লাহর সেনাবাহিনী ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে নজিবুল্লাহর পতন ডেকে আনে জেনারেল রশিদ দোস্তামের আফগান সেনাবাহিনী ত্যাগ। তারা নজিবুল্লাহর সমালোচকদের সাথে বৈঠক করার ব্যাপারে 'র' অথবা আইবি'কে কোনো সময় অবহিত করে না কিন্তু লন্ডনে পাকিস্তানবিরোধী মুজাহিদ নেতার সাথে বাজপাইয়ের বৈঠকের ব্যাপারে তারা প্রতিবাদ ও ক্ষোভের কথা জানিয়েছে। আমরা তাদের এই দ্বৈত নীতির জবাব দিয়েছিলাম মিষ্টিভাবে এবং ঘটনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটে।

চন্দ্র শেখর সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে রাজিব গান্ধী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা এর আগে কংগ্রেসে (আই) ছিলেন। শুক্লার মাধ্যমে রাজিব গান্ধী সিয়াচেন ইস্যু নিয়ে জর্দানের যুবরাজ হাসানের উদ্যোগে এর আগে অনুষ্ঠিত 'র' এবং আইএসআই'র শীর্ষ বৈঠক এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে চন্দ্র শেখরকে অবহিত করেন। তিনি সন্ত্রাসবাদ ও সিয়াচেন ইস্যুতে এ সংলাপকে পুনরুজ্জীবিত করে এটাকে এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন। চন্দ্র শেখর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কাছে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে মালদ্বীপে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সময় সাক্ষাৎ করার কথা জানান। নওয়াজ শরিফ নয়াদিল্লিতে অবস্থানরত পাকিস্তান হাইকমিশনের এক

কর্মকর্তার মাধ্যমে এর জবাবে বলেন, আইএসআই'র কাছে এ সম্পর্কিত কোনো কাগজপত্র নেই। পরে হামিদ গুলের সাথে যোগাযোগ করা হলে এ ইস্যু নিয়ে ভার্মার সাথে কোনো আলোচনা করার কথা তিনি অস্বীকার করেন। 'র' তার রেকর্ডপত্র থেকে হামিদ গুল ও ভার্মার মধ্যকার দু'দফা আলোচনার সারসংক্ষেপ তৈরি করেন। চন্দ্র শেখর এটি নওয়াজ শরিফের কাছে পাঠান। চন্দ্র শেখর হামিদ গুলের অস্বীকৃতির কারণে কোনো সংশয় সৃষ্টি হলে বৈঠকের উদ্যোক্তা যুবরাজ হাসানের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়া হয় এতে।

সংলাপ নতুন করে শুরু করার জন্য ১৯৯১ সালের প্রারম্ভে 'র' প্রধান বাজপাই ও আইএসআই'র তদানীন্তন মহাপরিচালক লে. জেনারেল আসাদ দুররানির মধ্যে সিঙ্গাপুরের এক হোটেলে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে নওয়াজ শরিফ সম্মত হন। দুররানি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত হোটেলেই এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে বলে জোরের সাথে বলেন এবং দুই প্রধান একই হোটেলে অবস্থান করবেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন, আলোচনা বাজপাইয়ের কক্ষের পরিবর্তে তার কক্ষে হলেই ভালো হবে। দৃশ্যত মনে হচ্ছিল 'র' যাতে গোপনে আলোচনা রেকর্ড করতে না পারে তিনি তাই এমনটি চাচ্ছিলেন। 'র' দুররানির উভয় পরামর্শই মেনে নেয়। কিন্তু তারপরও এখানে ফলপ্রসূ কোনো আলোচনাই বলতে গেলে হয়নি। জেনারেল দুররানি অভিযোগ করেন 'র' সিন্ধি জাতীয়তাবাদীদের প্ররোচিত করছে এবং একই সাথে তিনি পাঞ্জাবে খালিস্তানিদের এবং জম্মু ও কাশ্মীরে জিহাদিদের সহায়তা দেয়ার কথা অস্বীকার করেন। গুলের মতো তিনি সিয়াচেন ইস্যুতে কার্যকর আলোচনা না করে বরং বিষয়টি এড়িয়ে যান। এ সংলাপটি ছিল অনেকটা বদ্ধ মনোভাবের আলোচনা। এরপর সংলাপের আয়োজন সামনে এগোয়নি। উভয়ের সাথে আলোচনার পর যে কারো ধারণা হতে পারে হামিদ গুল ছিলেন একজন উঁচুমানের পেশাদার ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা। অন্যদিকে দুররানির মধ্যে পেশাদারিত্ব ও আত্মবিশ্বাসের বেশ ঘাটতি রয়েছে।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ হাভানায় জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের সময় সন্ত্রাস প্রতিরোধে সম্ভাব্য দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি যৌথ সন্ত্রাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হন। একইসাথে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম তদন্তে পরস্পরকে আইনি সহায়তা দানে একমত হন। ২০০৭ সালের ৬ ও ৭ মার্চ এই ফোরামের প্রথম বৈঠক হয় ইসলামাবাদে।

নানা কারণে আমি এই প্রক্রিয়ার কড়া সমালোচক। জিহাদিদের তৎপরতার সাধারণ শিকার ভারত ও পাকিস্তান– এ ধারণার সাথে আমি একমত নই এবং মনে করি যে এটি ভুল ধারণা। জম্মু ও কাশ্মীরের স্থিতাবস্থা ধ্বংস এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন করতে আইএসআই জিহাদি সংগঠনগুলোকে মদদ দিচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান শিয়াবিরোধী সন্ত্রাসের শিকার। এর উদ্যোক্তারা শিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করে পাকিস্তানকে সুন্নি রাষ্ট্র ঘোষণা

করতে চায়। ভারতে এসব সংগঠন সক্রিয়ও নয় এবং তারা আইএসআই'র মদদও পায় না। পাকিস্তান তার মার্কিনমুখী নীতির কারণে আল কায়েদার তৎপরতারও শিকার। আল কায়েদার ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্যান ইসলামিক আন্দোলনের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের কোনো সমর্থন নেই।

পাকিস্তান তার নিজের সৃষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সততার সাথে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে না। এ ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রক্রিয়া তৈরির চেষ্টা বৈরী ফলই নিয়ে আসবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে তা উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে তিক্ততা বয়ে আনবে। পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যা ব্যবহার করছে তা হলো পুরনো ও ক্লাসিক সন্ত্রাসবাদ যা বিভিন্ন দেশ বৈরীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ক্লাসিক বা চিরন্তন সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে সবসময় বিষয়টিকে একটি বিশেষ মাত্রায় রাজনীতিকরণ করা হয়, যা দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮৫ সালের জুনে কানিষ্কা ট্র্যাজেডির আগে খালিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা গোয়েন্দারা আমাদের কার্যকর সহায়তা দেয়নি। ১৯৯৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে আল ফারান কর্তৃক কিছু পশ্চিমা পর্যটককে অপহরণ করার আগপর্যন্ত জিহাদিদের বিরুদ্ধে তারা সহযোগিতা দেয়নি। ক্লাসিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা পাওয়া বন্ধুপ্রতীম দেশগুলো থেকেই যেখানে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে একটি বৈরী দেশের পক্ষ থেকে এ ধরনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়ার আশা কিভাবে করা যেতে পারে?

অবশ্য ১১ সেপ্টেম্বরের পরে সন্ত্রাসবাদকে রাজনীতিকরণের প্রশ্নে কিছু পরিবর্তন এসেছে। সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞরা এটাকে নিও টেররিজম বা নব্য সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর মধ্যে তিনটি ধরন রয়েছে। এগুলো হলো সামুদ্রিক সন্ত্রাসবাদ, নব্য সন্ত্রাসবাদ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রসংশিষ্ট সন্ত্রাসবাদ। এ তিনের একটি নব্য সন্ত্রাসবাদ যদি ভারত বা পাকিস্তানে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে দু'দেশই সমভাবে এর শিকার হবে। এর ফলে ব্যাপক প্রাণক্ষয়, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দেবে। আল কায়েদার মতো সংগঠন নব্য সন্ত্রাসবাদের প্রচার করছে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা পাকিস্তানের মতো ভারতের জন্যও বিপজ্জনক। এই নব্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যেকোনো অর্থবহ সহযোগিতার জন্য যৌথ কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগও কার্যকর হতে পারে এবং পুরনো সন্ত্রাসবাদে এ ধরনের উদ্যোগ কার্যকর হবে না, অন্ততপক্ষে স্বল্প মেয়াদে তো নয়ই।

অবসর গ্রহণের পর আমি 'র' এবং আইএসআই'র মধ্যে লিয়াজোঁ নেটওয়ার্কের প্রয়োজনের ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক নানা দিক নিয়ে লিখেছি। কাউন্টার টেররিজম মেকানিজমের সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। লিয়াজোঁ নেটওয়ার্কিং থাকলে দু'দেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের বন্ধুত্ব বা বৈরিতা যেকোনো অবস্থাতেই শুধু গণমাধ্যমে একে অন্যকে চেনার পরিবর্তে খাবার বা পানীয় গ্রহণ করতে করতে একে অন্যকে চেনা বা পরিমাপ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি নিজেই একটি আস্থা তৈরির উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক এজেন্ডা ছাড়াই এবং সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বর্তমান ও রেফারেন্স নোট ছাড়াই যে কেউ বসতে পারেন। স্বস্তিকর পর্যায়ে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে পরে ধীরেসুস্থে সুনির্দিষ্ট এজেন্ডার দিকে যাওয়া যাবে।

১৯৪৭ সালের পর থেকে কমনওয়েলথভুক্ত সব দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে আমাদের এরকম লিয়াজোঁ সম্পর্ক রয়েছে। ভালোমন্দ সবসময়ে আমাদের সাথে চীনা গোয়েন্দা সংস্থার লিয়াজোঁ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনামলেও সে দেশের সাথে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে একটি গোয়েন্দা লিয়াজোঁ গড়ে তোলার কথা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে রাজিব গান্ধী বলেছিলেন, যাতে এ সম্পর্ককে যথাসম্ভব দ্রুত বর্ণবাদী শাসনের অবসানের কাজে লাগানো যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পর ৬০ বছর পেরিয়ে গেলেও ভারত বা পাকিস্তান কোনো দেশই লিয়াজোঁ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তা করেনি। এখন সময় এসেছে এ ব্যাপারে চিন্তা করার। দীর্ঘ মেয়াদে এটি যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী মোকানিজমের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে।

পরিচ্ছেদ : সতের

রাজিব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড

আমার অবসর গ্রহণ এবং চেন্নাইয়ে বসবাস শুরু করার কয়েক মাস পর জেনেভায় আমার উত্তরসূরি এবং পরে 'র' সদর দফতরের শ্রীলঙ্কা শাখার প্রধান পরলোকগত এস এ সুবিয়াহ্ আমাকে দিল্লি থেকে ফোন করেন। তিনি বলেন, দিল্লি থেকে তিনি চেন্নাই আসছেন বিশেষভাবে আমার সাথে এলটিটিই নিয়ে কথা বলার জন্য। আমি তাকে জানাই যে, তিনি 'র'-এর যে অতিথি ভবনে থাকবেন, সেখানে গিয়ে আমি দেখা করব।

সুবিয়াহ'র আগমনের পর আমি সেই অতিথি ভবনে যাই। তিনি আমাকে বলেন, 'স্যার আমি আপনার সাথে দু'টি কারণে দেখা করতে এসেছি। প্রথমত, সংস্থার সুনাম রক্ষার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এলটিটিই'র হাতে রাজিব গান্ধী নিহত হওয়ার ঘটনার ব্যাপারে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জে এস ভার্মার এক সদস্যের তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে নিরাপত্তা ব্যর্থতার দায় থেকে 'র' বহুলাংশে অব্যাহতি পেয়েছে। ভিপি সিং-এর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তা হুমকির ব্যাপক শঙ্কা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন বিনোদ পান্ডের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে রিপোর্টে আপনি বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংয়ের চেয়েও বিরোধীদলীয় নেতা রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তা ঝুঁকি অনেক বেশি। সেখানে আপনি আরও বলেন যে, রাজিব গান্ধীর প্রতি মূল হুমকি আসতে পারে উত্তরের খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে আর দক্ষিণের শ্রীলঙ্কান তামিল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো থেকে। এর পর বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে একটি আন্তঃবিভাগীয় সভা হয়। সেখানে আপনি জোর দিয়ে বলেন, রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রটেকশন গার্ডকে (এসপিজি) বহাল রাখা উচিত। স্যার, দ্বিতীয় কারণটি হলো– আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি এটি জানতে যে, কোন সূত্র আপনাকে এ তথ্য দিয়েছে এবং কোন ব্যক্তি বলেছে, শ্রীলঙ্কার তামিল সন্ত্রাসী সংগঠনের পক্ষ থেকেই রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তা হুমকি আসতে পারে। আমরা জানতে পেরেছি, রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেও আপনি একই আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। আমরা আপনার সেই সূত্রের সাথে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করতে চাই। কেননা, সে ব্যক্তিটি এব্যাপারে অত্যন্ত

ওয়াকেবহাল। কিন্তু আপনার রেখে যাওয়া কোনো ফাইলেই সূত্র সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন পাইনি।

আমি সুবিয়াহকে বলি যে, রাজিব গান্ধীর জীবনের ওপর তামিল হামলার সম্ভাব্য হুমকির বিষয়টি আমি কোনো সূত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে করিনি। আমি জেনেভা থেকে ফেরার পর ১৯৮৭ সালে ইন্দো-শ্রীলঙ্কা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর রাজিব গান্ধী ও তার উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে যে ধরনের আচরণের শিকার হয়েছেন তাতে কিছু তামিল সংগঠন বিশেষত প্রভাকরণের নেতৃত্বাধীন এলটিটিই খুবই নিগৃহীত ও ক্ষুব্ধ হয়। শ্রীলঙ্কার তামিল এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য পাঠানো ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর হাতে শ্রীলঙ্কার তামিলরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে বলেও তাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে।

আমি সুবিয়াহকে আরও বলি যে, 'র'-এর চেন্নাই অফিসের বারংবার সতর্কবাণীর দ্বারাও আমার ধারণা প্রভাবিত হয়েছে। এই অফিস থেকে রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেও শ্রীলঙ্কার তামিলদের পক্ষ থেকে তার জীবনের ব্যাপারে হুমকি আসতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। 'র'-এর চেন্নাই অফিসের তখন প্রধান ছিলেন কর্নাটক ক্যাডারের একজন চৌকস ও লো প্রোফাইল আইপিএস কর্মকর্তা। রাজিব গান্ধী যখনই দক্ষিণে সফরে গিয়েছেন তখন এই কর্মকর্তা আমাকে ফোন করে জানাতেন এসপিজিকে যেন তার জীবনের ব্যাপারে শ্রীলঙ্কান তামিলদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য হুমকির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলি।

আমি সুবিয়াহকে বলি যে, আমার জন্য সমস্যা হলো দিল্লির গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ গোয়েন্দা কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনা সদর দফতর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়– সবখানেই কর্মকর্তারা মনে করেন, শ্রীলঙ্কার তামিলরা কোনো দিনই রাজিব গান্ধীর জন্য হুমকি হতে পারে না। কারণ রাজিব এবং তার মা ইন্দিরা যেকোনো ভারতীয় নেতার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করেছেন তামিলদের। আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ধারণা এবং 'র'-এর চেন্নাই অফিস প্রধানের বক্তব্য থেকে করা আমার সতর্কবাণীকে তারা 'অকারণ আতঙ্ক' হিসেবে মূল্যায়ন করে। এমনকি রাজিব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হওয়ার পরপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, কে তাকে হত্যা করে থাকতে পারে। আমি কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলি যে, অবশ্যই এলটিটিই। আমার অভিমতকে তখন নাকচ করে দেয়া হয়। সে বৈঠকে এ মতই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তামিলনাড়ু কংগ্রেসের (আই) বিবদমান রাজনীতি অথবা তামিলনাড়ুর উগ্রপন্থীদের করুণ শিকারে পরিণত হয়েছেন রাজিব গান্ধী। শুধু ভিডিও রেকর্ডে আত্মঘাতী বোমারুকে দেখা এবং ফটোগ্রাফারের রেকর্ডে বিস্ফোরণ দেখার পর সবাই একমত হন যে, এলটিটিই রাজিব গান্ধীকে হত্যা করেছে। এলটিটিই যে হত্যাকারীদের ভাড়া করে সেটি উদঘাটিত হয়।

রাজিব গান্ধী নিহত হওয়ার পর সরকার দু'টি তদন্ত কমিশন গঠন করে। প্রথমটি গঠন করা হয় সাবেক প্রধান বিচারপতি জে এস ভার্মাকে দিয়ে। এই কমিশনকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী গোয়েন্দা নিরাপত্তার ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করতে

বলা হয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম সি জৈনের নেতৃত্বে গঠিত অন্য তদন্ত কমিশনকে বলা হয় এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র থাকলে সেটা চিহ্নিত করতে। ভার্মা কমিশনের জন্য যে কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয় তারা কঠোরভাবে তার মধ্যেই থাকে। গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা সংস্থার যে কাজ বা শৈথিল্যের কারণে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পেরেছে, তা বের করতে কমিশন নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে।

অন্যদিকে জৈন কমিশন তার মূল ফোকাস হারিয়ে এমন সব বিষয় দেখতে থাকে, যার সাথে এলটিটিই ইস্যুর খুব সামান্যই সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এ কমিশনের রিপোর্ট তৈরিতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং সরকারকে এ জন্য বারবার সময় বাড়াতে হয়। এই কমিশন সরকারের সার্বিক শ্রীলঙ্কা নীতি, 'র' এবং আইবি'র অপারেশনাল নীতিও চেয়ে বসে। এ কারণে নরসীমা রাওয়ের সরকারকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিব্রতকর অবস্থায়ও পড়তে হয়।

এতে দেখা দেয় উভয় সঙ্কট। কমিশনের কাজের সাথে সম্মত হয়ে তার সামনে চাহিদা অনুযায়ী 'র'-এর সব অপারেশনাল ফাইল পেশ করতে হলে গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। অন্যদিকে কমিশনের কাজের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করা হলে সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হবে। শেষ পর্যন্ত কমিশন যে রিপোর্ট দেখতে চেয়েছে এবং যা কিছু জানতে চেয়েছে সবই সরবরাহ করা হয়। কমিশনকে এমন কিছুও দেয়া হয়, যা কার্যত এর কার্যপরিধির সাথে সম্পর্কিত নয়। তদন্ত নিয়ে যাতে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকে সে জন্যই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়। কমিশনের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সময় ও তথ্যের প্রবেশাধিকার দেয়ার পরও এর রিপোর্ট মোটেই কাঙ্ক্ষিত মানের হয়নি। ইন্দিরা হত্যাকাণ্ডের তদন্তের মতোই রাজিব গান্ধী হত্যাকাণ্ডের তদন্তেও ষড়যন্ত্রের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশ ছাড়াই বহু ধরনের সন্দেহের কথা বলা হয়। দুই তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে অনেক অন্ধকার দিকের কথা বলা হয়, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি কোন কোন ক্ষেত্রে এ সমস্যা ছিল।

বিজয়করণ, এস কে দত্ত ও ডি আর কার্তিকায়নের নেতৃত্বে সিবিআই পরলোকগত সুবিয়াহ'র আন্তরিক সহায়তায় এলটিটিই কিভাবে রাজিব গান্ধীকে হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করেছে, কিভাবে তা বাস্তবায়ন করেছে, এর সাথে শ্রীলঙ্কা, ভারত বা অন্য কোনো দেশের কেউ জড়িত ছিল কি না এবং তাদের কার কী ভূমিকা ছিল তা তদন্ত করে বের করে। মূল হত্যাকাণ্ডে জড়িত যারা বোমা বিস্ফোরণের পর আত্মঘাতী হয়ে গ্রেফতার ও শাস্তি এড়িয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে যারা আত্মঘাতী হয়নি তাদেরও চিহ্নিত করা হয়। একইসাথে তাদের বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়। অপরাধীদের শাস্তির মধ্য দিয়ে এ মামলার সমাপ্তি ঘটে। শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশে এলটিটিই'র সদর দফতরে বসে ষড়যন্ত্রকারী প্রভাকরণ ও অন্যরা আইনের ধরাছোঁয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখতে সক্ষম হয়।

হত্যাকাণ্ড এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রের তদন্ত থেকে গোয়েন্দা সংস্থা এবং

দৈহিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ববানদের দায়িত্বহীনতার কারণে রাজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সজ্ঘটিত হওয়ার বিষয়টি বাইরে ছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা উপেক্ষিত এ বিষয়টি চিহ্নিত করা তদন্ত কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। তদন্তে রাজিব হত্যার জন্য দায়ী সার্বিক পরিবেশকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। এটি করা হলে ভিপি সিং ও তার সিনিয়র কর্মকর্তাদের দ্বারা দৈহিক নিরাপত্তাকে রাজনীতিকীকরণের যে শিকার রাজিব গান্ধী হয়েছেন এ বিষয়টি ফুটে উঠত। চন্দ্রশেখর সরকারও সেই পরিবেশকে সংশোধন করতে পারেননি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তার দিক থেকে এলটিটিই'র কাজকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তামিলনাড়ু পুলিশের অবহেলা ছিল ক্ষমার অযোগ্য এবং সর্বোপরি ছিল রাজিবের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজে সমন্বয়হীনতা।

যত দিন রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তত দিন এসপিজি রাজিব ও তার পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। এসপিজি গঠন করা হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৈরি ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের আদলে। ইউএস সিক্রেট সার্ভিস সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের কিছু দায়িত্বও পালন করে। সংসদে এসপিজি আইন যখন পাস হয় তখন তাদের হাতে শুধু ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বই অর্পণ করা হয়। এসপিজি গঠিত হওয়ার পর দৈহিক নিরাপত্তা, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, বিস্ফোরকবিরোধী তল্লাশি, পরিদর্শনের স্থানের আগাম তল্লাশির মতো প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের পারদর্শী করা হয়। এই সংস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য এজেন্সির সাথে কঠোর সমন্বয়সাধনের জন্যও উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় গঠন করা হয়। রাজ্য পুলিশের যেকোনো অবহেলা থেকে সৃষ্ট হুমকি মোকাবেলা করতে সক্ষম করে তৈরি করা হয় এসপিজিকে। প্রধানমন্ত্রী বস্তুত নিরাপত্তার দু'টি পর্যায়ের আওতায় থাকেন। প্রথমটি থাকে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী, অন্যটি থাকে এসপিজি'র। এসপিজি'র ভেতরেই ব্যর্থতানিরোধক নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরি করা থাকে। উচ্চতর পদমর্যাদার সচিবের (নিরাপত্তা) অব্যাহত তদারকির অধীনে এটি কাজ করে।

১৯৮৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেস (আই) নির্বাচনে হেরে গেলে রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ফলে তার জন্য এসপিজি'র বিশেষ নিরাপত্তাও আর থাকেনি। তবে এর পরও তিনি সর্বাধিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বহাল থাকেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং-এর চেয়েও তার নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে বেশি। গম্ভীর স্বভাবের মানুষ হিসেবে রাজিব গান্ধী কোনো দিন নিজের নিরাপত্তা ইস্যু উত্থাপন না করলেও তার দল কংগ্রেস (আই) ছিল এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও কেবিনেট সচিবালয় এমনকি খোদ ভিপি সিংয়ের সামনেও বিষয়টি উত্থাপন করে কংগ্রেস। সরকার বিশেষ নিরাপত্তা গার্ড বা এসপিজি আইন সংশোধন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের জন্য এসপিজি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ছাড়া কংগ্রেস (আই)-এর

পরামর্শকে সামনে রেখে রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য সম্ভব সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইন সংশোধন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের জন্য ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর মতো এসপিজি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে কংগ্রেস তা সমর্থন করত। কী কারণে জানি না, ভিপি সিং সরকার এসপিজি আইন সংশোধনের বিষয়টি এড়িয়ে যায়। অবশ্য রাজিব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর এই আইন সংশোধন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের পরিবারের জন্যও বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। আগে এটি করা হলে রাজিব হত্যাকাণ্ডের মতো এত বড় একটি ট্র্যাজেডি হয়তো এড়ানো যেত।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, এসপিজি আইন সংশোধনে কোনো রাজনৈতিক জটিলতা থেকে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী আদেশবলে রাজিব গান্ধীর জন্য এসপিজি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারতেন। এতে একমাত্র সমস্যা দাঁড়াত আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি। আইন অনুযায়ী প্রাপ্য নন এমন ব্যক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান কোত্থেকে হবে সে প্রশ্নটি আসত। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থার একটি অপারেশনাল তহবিলবহির্ভূত খাত থেকে এ ব্যয় সংস্থানের মাধ্যমে। গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল-বহির্ভূত খাত থেকে সরকারের বাইরের বেসরকারি নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য ব্যয় করার দৃষ্টান্তও ভারতে রয়েছে। সরকার রাজিব গান্ধীর প্রতি এতটুকু সৌজন্য দেখাতে পারত।

কংগ্রেস (আই) রাজিব গান্ধীর জন্য এসপিজি নিরাপত্তার দাবি জানানোর পর সরকারের পক্ষ থেকে আইনি কারণে তা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করার পর রাজিব ও তার দল কংগ্রেস বিব্রত হতো। সরকার রাজিবের আস্থাভাজন দিল্লি পুলিশের এসপিজি কর্মকর্তাদের বদলি করে রাজিব গান্ধীর নিবিড় নিরাপত্তা টীমে পাঠাতে পারত। পুরো বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে দেখার পরিবর্তে রাজিব গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের ইস্যু হিসেবে দেখে ভিপি সিং সরকার দুষ্টবুদ্ধি থেকে এ আচরণ করেছে বলে বাহ্যত মনে হয়েছে। কংগ্রেস (আই) এসপিজি নিরাপত্তার দাবি এ কারণে করেনি যে, রাজিব এসপিজি কর্মকর্তাদের পছন্দ করতেন, বরং তাদের নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতা সাধারণ পুলিশের চেয়ে বেশি বলেই এ দাবি কংগ্রেস করেছিল।

প্রধানমন্ত্রিত্ব না থাকায় সরকারি বিমান বহর ব্যবহারের আইনি সুযোগ রাজিবের জন্য শেষ হয়ে যায়। ফলে তিনি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরেও তার গাড়িটিকে সরাসরি টারমাক পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। সমন্বয় কমিটির সভায় 'র'-এর পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত থাকতাম। এসব সভায় দেখতাম রাজিবের নিরাপত্তার ব্যাপারে কংগ্রেস (আই)-এর উৎকণ্ঠাকে গুরুতর বিষয় হিসেবে না দেখে বরং শ্লেষাত্মকভাবে দেখা হতো। ভিপি সিংয়ের পর চন্দ্র শেখর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পরও বিস্ময়করভাবে এ বিষয়ে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ কংগ্রেস সংসদীয় দলের সমর্থনের ওপরই তার প্রধানমন্ত্রী থাকা না থাকা নির্ভরশীল ছিল। ফলে কংগ্রেসের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু ভিপি সিংয়ের

সামনে কংগ্রেস (আই) রাজিবের নিরাপত্তার অপর্যাপ্ততার বিষয়টি যেভাবে উত্থাপন করেছিল সেভাবে চন্দ্র শেখরের সামনে হাজিরই করেনি।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানত রাজিব গান্ধীর নাম খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের হিট লিস্টের শীর্ষে রয়েছে। এমনকি রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই শ্রীলঙ্কার তামিল চরমপন্থী সংগঠনগুলোর তার প্রতি হুমকির ব্যাপারে 'র' সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে এ সতর্কবাণীর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি এ কারণে যে, তা সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক ছিল না, ছিল গোয়েন্দা সংস্থার সম্ভাব্য ধারণা। কোনো ভিভিআইপি'র ব্যাপারে এ ধরনের হুমকি সৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়ে যখন কোনো ধারণা করা হয় তখন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেতে কারিগরি ও অন্য সূত্রগুলোকে নিয়োজিত করা হয়। এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ এ কারণে নেয়া হয়নি যে, তারা সবাই ধরে নেয় ভারতীয় ভূখণ্ডে এলটিটিই বা শ্রীলঙ্কার অন্য কোনো সংগঠন একে অন্যের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় নেতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে জড়িত হবে না।

রাজিব হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস আগে এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মাত্র গোয়েন্দা প্রতিবেদন আসে জার্মান ইন্টেলিজেন্স থেকে। এতে বলা হয়, জার্মানিতে বসবাসরত একজন তামিল চেন্নাই সফর করছে যার বিস্ফোরকের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আইবি এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করেনি। তাদের তদন্তে এ তামিলকে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পাওয়া যায়নি। এলটিটিই'র ব্যাপারে মূল গোয়েন্দা ফোকাস ছিল শ্রীলঙ্কায় তাদের তৎপরতা ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তাদের পক্ষ থেকে রাজিব গান্ধীর নিরাপত্তার ওপর কোনো হুমকি আসতে পারে বা এ ধরনের কোনো আশঙ্কার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর সুবিয়াহ 'র'-এর মনিটরিং বিভাগ চাঙ্গা করেন। রাজিব হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নজরদারি ও অন্যান্য কাজ করা হয়। তবে এই মনিটরিং বিভাগও হত্যাকাণ্ডের আগে রাজিব হত্যার ষড়যন্ত্র ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের পর 'র'-এর কোড ভাঙার দায়িত্বপ্রাপ্তরা এলটিটিই'র কোড বা সঙ্কেত যেভাবে ভেঙেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে, এলটিটিই'র যোগাযোগ নিরাপত্তা ছিল বেশ দুর্বল। হত্যাকাণ্ডের পর যদি তাদের যোগাযোগ নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আগেও তা দুর্বল ছিল। এতে ধরে নেয়া যায় হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী মনিটরিং যতটা পদ্ধতিগত ছিল, আগে নিশ্চয়ই সে রকম ছিল না।

আমার অবসর গ্রহণের পর বিচারপতি জৈন কমিশনের রিপোর্ট পড়ে মনে হয়েছে আইবি'র তুলনায় সঙ্কেত ভাঙার দক্ষতা 'র'-এর বেশি হলেও ইন্টারসেপ্ট বা আড়ি পাতার দক্ষতা 'র'-এর চেয়ে আইবি'র বেশি ছিল। এই দুই সংস্থা একে অন্যের সক্ষমতা বা দক্ষতার বিষয়টি পরস্পরকে জানায়নি এবং ভালো ফল লাভের জন্য একে অন্যের দক্ষতাকে কাজেও লাগায়নি। ১৯৯৫ সালে পুরুলিয়ায় এক অজ্ঞাত সংস্থার বিমান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলার ঘটনা এবং ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের সাথে কার্গিল সামরিক সজ্ঘাতের সময় দেখা গেছে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একে অন্যকে তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতার ব্যাপারে অনবহিত রাখে এবং

একে অন্যের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর বিষয়টিকে এড়িয়ে চলে।

পুরুলিয়ায় বিমান থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের অস্ত্র ফেলার পরিকল্পনার বিষয়টি যে ব্রিটিশ এমআই-৫ থেকে 'র' জেনেছে তা আইবি'কে বলেনি। চরমপন্থীদের ভাড়া করা বিমানের পাইলটের কাছ থেকে এমআই তা জেনেছিল। পাইলট ভদ্রলোক ছিলেন ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন পাইলট। চরমপন্থীরা তাকে ভাড়া করার জন্য তার সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এমআই-৫ কে সতর্ক করে। 'র' এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য আইবি'র সাথে বিনিময় করতে পারত এবং উভয় সংস্থা একে অন্যের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালিয়ে পাইলটকে নিচে নামিয়ে আনতে পারত। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়নি।

কার্গিল সজ্ঘাতের ক্ষেত্রে ডিআইবি যখন পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে অস্বাভাবিক কিছু ঘটার খবর পেল তখন 'র' আকাশ গবেষণা কেন্দ্র (এআরসি), আইবি, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএমআই)-এর সমন্বয়ে আইবি নির্দেশিত এলাকায় এক যৌথ আকাশ নজরদারির উদ্যোগ নিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কিছু ঘটেনি। আমরা আকস্মিক দুর্ঘটনা পরিহার করতে চাইলে একজনের ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সক্ষমতার বিষয়ে একে অন্যকে জানানো এবং এ ধরনের ক্ষমতার যৌথ বা সমন্বিত ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন।

আইবি ও তামিলনাড়ু পুলিশের দুর্বল তদারকি ও অবহেলার সুযোগ নিয়ে রাজিব গান্ধীকে এলটিটিই হত্যা করতে সক্ষম হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরও আমাদের নেতাদের দৈহিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ববান নিরাপত্তা কর্মকর্তারা কোনো শিক্ষা নেননি। যে ধরনের সাদামাটা ভাব, গভীরে যাওয়ার অনাগ্রহ এবং অপর্যাপ্ত তদারকির জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে জীবন দিতে হয়েছে, সেই একই কারণে তার ছেলে রাজিব গান্ধীকেও জীবন দিতে হয়। এসব নেতার নিরাপত্তার দায়িত্ব যেসব সংস্থার ছিল তাদের জন্য এটি যে কতটা লজ্জাজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব সংস্থায় যে যে পর্যায়েই কাজ করুক না কেন, এ সময় কর্মরত প্রত্যেক কর্মকর্তার এ লজ্জার জন্য মাথা নত হয়ে যাওয়া উচিত। এক কথায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

রাজিব হত্যাকাণ্ডের পর আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে ভিআইপিদের রক্ষা করা চন্দ্র শেখর প্রশাসন প্রায় অসম্ভব বলে মনে করতে থাকে। এ ধারণা ছিল একেবারেই ভুল। একজন আত্মঘাতী বোমারুর হাত থেকে কোনো জনাকীর্ণ এলাকা বা শপিং মলের মতো হালকা লক্ষ্যবস্তুকে রক্ষা করা কঠিন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনো সন্ত্রাসী যদি আত্মঘাতী না হয়েও এ কাজ করতে চায় তাও ঠেকানো মুশকিল হতে পারে। কিন্তু কার্যকর বিস্ফোরক তল্লাশি এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকরভাবে আত্মঘাতী বোমারুর হাত থেকে যেকোনো ভিভিআইপি বা ভিআইপিকে রক্ষা করা সম্ভব। রাজিব হত্যা প্রচেষ্টা আইবি এবং তামিলনাড়ু পুলিশের কার্যকর বিস্ফোরকবিরোধী তল্লাশি এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা তদন্তের জন্য গঠিত বিচারপতি ভার্মা কমিশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, এসব সংস্থার কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে তাদের খুব একটা দূরদৃষ্টি নেই।

সরকারের কাছে জমা দেয়া তার প্রতিবেদনে বিচারপতি ভার্মা পরামর্শ দিয়েছেন, রাজিব গান্ধীর দৈহিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিতদের দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আত্মসমালোচনা বা আত্মপর্যালোচনা ধরনের একটি অন্তর্বীক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা প্রয়োজন এবং এরপর তাদের সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আইবি এ ধরনের একটি অন্তর্বীক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অধিবেশনে রাজিব গান্ধীর দৈহিক নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা তখন চাকরিরত ছিলেন এবং এরপর অবসর নিয়েছেন সব কর্মকর্তাকে হাজির করানো হয়। আমিও সেখানে ছিলাম। এখান থেকে কার্যকর কোনো ফল পাওয়া যায়নি। সেখানে কোনো ব্যক্তিই নিজের কোনো ধরনের গাফিলতি থাকার কথা স্বীকার করেনি। আমি পরামর্শ দেই যে, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত প্রবাসী তামিলের চেন্নাই সফরের ব্যাপারে জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা যে রিপোর্ট দিয়েছিল তা কেন নাকচ হলো সেটি যাচাই করা প্রয়োজন। আইবি কর্মকর্তারা আমার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। শেষ পর্যন্ত আইবি'র আয়োজন অন্তর্বীক্ষণ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে নিজ অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দেখানোর অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজেদের ভুল ও দুর্বলতাকে কদাচিৎ স্বীকার করে। এ কারণেই আমরা এক হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে আরেক হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি, এক বিপর্যয় থেকে আরেক বিপর্যয়ের পথে পা বাড়াচ্ছি।

পরিচ্ছেদ : আঠারো

সন্ত্রাস এবং কর্ম

'র'-এর প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমইএ) দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই ছিল সন্দেহ, ঈর্ষা ও সংশয়– এ তিনের মিশ্রণে ভরা। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কাও যখন 'র' প্রধান ছিলেন তখনই এই সন্দেহটা জোরালো ছিল। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব টিএন কাউল ছাড়া অনেক এমইএ কর্মকর্তাই সন্দেহ করতেন যে, সংস্থাটি একটি বিকল্প অথবা গোপন পররাষ্ট্র সার্ভিস হতে চাইছে। কাওয়ের ব্যক্তিগত বন্ধু হওয়ার কারণে কাউল তেমন কোনো সন্দেহ পোষণ করতেন না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে সংস্থাটির বৈদেশিক শাখাগুলো যখন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন এই সন্দেহ বেশি করে দেখা দেয়। ১৯৭৭ সালে কাওয়ের বিদায় এবং সংস্থাটির সদর দফতর ও বৈদেশিক শাখার কলেবর ব্যাপক কাটছাঁট করার ব্যাপারে মোরারজি দেশাই'র গৃহীত পদক্ষেপের কারণে এই সন্দেহ অনেকটা দূর হয়ে গেলেও এখনো তা সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

ঈর্ষাপরায়ণতার কারণ ছিল এই যে, 'র' কর্মকর্তারা তাদের ব্যাপক লিয়াজোঁ নেটওয়ার্কের কারণে সহজেই বহু দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সাথে সরাসরি দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন। বিশ্বের সব দেশেই গোয়েন্দাপ্রধানরা বরাবরই তাদের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানদের সাথে সরাসরি ও সহজে যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানরা নিজেদের মধ্যে লিয়াজোঁ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন বিধায় তাদের নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ করে দেন। বিগত বছরগুলোতে 'র' প্রধানদের সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া, ফ্রান্স, ইরান, মিসর, ১৯৯২ সাল-পূর্ব আফগানিস্তান, মরিশাস, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ও চীনের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটে ইন্দিরা গান্ধীর সিনিয়র অ্যাডভাইজার হিসেবে কাও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সাথে পর্যন্ত তার ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মাধ্যমে সরাসরি দেখা করতে পারতেন। ১৯৭০-এর দশকে স্বল্প সময়ের জন্য বুশ সিআইএ'র ডাইরেক্টর ছিলেন এবং তখন থেকেই তার সাথে কাওয়ের জানাশোনা। 'র'-এর অন্য কোনো প্রধানের আর মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। তবে তারা অন্য কোনো দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের

সাথে সরাসরি দেখাসাক্ষাৎ করতে পারতেন। এই সরাসরি প্রবেশাধিকারের সুবাদে সংস্থাটির প্রধানরা বহু সময় বিদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধির ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করেন। বহু বিদেশী সরকারপ্রধান ভারতে তাদের কাউন্টারপার্টের সাথে নিজ নিজ দেশের ভারতীয় মিশন কিংবা ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিবদের চেয়ে 'র' প্রধানদের মাধ্যমে প্রয়োজন সারতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

সংশয়টা বৈদেশিক পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সত্যিকার মূল্য রয়েছে এমন ধরনের স্পর্শকাতর হিউমিন্ট সংগ্রহে 'র'-এর দক্ষতার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ছাড়া অন্যান্য দেশে ভারতীয় মিশনের বহু প্রধান তাদের মিশনে কর্মরত 'র' কর্মকর্তাদের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দক্ষতার ব্যাপারে একধরনের অসন্তোষের ভাব বজায় রাখতে চাইতেন। তাদের অনেকেই প্রায়ই কোনো কোনো 'র' কর্মকর্তার বুদ্ধিবৃত্তিক সততার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। তারা মনে করতেন যে, 'র' সরকারকে মুক্ত সূত্রের তথ্যকে গোপন সূত্রের তথ্য হিসেবে গিলিয়ে প্রতারিত করছেন। (পরলোকগত) সাবেক সচিব ডি আর শেঠের অধীনে আমি প্যারিসে কাজ করতাম। তিনি বলতেন, 'র'-এর মাঠকর্মীদের অনেকেই 'মহিমান্বিত কুম্ভিলক' বৈ আর কিছু নন।

তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর ক্ষেত্রে ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তারা স্বীকার করতেন যে, 'র'-এর কর্মকর্তাদের গোপন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এসব দেশেও আসন্ন সঙ্কটের ব্যাপারে আগাম সতর্কবাণী উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'র'-এর দক্ষতাকে খাটো করে দেখা হতো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর এই সংস্থার খ্যাতি একেবারে শূন্যের কোটায় গিয়ে পৌঁছে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের সময়ও আফগানিস্তানে 'র' এর প্রভাব নিষ্প্রভ ছিল। কেজিবি'র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ১৯৯১ সালে মিখাইল গরবাচেভ তার দেশটিকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে ব্যাপারে কেজিবি'র মধ্যকার অসন্তোষকে 'র' শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধীর অধীনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী নরসীমা রাও 'র'-এর ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। নরসীমা রাও ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও 'র'-এর ব্যাপারে আইবি'র মতো মিশ্র ধারণা পোষণ করতেন। তিনি পেশাদারিত্বের দিক থেকে 'র'-এর চেয়ে আইবি'কে বেশি গুরুত্বসম্পন্ন মনে করতেন। ১৯৮৮ সালে চীনে রাজিব গান্ধীর সফল সফরের পেছনে 'র'-এর অবদান সম্পর্কে নরসীমা রাও অবহিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও 'র'-এর কর্মদক্ষতার ব্যাপারে কিছুটা সংশয় নিয়ে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি স্বভাবজাতভাবেই সংশয়প্রবণ ছিলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার এই সংশয়বাদিতার মাত্রাও বেড়ে যায়। তিনি কেবল অন্যদেরকে নয়, নিজেকেও অবিশ্বাস করতেন। ফলে তার জন্য এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় যে তিনি 'র'-এর ব্যাপারে একটি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারেননি।

যখনই কোনো নতুন কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখনই 'র' প্রধান

সংস্থাটির চলমান স্পর্শকাতর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড এবং এর সাফল্যসংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে লিখে তার কাছে নোট আকারে পাঠিয়ে দেন। এ সংক্রান্ত নোট পাঠানোর কয়েক দিন পর 'র' প্রধান নয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এসব নোটের যাবতীয় দিক ব্যক্তিগতভাবে তুলে ধরেন। এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলোর জবাব দেন। রাজিব গান্ধী, ভিপি সিং ও চন্দ্র শেখরের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল ঠিক একই ব্যাপার নরসীমা রাওয়ের ক্ষেত্রেও ঘটে। তিনি প্রথমবারের মতো এসব নোট এবং ব্যক্তিগত ব্রিফিং থেকে 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পেরে উপলব্ধি করেন যে, এটি কিভাবে আইবি, ডিজিএমআই ও এমইএ থেকে আলাদা। এর পর থেকে 'র'-এর ব্যাপারে নরসীমা রাওয়ের মনোভাব অনুকূলে যেতে থাকে। এই মনোভাব আরও বেশি অনুকূলে আসে ১৯৯১ সালের আগস্টে রাশিয়ার ঘটনাপ্রবাহের পর। ওই সময় কেজিবি গরবাচেভ-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটালে সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ওই সময়কার অরাজক পরিস্থিতিতে বরিস ইয়েলৎসিন রাশিয়ার শীর্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু তখনও কার্যত তিনি গরবাচেভকে সরাতে পারেননি। সে সময় 'র' প্রধান ভারত এবং 'র'-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ইয়েভগেনি প্রিমাকভের আমন্ত্রণে মস্কো সফর করেন। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর প্রিমাকভ কেজিবি-প্রধান হন। ১৯৬৮ সাল-পূর্ব আইবি'র মতো কেজিবিও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করত। রুশ কর্তৃপক্ষ কেজিবিকে খণ্ডিত করে দু'টি পৃথক সংস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর একটি অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা তথ্য এবং অপরটি বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে। প্রিমাকভ বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখার পরিচালক হন।

প্রিমাকভ ইতোমধ্যেই প্রায় ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়া গরবাচেভ এবং প্রায় ক্ষমতা গ্রহণের কাছাকাছি পৌঁছা বরিস ইয়েলৎসিনের সাথে 'র' প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। উভয় নেতাই তাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং নরসীমা রাওয়ের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে বলেন যে, মস্কোতে ক্ষমতার পালাবদলের কারণে রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্কের কোনো হেরফের হবে না। 'র' প্রধান রাশিয়ায় তার অবস্থানের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করে দিল্লি ফিরে আসেন এবং উভয় নেতাই কিভাবে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং নরসীমা রাওকে কী বার্তা পাঠিয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। রুশ নেতাদের কাছ থেকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ ধরনের কোনো বার্তা নরসীমা রাওয়ের কাছ পৌঁছেনি। ফলে তিনি 'র'-এর ব্যাপারে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেন।

এই ভালো ধারণা পরবর্তী মাসগুলোতে আরও দু'টি ঘটনার দ্বারা জোরদার হয়। তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব জে এন দিক্ষিত প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের নেতৃত্বে নয়া সরকারের কর্মকর্তা ও নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার মনে হলো যে রুশ কর্তৃপক্ষ তার সফরকে যতটা গুরুত্ব দেয়ার কথা ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তিনি প্রিমাকভের সাথে 'র'-এর বেশ ভালো সম্পর্কের কথা শুনেছিলেন। তার অনুরোধে 'র' গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে দিক্ষিতের বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিতে প্রিমাকভের সহযোগিতা চান। তিনি সেটার ব্যবস্থা করে দেন। কলম্বোতে

ভারতীয় হাইকমিশনার হিসেবে দিক্ষিত 'র'-এর ব্যাপারে সমালোচনামুখর ছিলেন। এর কারণ ছিল প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের কাছে তৎকালীন 'র' প্রধানের সহজ যাতায়াতের বিষয়ে দিক্ষিত খোলাখুলিভাবে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিভাবে এ সংস্থাকে ভালো কাজে লাগাতে পারে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল রুশ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে বরিস ইয়েলৎসিনের ভারত সফর। তার সফরের আগে 'র'-এর অতিথি হিসেবে প্রিমাকভ দিল্লিতে গোপন সফরে আসেন। তিনি রাওয়ের সাথেও আলোচনায় মিলিত হন। প্রিমাকভের এই আলোচনা ইয়েলৎসিনের সফরকে সার্থক করে তুলে।

আরও যেসব কারণে 'র'-এর ব্যাপারে নরসীমা রাওয়ের ইতিবাচক ধারণা জোরদার হয়, তার একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'র'-এর ভূমিকা। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে 'র'-এর লিয়াজোঁর কারণে খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। 'র'-এর মনিটরিং শাখা লাহোর ও ফ্রাঙ্কফুর্টে তাদের প্রতিপক্ষের সাহায্যে দিল্লিতে নিয়োগপ্রাপ্ত রুমানীয় কূটনীতিক লিভিউ রাদুকে অপহরণকারী খালিস্তানি সন্ত্রাসী এবং ১৯৯৩ সালের আগস্টে নয়াদিল্লিতে একটি রিমোট কন্ট্রোল কার বোমার সাহায্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা মাহেন্দ্রজিত সিং বিত্তাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টাকারী সন্ত্রাসীদের টেলিফোন সংলাপ আড়িপাতার ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য দেখায়।

এলটিটিই'র টেলিফোন সংলাপ আড়িপাতার মাধ্যমে সুবিয়াহ একটি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান নিয়ে আসার বিষয় শনাক্ত করার ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য প্রদর্শন করেন। এলটিটিই নিয়ন্ত্রিত শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশে করাচি থেকে চোরাইপথে এলটিটিই'র এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আইএসআই'র যোগসাজশে পাকিস্তানের হরকাতুল মুজাহিদিন এলটিটিইকে এসব সরবরাহ করে। অস্ত্রের চালান নিয়ে আসা এলটিটিই'র জাহাজটির গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে মনিটর করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় কোস্টগার্ড এটির গতি রোধ করে। তবে ধরে ফেলার আগেই জাহাজটির ক্রুরা সেটিতে আগুন ধরিয়ে দিলে সেটি নিমজ্জিত হয়। জাহাজটিতে থাকা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা না গেলেও জাহাজটির কয়েকজন ক্রুকে জীবিত ধরা সম্ভব হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে এলটিটিই ও পাকিস্তানের মধ্যকার যোগসাজশের বিষয়টি বেরিয়ে আসে। এই জাহাজে করে আসা প্রভাকরণের ঘনিষ্ঠ একজন জ্বলন্ত জাহাজসহ পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেন।

এই অপারেশনে 'র'-এর যে ভূমিকা ছিল নরসীমা রাও এবং কেবিনেট সচিব তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কেবিনেট সচিব এই অপারেশনের ব্যাপারে রাওকে বিস্তারিতভাবে লেখা একটি নোটে উল্লেখ করেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে এই অপারেশনের বিস্তারিত বর্ণনা মিডিয়ায় প্রকাশ করা যায়নি।'

বিশ্বজোড়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জন্য এটা একটা অপারেশনাল ডায়লেমা। প্রতিটি গোয়েন্দা ব্যর্থতার খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অথচ ব্যর্থতার পাশাপাশি সাফল্যের ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে, যা সাধারণ মানুষ জানতে পারে না।

এ ধরনের সাফল্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি অন্যান্য হুমকি রোধে সহায়তা করে। এগুলো জাতীয় স্বার্থ হাসিলের কাজেও সহায়তা করে। এসবের উদাহরণ হিসেবে ১৯৮৮ সালে রাজিব গান্ধীর সফল চীন সফর এবং ১৯৯১ সাল-পরবর্তী রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক জোরদারের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব সাফল্যের খবর গোপন রাখতে হয়– অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সাফল্যটা পুরোপুরি ধরা দেয়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে অপারেশনাল সক্ষমতার ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা সংরক্ষণের জন্যও এগুলো গোপন রাখতে হয়।

এ ধরনের সাফল্যের খবরগুলো ভালোভাবে জানা না থাকার কারণে জনসাধারণ, গণমাধ্যম ও আইনপ্রণেতারা এসব সংস্থাকে তাদের ব্যর্থতার আলোকেই বিচার করতে চান। অন্যান্য দেশে যেখানে কংগ্রেসনাল কিংবা পার্লামেন্টারি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অন্তত কিছুটা হলেও তাদের সাথে সাফল্যের দিকটুকু শেয়ার করতে পারে। ভারতে এ ধরনের সংসদীয় পর্যবেক্ষণব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তা 'র'ই হোক আর আইবি'ই হোক, সাফল্যের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী, আইবি'র ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এবং কেবিনেট সচিবের মধ্যে সীমিত থাকে। এতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার সমালোচনায় যখন সাধারণ মানুষ, গণমাধ্যম ও আইনপ্রণেতারা মুখর থাকেন তখন একমাত্র প্রধানমন্ত্রীকেই দেখা যায় তার পক্ষে সাফাই গাইতে। দুর্ভাগ্যজনক হলো এই যে, এ বিষয়ে সমালোচকদের প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের এই সাফাই খুব একটা মূল্য বহন করে না। কারগিল যুদ্ধের পর সেনাবাহিনী ও বিরোধী রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগ উত্থাপিত হলে বাজপেয়ি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, না, গোয়েন্দা ব্যর্থতার কোনো কিছুই ঘটেনি। বাজপেয়ির এই দৃঢ় অভিমত সত্ত্বেও অনেকেই সেটি বিশ্বাস করতে পারেননি। এটা হচ্ছে গোয়েন্দাদের জন্য একটা পেশাগত সমস্যা এবং এ সমস্যাকে মেনে নিয়েই গোয়েন্দাদের কাজ করে যেতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সময় গোয়েন্দা সহযোগিতার বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিকসংক্রান্ত বিষয় এসে পড়ে। ভারতের জাতীয় স্বার্থে গোপন গোয়েন্দা সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হলেও ইন্দিরা গান্ধী তার আগের ও পরের যেকোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে এ বিষয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। কেননা এ ধরনের সহযোগিতাকে তিনি একটি দ্বিমুখী তরবারি বলে মনে করতেন। তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যথাযথভাবে বিষয়টি দেখাশোনা করা না হলে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভারতে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করে আমাদের জাতীয় স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তারা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে তাদেরকে ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিভ্রান্ত এমনকি ভুল সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশোনা করা না হলে গোয়েন্দা সহযোগিতা বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার একটির সাথে অন্যটির বিরোধ সৃষ্টিতে সক্ষম করে তুলবে।

ইন্দিরা গান্ধী বিশেষ করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, ভারতীয় গোয়েন্দাদের সাথে তাদের এ ধরনের সহযোগিতার সূত্র ধরে তারা আবার আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে কি না। তিনি এমনটিও আশঙ্কা করতেন যে, এভাবে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেয়ে তারা আমাদের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মার্কিন প্রভাবাধীনে নিয়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত করে বসতে পারে। তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে গোয়েন্দা সহযোগিতার বিষয়টিকে একটি তরবারি হিসেবে মনে করতেন এবং এটাকে তাই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন।

তিনি গোয়েন্দা সহযোগিতার ক্ষেত্রে কতগুলো কঠোর করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় নির্ধারণ করেন। তিনি এই নির্দেশনাগুলো মৌখিকভাবে দিতেন এবং লিখিতভাবে দিলেও নিজের হাতে লিখতেন এবং এ কাজে তিনি তার ব্যক্তিগত সহকর্মীদেরও সহায়তা নিতেন না। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়–

■ বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে গোয়েন্দা সহযোগিতার প্রতিটি বিষয় তার ব্যক্তিগত সম্মতিতে হতে হবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তাকে অবহিত রাখতে হবে।

■ সব গোয়েন্দা সহযোগিতার কাজ কেবল 'র'-এর মাধ্যমে হতে হবে। কোনো বিষয়ে অনুমতি বা সম্মতি দেয়ার এখতিয়ার তারই থাকবে। সব বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে লিখিত দলিলপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। এবং এটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের সহায়তা চাওয়া ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

■ সহযোগিতা জোরদারের নাম করে 'র'কে পাশ কাটিয়ে কোনো বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাকে কোনো সরকারি বিভাগ, সংস্থা কিংবা কোনো কর্মকর্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে দেয়া যাবে না।

এসব নির্দেশনার আলোকে 'র' বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে সব যোগাযোগের বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করত। সময়ে সময়ে গোয়েন্দা সহযোগিতার উপযোগিতা পর্যালোচনা করত এবং এসব বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত রাখত। যত বারই নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করত ততবারই 'র' তার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা লিখিত আকারে তাদের কাছে উপস্থাপন এবং মৌখিকভাবে এ ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করত।

ইন্দিরা গান্ধীর মতো রাজিব গান্ধী এবং নরসিমাও বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সব যোগাযোগ একটিমাত্র সংস্থার মাধ্যমে করার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা বিশেষ করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মতো, যাদের আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ অত্যন্ত বিশাল এবং যাদের অন্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ার কঠোর মনোভাব রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষভাবে অনুসরণের পক্ষে ছিলেন।

নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধী ক্ষমতায় থাকাকালে যে নিরাপত্তা ব্যূহ গড়ে তুলেছিলেন সেটাকে দুর্বল করে ফেলার জন্য জোর চেষ্টা চালায়। তারা এমনটি দাবি করতে থাকে

যে, নয়াদিল্লিতে তাদের কূটনৈতিক মিশনে কর্মরত গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের 'র'-এর মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি আইবি, সিবিআই ও দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে দিতে হবে। তারা লিয়াজোঁ বৈঠকের মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে 'র' কর্মকর্তাদের অগোচরে এসব সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মেলামেশা করতে শুরু করেন। একজন 'র' কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এমন লিয়াজোঁ বৈঠকে প্রায়ই আইবি কর্মকর্তারা যোগ দিতেন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে 'র' আইবি ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তার সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার অনুরোধ বারবার প্রত্যাখ্যান করে। 'র' তার অগোচরে আইবি কর্মকর্তাদের সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগের ব্যাপারে যে নাখোশ এ কথাটিও তাদের জানিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও লিয়াজোঁর ক্ষেত্রে এসব করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোর লঙ্ঘন অব্যাহত থাকে। প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের অধীনে কর্মরত তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হার্ড ১৯৯২ সালে নয়াদিল্লি সফরকালে বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর কাছে উত্থাপন করেন। তিনি তাকে বলেন, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং বিশেষ করে তাদের নিরাপত্তা সংস্থা এমআই-৫ কে কাউন্টার টেরোরিজম সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি আইবি'র সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হলে দুই দেশের মধ্যে সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করা যেতে পারে। সিআইএও সময়ে সময়ে আইবি'র সাথে সরাসরি যোগাযোগের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। তবে সিআইএ'র ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় যে, তারা কখনও বিষয়টি রাজনৈতিক পর্যায়ে উত্থাপন করেনি। এমআই-৬ ও সিআইএ 'র'কে এবং 'র'-এর মাধমে আইবি'কে ইরান ও উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে যৌথ অপারেশনের জন্য চাপ দিতে থাকে। নরসিমা রা য়ের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে 'র' তাদের এ পুনঃপুন দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৬৮ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকেই 'র'-এর নীতি ছিল এই, লিয়াজোঁ ধরনের সম্পর্কটা শুধু গোয়েন্দা তথ্যবিনিময় ও মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে যৌথ অপারেশনের কোনো ব্যাপার থাকবে না। ১৯৬৮ সালের আগে আইবি চীনের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সিআইএ'র সাথে কিছু যৌথ অপারেশনে সহযোগিতা করছিল।

'র'-এর একটা সমস্যা ছিল এই যে, খোদ আইবি কাউন্টার টেরোরিজমের ক্ষেত্রে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়ার পক্ষপাতী ছিল। সব লিয়াজোঁ কার্যক্রম 'র'-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী যে নীতি চালু করে গেছেন সেটাকে সব আইবি প্রধানই সেকেলে এবং তার পরিবর্তন দরকার বলে মনে করতেন। তারা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একাধিকবার নিয়ে যান। কিন্তু তাদের এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এতদসত্ত্বেও 'র' জানত যে, নয়াদিল্লিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দা কর্মকর্তাদেরকে সরাসরি আইবি'র সাথে যোগাযোগে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল। আইবিও তার কর্মকর্তাদের এসব দেশের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে মেলামেশার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করেনি। 'র' যখনই ব্যাপারটি তাদের গোচরে আনত তখনই তারা

বিষয়টি অস্বীকার করত।

আইবি'র কাজ ছিল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বা পাল্টা গোয়েন্দাবৃত্তি। বিদেশী গোয়েন্দারা যাতে সরকারের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে সেটা নিশ্চিত করাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটা নিশ্চিত করার জন্য তারা বিদেশী কূটনীতিক ও অন্যান্য বিদেশী নাগরিকের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের যোগাযোগের ব্যাপারে সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারি করে থাকে। এসব নির্দেশনা খোদ আইবি কর্মকর্তারাই কাউন্টার টেরোরিজমে সহযোগিতার নামে হরহামেশা ভাঙতেন।

ফলে এই সুযোগে ১৯৯০-এর দশকে 'র'-এর সাথে লিয়াজোঁ রক্ষার জন্য নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত একজন মহিলা কর্মকর্তার মাধ্যমে সিআইএ আইবি'র অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। এ সময় আইবি'র কাউন্টার টেরোরিজম শাখার যিনি প্রধান ছিলেন তিনি ওই মহিলার দ্বারা তার এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। অথচ তার দায়িত্ব ছিল নয়াদিল্লিতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশী গোয়েন্দাদের ওপর নজরদারি করা। আমার অবসর গ্রহণের দু'বছর পর আইবি এবং 'র'-এর একটি যৌথ সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে যখন বিষয়টি ধরা পড়ে তখন ওই কর্মকর্তাকে আইবি থেকে বের করে দেয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই অবসরে যেতে বলা হয়। আর ওই মহিলা সিআইএ কর্মকর্তাকে দেশ ত্যাগ করতে বলা হয়। আমাকে বলা হলো, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্ক উইসনার ওই মহিলা কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে উপেক্ষা করছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, আইবি কর্মকর্তা ওই মহিলার এজেন্ট ছিলেন না। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি তার সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করতেন মাত্র। এ ধরনের ঘটনা সত্ত্বেও আইবি লিয়াজোঁ বিষয়ক পদ্ধতি পরিবর্তনের বিষয়টি জিসি সাক্সেনার নেতৃত্বে গঠিত 'স্পেশাল টাস্কফোর্স ফর দ্য রিভামপিং অব দ্য ইন্টেলিজেন্স অ্যাপারেটাস'-এর কাছে উত্থাপন করে। ২০০০ সালে বাজপেয়ি সরকার এই টাস্কফোর্সটি গঠন করে। আমি এই টাস্কফোর্সের একজন সদস্য ছিলাম। লিয়াজোঁ-সংক্রান্ত বিষয়ে 'র'-এর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রেখে টাস্কফোর্স ইন্দিরা গান্ধীর প্রণীত নীতিমালার আলোকে এই সুপারিশ করে যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আইবিকে সেক্রেটারি (আর)-এর পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বিদেশী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার ফলে বোধগম্য কারণেই আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সহযোগিতা জোরদারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। আর এটা করতে গিয়ে ইতঃপূর্বে পাল্টা গোয়েন্দাবৃত্তি রোধে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল সেগুলোর কার্যকারিতা বহুলাংশে কমে গেছে। ফলে অসংখ্য যোগাযোগ পয়েন্ট সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাদের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। যারা পেশাদার গোয়েন্দা নন এবং যাদের পাল্টা গোয়েন্দা ও পাল্টা অনুপ্রবেশ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই এমন বহু লোক গোয়েন্দা সহযোগিতার কাজে নেমে পড়েছেন। এর ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়েছে। যার ফলে অতি উঁচুমানের প্রশিক্ষিত বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ করে

সিআইএ'র মতো গোয়েন্দা সংস্থার জন্য পোয়াবারো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির যদি অবসান ঘটানো বা তাকে প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে একদিন ভারতের স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা যাবে গোয়েন্দা সহযোগিতার ছদ্মাবরণে বিদেশী গোয়েন্দারা মারাত্মকভাবে ঢুকে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্লিনটনের শাসনামলে সিআইএ ও এফবিআইতে রুশ গোয়েন্দাদের অনুপ্রবেশের দু'টি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল। এই দু'টি সংস্থার অভ্যন্তরে গোপন তদন্ত ছাড়াও কংগ্রেসের ওভারসাইট কমিটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত ও খোলামেলা তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার এবং কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট জনসাধারণের জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল।

ভারতে সংসদীয় তদন্ত তো দূরের কথা, পার্লামেন্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ ভারতে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে। যেমন রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ফরাসি গোয়েন্দাদের অনুপ্রবেশের একটি, রাজিব গান্ধী ও বাজপেয়ির আমলে সিআইএ'র 'র'-তে অনুপ্রবেশের দু'টি, প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর আমলে আইবিতে আবারো সিআইএ'র অনুপ্রবেশের একটি, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর শাসনামলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অংশ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েটে (এনএসসিএস) আবারো সিআইএ'র অনুপ্রবেশের একটি ঘটনা ঘটে।

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর আগে সশস্ত্র বাহিনীসহ অন্যান্য সরকারি বিভাগে আইএসআইসহ বিদেশী গোয়েন্দাদের অনুপ্রবেশের বহু ঘটনা ঘটে। তবে ওই সময় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ অনুপ্রবেশের আওতামুক্ত ছিল। তার মৃত্যুর পর অবশ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যেও অনুপ্রবেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু ঘটনা ঘটে। এ পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা শনাক্ত করা গেছে তার সবগুলোই সিআইএ কর্তৃক ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, আইএসআইসহ অন্যান্য বিদেশি সংস্থা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে অনুপ্রবেশে সফল হয়নি কিংবা চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়নি। এটা ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর থেকে আমাদের নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ রোধ ব্যবস্থার দুর্বলতারই লক্ষণ। সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতার নামে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই ধরনের একটি অবাধ পরিস্থিতিকে উৎসাহিত করা হয়।

১৯৯১ সালে নরসিমা রাও-এর ক্ষমতা গ্রহণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। যেসব সন্ত্রাসী ইতঃপূর্বে হস্তচালিত অস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতো তারা তখন ব্যাপকভাবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক (আইইডি) ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা শ্রীনগরে পুলিশ সদর দফতরে হামলা চালিয়ে সেটার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসাধনে সক্ষম হয়। পুলিশের তৎকালীন ডিজি জে এন সাক্সেনা এবং তার কিছু সিনিয়র কর্মকর্তাও আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যান। মুক্তিপণ কিংবা আটক সন্ত্রাসীদের মুক্তির বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার জন্য লোকজনকে অপহরণের ঘটনাও ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীরা হজরত মুহম্মদ সাঃ-এর চুল মোবারক সংরক্ষিত থাকা হজরতবাল মসজিদ দখল করে নেন। পরে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তারা

বিনা রক্তপাতে মসজিদটির দখল ছেড়ে দেন। তবে মসজিদটির দখল ছেড়ে দেয়া স্বাধীনতাকামীদের নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে নরসিমা রাও তাদের প্রতি যে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন সে জন্য তাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

নরসিমা রাও সুইজারল্যান্ডের দাভোস, জাকার্তা ও হারারেতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সাথে তিনবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেন। এসব সম্মেলন কোনো সুফল বয়ে আনেনি। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকেও গোয়েন্দা তথ্য তেমন একটা পাওয়া যায়নি।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে কাবুলে নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর আফগান গোয়েন্দা সংস্থা খাদ এর কাছ থেকেও গোয়েন্দা তথ্য প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। মুজাহিদরা কাবুল দখল করে নজিবুল্লাহকে গ্রেফতার করে। তারা খাদ ভেঙে দিয়ে নিজেদের মতো করে গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করে। এই গোয়েন্দা সংস্থার অধিকাংশ কর্মকর্তাই ছিল আইএসআই'র অবসরপ্রাপ্ত কিংবা চাকরিরত কর্মকর্তা। তারা জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তানপন্থী মুজাহিদ সংগঠন হিজবুল মুজাহিদীন এবং পাকিস্তানি মুজাহিদ সংগঠন হরকাতুল আনসার (পরে হরকাতুল মুজাহিদীন নামকরণ করা হয়)-এর মতো সংগঠনগুলোকে আফগান ভূখণ্ডে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করার অনুমতি দেয়।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে আফগান ভূখণ্ডে যাতে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করতে না দেয় সে ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য 'র' আফগান মুজাহিদদের মধ্যে যারা উদারপন্থী তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এসব মুজাহিদ নেতার সাথে সুইজারল্যান্ড ও ইতালিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতীতে সোভিয়েত রাশিয়া এবং নজিবুল্লাহর বাহিনীর প্রতি ভারতের সমর্থন সত্ত্বেও এসব মুজাহিদ নেতা ভারতের প্রতি তাদের বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটান। তবে তারা আমাদের অন্য কোনো সহায়তা কিংবা গোয়েন্দা তথ্য দিতে রাজি হননি। কার্যত মুজাহিদদের শাসনের নামে আফগানিস্তানে আইএসআই'র নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। যেসব পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থা খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে ভারতকে তার সন্ত্রাস দমনে সহায়তা করছিল তারা একইভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহায়তা দিতে রাজি ছিল না। তারা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সাথে একমত পোষণ করত যে, এটি একটি বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড। এমনকি তারা এ কথাও স্বীকার করতে রাজি ছিল না যে, জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস চলছে। ইউরোপে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী মিরপুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা সন্ত্রাসীদের অর্থসহায়তা দেয়া সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে কোনো গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যায়নি। মিরপুরিরা হচ্ছে পাঞ্জাবি ভাষাভাষী পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা। তারা সেখানকার মন্দা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ইউরোপ চলে যায়। তাদের অনেকে মিরপুর এলাকায় মংলা বাঁধ নির্মাণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কেউ কেউ এমনটি আশা করতে পারতেন যে, এসব লোক পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যাবে। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে এই, বিগত বছরগুলোতে 'র' এসব লোকের মন জয় করতে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 'র'

তাদের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখে। আর আইএসআই এ সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে ভারতের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে এবং তাদেরকে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামীদের সহায়তা করাতে সক্ষম হয়।

কাশ্মীর প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব একান্তই অসহযোগিতাপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামীদের ব্যাপারে 'র' এবং আইবি কর্মকর্তাদের সাথে কোনো রকম আলোচনায় পর্যন্ত বসতে রাজি হয়নি। সিআইএ মনে করত জম্মু ও কাশ্মীরে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই চলছে না। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সিআইএ'র সাথে আইবি'র লিয়াজোঁ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। আর ওই সময় থেকেই পাকিস্তান প্রশ্নে ভারতের সাথে সিআইএ'র এই অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চীনের ব্যাপারে সিআইএ ভারতের জন্য সহায়ক হলেও পাকিস্তান প্রশ্নে ছিল বৈরী। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে যে দলের সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন সে সরকারই পকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে এবং ভারতের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করেছে।

১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে চীনের ব্যাপারে আইবি'র টেকইন্ট সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড় রকমের অদক্ষতা প্রকাশ পায়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অনুমোদনসাপেক্ষে আইবি তার টেকইন্ট দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চায়। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির অনুমোদন নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা আইবি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং এসব সরঞ্জাম ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে সম্মত হয়। তবে তারা শর্ত জুড়ে দেয় যে, এসব সরঞ্জামের সহায়তায় কেবল চীন থেকেই টেকইন্ট সংগ্রহ করা যাবে, পাকিস্তান থেকে নয়।

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে যখন 'র' গঠিত হয় তখন এসব সরঞ্জাম ব্যবহারকারী শাখাটিকে 'র'-তে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭০-এর দশকে কাও ইন্দো-মার্কিন গোয়েন্দা সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনার জন্য সিআইএ পরিচালকের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন ডিসি সফর করেন। এই সফরের কয়েক বছর পর তিনি আমাকে বলেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে আলোচনাকালে সিআইএ প্রধান তাকে বলেছিলেন– 'রামজি, এ পেশায় আমরা সবাই প্রতারণা করি। আমি জানি 'র'ও প্রতারণা করবে এবং আমাদের দেয়া সরঞ্জাম দিয়ে পাকিস্তানের ব্যাপারে টেকইন্ট সংগ্রহ করবে। তবে এটা দেখবেন, যাতে আমাদের পররাষ্ট্র দফতর তা জানতে না পারে। যদি জানতে পারে তাহলে আমাকে আপনাদের সাথে সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে এবং সরঞ্জামগুলো প্রত্যাহার করে নিতে বলবে এবং আমি তখন তা করতে বাধ্য হব।'

রাওয়ের নির্দেশনায় আইবি, 'র' এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যাপারে বিশ্বসম্প্রদায় এবং মার্কিন রাজনীতিক ও জনগণের মতামত গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত প্রচারাভিযান জোরদার করে। আইবি এবং 'র' আইএসআই'র বিরুদ্ধে যতগুলো তথ্য পেয়েছে তার সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দু'জন এবং আইবি থেকে একজন কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত একটি টীম মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে এই

সারসংক্ষেপ হস্তান্তর এবং পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের হোতা বলে ঘোষণা করার অনুরোধ জানাতে ওয়াশিংটন পাঠায়। এটা করার পর তারা সারসংক্ষেপের একটা কপি এক সংবাদ সম্মেলন করে ওাশিংটন প্রেসক্লাবকেও প্রদান করে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এই সার সংক্ষেপে সামান্য চোখ বুলিয়েই তা প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৯১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) যোদ্ধারা জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাওয়া একদল তরুণ ইসরাইলিকে আক্রমণ ও তাদের অপহরণ করার চেষ্টা করে। এসব তরুণ ইসরাইলি পর্যটক হিসেবে ভারতে আসার ঠিক আগে তাদের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছিল। ফলে তারা তাদের কাছ থেকে অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে তাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তবে জেকেএলএফ যোদ্ধারা একজন ইসরাইলিকে হত্যা ও অপরজনকে অপহরণ করতে সক্ষম হয়। পরে অবশ্য অপহৃত ইসরাইলিকে মুক্তি দেয়া হয়। এই ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী ইহুদি সম্প্রদায় বিশেষ করে মার্কিন ইহুদিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় অভিযোগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অসহানুভূতিশীল মনোভাবের তীব্র সমালোচনা শুরু করে।

১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিতা জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দেয়া সারসংক্ষেপে দ্বিতীয়বার নজর দেয়ার নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। জানা গেছে, যেসব কর্মকর্তা এই সারসংক্ষেপ পড়ে দেখেছিলেন তারা এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে ঘোষণা না করে এ ব্যাপারে সন্দেহভাজন দেশের তালিকায় রাখা যেতে পারে। বুশ পরের বার বিল ক্লিনটনের কাছে নির্বাচনে হেরে যান। বুশ সে সুপারিশ অনুযায়ী কাজ না করে এটি তার উত্তরসূরির সিদ্ধান্তের জন্য রেখে যান।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে ক্ষমতা গ্রহণের পর ক্লিনটন পাকিস্তানকে সন্দেহভাজন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের পেছনে এই বৃহৎ সারসংক্ষেপ সঙ্কলন ভূমিকা রাখলেও এর পেছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তৎকালীন আইএসআই প্রধান লে. জেনারেল জাভেদ নাসিরের ওপর সিআইএ নাখোশ ছিল। সিআইএ সোভিয়েত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুজাহিদদের যেসব স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছিল তার মধ্যে অব্যবহৃত স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় তাদের কাছ থেকে কিনে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। আফগান মুজাহিদদের এ ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য সিআইএ জাভেদ নাসিরকে বললেও তিনি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেননি। যুক্তরাষ্ট্র এ কাজে অসহযোগিতাপূর্ণ বলে মনে হওয়া জাভেদ নাসির ও আরও কিছু আইএসআই কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে বাধ্য করতে এই সারসংক্ষেপ ব্যবহার করেছিল। শেষ পর্যন্ত নওয়াজ শরিফ যুক্তরাষ্ট্রের দাবির প্রতি নতি স্বীকার করেন।

পাকিস্তানের তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেনজির ভুট্টো ভারতে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জে কে গ্যালব্রাইথের পুত্র পিটার গ্যালব্রাইথকে ও ক্লিনটনের সাথে বন্ধুত্ব ছিল তার এমন আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় সাথীকে ফোন করেন। তিনি

পাকিস্তানকে যাতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশ বলে ঘোষণা না করা হয় সে-ব্যাপারে অনুরোধ করেন। বেনজির তাদেরকে বলেন, পাকিস্তানে এ বছর শেষের দিকে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আশা করা হচ্ছে তাতে তিনি বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আস্থাশীল এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে ভারতের বিরুদ্ধে আইএসআই'র সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।

১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিস্টোফার ঘোষণা করেন, পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সন্দেহভাজন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেনজির ভুট্টো ১৯৯৩ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্বহাল হন। কিন্তু তিনি আইএসআইকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ব্যবহার বন্ধ করতে বলেননি। পাকিস্তানকে সন্দেহভাজন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য পিটার গ্যালব্রাইথ ও অন্যদের কাছে টেলিফোনে যেসব কথা তিনি বলেছেন তার একটি ট্রান্সক্রিপ্ট 'র'-এর আরকাইভে রাখা ছিল। বেনজির ক্ষমতায় ফিরে আসার পর জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি আরও খারাপ আকার ধারণ করে। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে বেনজির ভুট্টো খালিস্তানিদের প্রতি আইএসআই'র সহযোগিতা বন্ধের চেষ্টা করলেও ১৯৮৯ সালে তারই শাসনামলে আইএসআই আরও বেশি করে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাকামীদের সহায়তা করতে শুরু করে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের প্রতি বেনজির ভুট্টো খুবই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে আইএসআই যা যা করতে চায় সে ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করেন। ১৯৯৩ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতের প্রতি তার বিদ্বেষ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামীদের প্রতি আইএসআই'র সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আইএসআই, জেকেএলএফ ও হিজবুল মুজাহিদিনের মতো দেশীয় কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাকামী সংগঠনের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে তার লক্ষ্য হাসিল করতে চেষ্টা করে। স্থানীয় কাশ্মীরি সংগঠনগুলো ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে পেরে উঠছে না দেখে আইএসআই জম্মু ও কাশ্মীরসহ ভারতের অন্যান্য অংশে হরকাতুল আনসারের (পরে হরকাতুল মুজাহেদিন নামকরণ করা হয়) মতো পাকিস্তানি মুজাহিদ সংগঠনগুলোকে পাঠাতে শুরু করে। এসব মুজাহিদ সংগঠন ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিল। আফগানিস্তানে লড়াই করা পাকিস্তানের মুজাহিদ সংগঠনগুলোর অনুপ্রবেশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেনজিরের দ্বিতীয় মেয়াদে গতি লাভ করে। আফগান যুদ্ধে অংশ নেয়া পাকিস্তানি মুজাহিদদের ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের ব্যাপারে আইএসআই'র নীতির প্রতি বেনজিরের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

বেনজির ভুট্টো নরসিমা রাওকে পছন্দ করতেন না। ১৯৯১ সালে রাজিব গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে বেসরকারি সফরে ভারতে এসে একজন বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে তার যতটা সম্মান পাওয়ার কথা ততটা তিনি পাননি বিধায় সে সময় থেকে তিনি নরসিমা রাওয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি কংগ্রেসের (আই) গুরুত্বপূর্ণ

নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েও পারেননি। তার সফরের আগাগোড়াই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব দেখাশোনা করেন। ভারতের প্রতি পাকিস্তানের নীতির ক্ষেত্রে তার এই অপছন্দের প্রতিফলন ঘটে। ভারতের যেসব নেতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তারা হলেন ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধী। তিনি কাশ্মীরি ও পাকিস্তানি মুজাহিদদের জন্য কেবল আইএসআই'র সহায়তাই জোরদার করেননি, সেই সাথে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করার জন্যও আইএসআইকে নির্দেশ দেন। তিনি দু'দেশের মধ্যে সংলাপ শুরুর ব্যাপারে রাও এবং পররাষ্ট্র সচিব জে এন দিক্ষিতের চেষ্টাও প্রত্যাখ্যান করেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে পাকিস্তানের কাছে ভারতের পাঠানো তথাকথিত কিছু নন-পেপারও তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দু'দেশের মধ্যে সংলাপের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমন ও অনুপ্রবেশ রোধের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস এবং রাজ্যে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে মর্মে শর্ত আরওপ করেন। নওয়াজ শরিফের সাথে নরসিমা রাও অন্তত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে হলেও তিনটি বৈঠক করেছিলেন। কিন্তু নরসিমা রাও বেনজিরের সাথে কোনো বৈঠক করতে পারেননি। তিনি ১৯৯৫ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনেও যোগ দিতে আসেননি। তিনি তার স্থলে দেশের নামমাত্র প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারিকে পাঠিয়েছিলেন সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে। ১৯৯৪ সালে তিনি ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ আনেন এবং জেনেভায় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন যাতে এ প্রশ্নে ভারতকে নিন্দা জানায়, সেই লক্ষ্যে প্রচারাভিযান জোরদার করেন। সালমান খুরশিদ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর সহায়তায় নরসিমা রাও বেনজির ভুট্টোর এই প্রচারাভিযানকে সার্থকভাবে মোকাবেলা করেন। রাওয়ের অনুরোধে জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে ফারুক আবদুল্লাহ ইউরোপ সফরে যান। আইএসআই ব্রাসেলস ও ভিয়েনায় কাশ্মীরসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে এবং জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক অধিবেশনকালে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানি প্রচারাভিযান জোরদার করা হয়। এই প্রচারাভিযানের মোকাবেলা করতে ফারুক আবদুল্লাহ এসব দেশ সফর করেন। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনকে দিয়ে ভারতের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে বেনজিরের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে ইরানের অস্বীকৃতি এবং সালমান খুরশিদ ও ফারুক আবদুল্লাহর প্রস্তাবের ব্যাপারে সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার জন্য রাওয়ের অনুরোধে কমিশনের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানকারী বাজপায়ি কৃতিত্ব দাবি করলেও এ জন্য আসল কৃতিত্বের দাবিদার সালমান খুরশিদ ও ফারুক আবদুল্লাহ। বেনজির এবং আইএসআই কর্মকর্তারা তাদেরকে ভারত সরকারের দালাল বলে অভিহিত করেন। তারা এসব অভিযোগ ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেন। ভারতের বিরুদ্ধে আইএসআই'র এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ব্যর্থ করে দেয়ার কিছুটা কৃতিত্ব 'র'-এরও রয়েছে। 'র' এ ক্ষেত্রে পর্দার অন্তরালে থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অমিতাভ

চক্রবর্তীর সুযোগ্য নেতৃত্বে 'র'-এর মনোযুদ্ধ শাখা জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তানবিরোধী লোকজন এবং ভারতের বাকি অংশের মুসলমানদের ও ইউরোপে বসবাসকারী ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থনে ভারতের বিরুদ্ধে আইএসআই পরিচালিত মনোযুদ্ধের সার্থক মোকাবেলা করে। মনোযুদ্ধ মোকাবেলার কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা ছিল 'র'-এর জন্য একটি গৌরবময় অধ্যায়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পরলোকগত অমিতাভ চক্রবর্তীর। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে এই যে, তিনি মনোযুদ্ধের যে কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন সেটার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা যাবে না।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভারতের অন্যান্য অংশের বিচ্ছিন্নতাকামীদের জন্য সহায়তা জোরদারের সময়ও বেনজির এবং তার আগে নওয়াজ শরিফকে সিন্ধুর পরিস্থিতির দিকে বেশি বেশি নজর দিতে হতো। কেননা ওই সময় সিন্ধুর পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল। প্রথম দিকে ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে সিন্ধিরা স্বাধীন সিন্ধুদেশ গঠনের দাবিতে বিদ্রোহ করে। পরে ভারত থেকে চলে যাওয়া মুহাজিররা এবং দক্ষিণ পাঞ্জাবের সেরাইকরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মুহাজিররা জিন্নাপুর নামে করাচির স্বাধীনতা দাবি করছিল। তারা করাচিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সেরাইকরা পৃথক সেরাইকি রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার ডাক দেয়। শিয়ারাও গিলগিট ও বাল্টিস্তান এই শিয়া অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু সংলগ্ন এলাকা নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ দাবি করছিল।

সিন্ধি এবং মোহাজিরদের আন্দোলন তীব্রতা পেলে সিন্ধু বিশেষ করে করাচিতে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। নির্দয়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে আইএসআই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সিন্ধি এবং মোহাজিরদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি এবং মোহাজিরদের সংগ্রামের প্রধান নেতা আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে মোহাজির কওমি মুভমেন্টের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির মাধ্যমে আইএসআই এ চেষ্টা করে। উত্তরাঞ্চলের শিয়ারা তাদের এলাকায় পাকিস্তানবাদী দখলদারিত্ব এবং গিলগিট ও বালটিস্তানে সুন্নি সাবেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা মনে করে এ পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য ছিল শিয়াদের তাদের এলাকায় সংখ্যালঘু বানানো। একই ধরনের নীতি অনুসারে পাঞ্জাবিদের সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে পুনর্বাসন করা হয় যাতে সিন্ধি ও বেলুচরা তাদের ঐতিহ্যবাহী মাতৃভূমিতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে নওয়াজ শরিফ এবং পরে বেনজির ভুট্টো অবস্থার অবনতির জন্য ভারতকে দায়ী করে। জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত পাকিস্তানকে যেভাবে দায়ী করে একইভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আইএসআই ভারতকে দায়ী করে। নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আইএসআই হুসাইন হাক্কানি নামের একজন পাকিস্তানি সাংবাদিককে দিল্লিতে সিন্ধি জাতীয়তাবাদী ও মোহাজিরদের জন্য 'র' পরিচালিত বলে অভিযুক্ত প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে তথ্য সংবলিত কাগজপত্র দিয়ে নয়াদিল্লি পাঠিয়েছিল। তিনি ইন্ডিয়া টুডের একজন সাংবাদিকের সাথে যোগাযোগ করেন। তাকে প্রশিক্ষণ শিবির সংক্রান্ত সব কাগজপত্রের একটি কপি দেন এবং এটি তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করতে বলেন। তিনি

আরও বলেন, তাদের পত্রিকা চাইলে তাদের আরও বিস্তারিত তথ্য দেবেন। ইন্ডিয়া টুডের সেই সাংবাদিক ওই সব কাগজপত্র অমিতাভ চক্রবর্তীকে দেখিয়ে এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চায়। অমিতাভ চক্রবর্তী আমার সাথে পরামর্শ করার পর তাকে বলেছিলেন, এসব কাগজপত্র সম্পূর্ণ ভুয়া ও মিথ্যা। তিনি উল্লেখ করেন সিন্ধি জাতীয়তাবাদী এবং মোহাজিরদের 'র'-এর এজেন্ট হিসেবে অসম্মান করার জন্য স্পষ্টত এটি আইএসআই'র একটি প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া টুডের কর্তৃপক্ষ এ প্রতিবেদন প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হাক্কানি ভারতে বেনজিরের কিছু পুরনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করেন যারা আমেরিকা ও ব্রিটেনে বেনজিরের ছাত্রজীবনের সময় থেকে তার সাথে পরিচিত ছিলেন। হাক্কানি তাদের কাছ থেকে বেনজিরের ব্যক্তিগত জীবন এবং ভারত কানেকশন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। বেনজিরের পিপিপি দিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তানি হাইকমিশন থেকে এ ব্যাপারটা জানতে পারে। পিপিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটি তার এই অনুসন্ধানের তীব্র নিন্দা জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। হাক্কানি কলম্বোতে পাকিস্তানি হাইকমিশনার হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেন। তখন তিনি আইএসআই'র পক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কার পূর্বাঞ্চলের এবং দক্ষিণ ভারতের মুসলিমদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। হাক্কানি এখন আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

জিয়াউল হকের সময়কাল থেকেই আইএসআই জম্মু ও কাশ্মীরসহ ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করার চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং এর বাইরের ভারতীয় অঞ্চলগুলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে তাদের চেষ্টা জম্মু ও কাশ্মীরে সফল হলেও ভারতের অন্যান্য অংশে সফল হয়নি।

১৯৮০ সালের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমন্ত্রণে সিমি'র কিছু সদস্য গোপনে পাকিস্তান যায়। ১৯৯০ সালের প্রথমদিকে তাদের একজন সদস্যকে গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদকালে এ সদস্য জামায়াতে ইসলামীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা স্বীকার করেন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আরও স্বীকার করেন, তাদের প্রশিক্ষক ছিলেন একজন সুদানি। এসব প্রশিক্ষিত ব্যক্তি ভারতে এসে কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেনি। এতে প্রশিক্ষক নিজে কিছু প্রশিক্ষিত সদস্য নিয়ে গোপনে ভারতে যান এবং পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওই সব ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে মুসলমানদের সাহায্য করতেও দ্রুত ছুটে যান। তখন তিনি তাদের জম্মু ও কাশ্মীর এবং এর বাইরে ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস কার্যক্রমের জন্য সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। প্রশিক্ষক চলে যাওয়ার পরও সেসব সদস্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে অনিচ্ছুকই থেকে যায়।

উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার পর হিন্দুত্ববাদীদের কর্মকাণ্ডে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলে পাকিস্তান এবং ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম যুব সমাজের আচরণ ও চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। এতে পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানি জিহাদি সংস্থাগুলো বিস্তার লাভ করে।

জিহাদকে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা আল কায়েদা ও

ওসামা বিন লাদেনের আবিষ্কার ছিল না। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এটি ছিল পাকিস্তানি সামরিক এবং ধর্মীয় নেতাদের পরিকল্পনার অংশ। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জিহাদ ১৯৮৯ সালে নয়, তা মূলত ১৯৪৭ সালেই শুরু হয়। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ জওয়াহেরলাল নেহরু ১৯৪৭ সালের পর ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের জিহাদের ব্যাপারে বারবার সতর্ক থাকার জন্য বলেছিলেন। তার এই সতর্কতা ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ১৮ মার্চ, ১৯৫৭ সালের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায়ও বারবার প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানে ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো এবং জিহাদি প্রচারণার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নীতি এবং জনসাধারণের আচরণ হবে এসব কথায় কান না দেয়া এবং পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা। আমরা আমাদের ভূমি এবং আইনানুগ অধিকার রক্ষা করব।' (দি হিন্দু পত্রিকার 'দিজ ডে দেট এইজ' শিরোনামে ২০০৭ সালের ১৯ মার্চ প্রকাশিত কলাম থেকে উদ্ধৃত)

১৯৪৭ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পাকিস্তান ভারতে তাদের অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা এই জিহাদ পরিচালিত করে। তারা অবশ্য ভারতের মুসলিম সমাজ থেকে তেমন সমর্থন পায়নি। ১৯৮০ সালের পরে তারা জম্মু এবং কাশ্মীরের মুসলিম যুবসমাজের কিছুটা সমর্থন পায়। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর তারা ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলিম সমাজেও কিছু সমর্থন লাভ করে।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরের আগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হলেও জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরে কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের জিহাদি সহিংসতা হয়নি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর থেকে আইএসআই এবং পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠন এলইটি, হরকাতুল মুজাহিদীন, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি, জায়স ই মুহাম্মদ (যা ২০০০ সালে হরকাতুল মুজাহিদীন থেকে ভেঙে তৈরি হয়েছে) প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে আসছে। তারা কিছু কিছু মুসলমানের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে ব্যবহার করে আসছে। জম্মু এবং কাশ্মীরের বাইরে অন্য অংশে তারা ভারতীয় মুসলমানদের উর্বর ভূমি খুঁজে আসছিল তাদের ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর জন্য। বাবরি মসজিদ ভাঙার ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশে জিহাদি সহিংসতা বিস্তার লাভ করে। সে জন্য অনেকেই নারসিমা রাওকে দায়ী করতে পারেন।

এ ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা আমলাতন্ত্রকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। আইবি'র এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে অযোধ্যাগামী হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের রথযাত্রা বন্ধ করতে, উত্তর প্রদেশ সরকার বরখাস্ত করে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করার সুপারিশ করেছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা এলকে আদভানি প্রধানমন্ত্রী রাওয়ের আহ্বানে তার সাথে নরসিমার বাসভবনে আলোচনাকালে মসজিদ ধ্বংস না করার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন। 'র'তে কিছু বন্ধু-বান্ধব রয়েছে এমন একজন হিন্দু ধর্মীয় নেতা রাওকে সতর্ক করে দিতে

চেয়েছিলেন যে, আদভানির আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করা ঠিক হবে না। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, হিন্দু করসেবকরা মসজিদটিকে ধ্বংস করে দেবে। এই হিন্দু ধর্মীয় নেতার বক্তব্য রাওকে মৌখিকভাবে জানানো হয়।

রাওয়ের ভূমিকার পেছনে দু'ধরনের মনোভাব থাকতে পারে বলে মনে হতে পারে। কোনো কোনো সময় মনে হয় রাও আদভানির আশ্বাসে আস্থাশীল ছিলেন। আবার কখনও মনে হয় তা ঠিক নয়। এক সময় রাও 'র'কে বলেন, আদভানি তার বাসায় আলোচনার জন্য আসাটাকে তিনি পছন্দ করছেন না। এ নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়। 'র' তাকে পরামর্শ দেয় যে, ১৯৮৪ সালে অপারেশন ব্লু স্টার শুরুর আগে রাজিব গান্ধী 'র'-এর যে অতিথি ভবনে আকালি দলের নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য ব্যবহার করতেন সেখানে আদভানির সাথে বৈঠক করা যেতে পারে। তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবেন এবং পরামর্শটি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি 'র'কে গোপনে রেকর্ড করার একটি ডিভাইস দিতে বলেন এবং সেটি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানাতে বলেন। রাও নিজ বাসভবনে আদভানির সাথে তার আলোচনা রেকর্ড করতে চান। রেকর্ডারটি তিনি 'র'-এর কাছে পরে ফেরত দেন। রাও আদভানির সাথে আলোচনার সময় এটি আদৌ ব্যবহার করেছিলেন কি না তা জানাননি এবং আলোচনা রেকর্ড করে থাকলে সে রেকর্ডিংয়ের কি হয়েছে তাও জানাননি। 'র'ও নরসিমা রাওকে এ সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

নরসিমা রাও উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি এবং অযোধ্যাগামী হিন্দু স্বেচ্ছাসেবীদের রথযাত্রা নিষিদ্ধ করে বাবরি মসজিদ ধ্বংস ঠেকাতে পারতেন। এজন্য কিছু সহিংসতা হয়তো হতো, তবে এ সহিংসতা হতো ভারত সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে। এতে মারাত্মক ধরনের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ঘটনা ঘটত না। মসজিদ ধ্বংসের কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের হৃদয়ে এতবড় আঘাত হতো না। কিন্তু নরসিমা রাও তা করেননি। কেন তিনি এ ধরনের হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হলেন?

আমলাদের মধ্যে এ ব্যাপারে নানারকম জল্পনা রয়েছে। তবে এর স্পষ্ট কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তার মধ্যে রয়েছে হিন্দুত্ববাদের প্রতি অপার সহানুভূতি। আবার কেউ বলেন, তিনি মসজিদের কোনো ক্ষতি হবে না বলে আদভানির আশ্বাসের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এমনকি অনেকে তার মধ্যে চাণক্য নীতিও অবলোকন করেছেন। তাদের মতে, রাওয়ের নিষ্ক্রিয়তা ছিল টেকনিক্যাল এবং কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য। তিনি পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা নেয়ার মতো একটি ইস্যু থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন, রাও আগে থেকে বড় রকমের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আভাস পেয়েছিলেন তবে একটা সময়ে তা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে মনে করেন। এতে বিজেপি বাবরি মসজিদ ইস্যু থেকে হিন্দুত্ববাদী আবেগ আর জাগাতে পারবে না বলে তিনি মনে করতেন।

এ প্রশ্নের উত্তর যেটিই হোক না কেন, উচ্চপদস্থ আমলাদের মধ্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য ব্যাপক অসন্তোষ ছিল। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ নেই, এটি ছিল একটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং তা নিছক

প্রশাসনিক বা আমলাতান্ত্রিক ব্যর্থতা ছিল না। নরসিমা রাও আমলাদের এ ক্ষোভের বিষয়টি উপলব্ধি করে তার বাসভবনে ভারতের অতিরিক্ত সচিব এবং এর ঊর্ধ্ব পদমর্যাদার সব কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানান। তাদের উদ্দেশে তিনি জ্বালাময়ী ধরনের ভাষণ দেন। এটি ছিল তার একটি উল্লেখ করার মতো উদ্যোগ যা আগের কোনো প্রধানমন্ত্রী কোনো সময় নেননি। নরসিমা রাওয়ের এই ভাষণে ছিল এক ধরনের সংশয় এবং বেশ তর্জন-গর্জন। আমাদের কাছে তার বক্তব্যের অনেক অর্থ হতে পারে বলে মনে হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এ সভা থেকে ফিরে আসার সময় আমি ভাষণে কোনো সারবস্তু খুঁজে পাইনি। নরসিমা রাও আমলাদের সামনে এ বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিষয়টি ছিল জাতির নিয়তি এবং এ ব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে হা-হুতাশ করার কিছু নেই।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর মুসলমানরা সহিংস হয়ে ওঠে। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত মুসলমানদের ওপর পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে। সব সময়ের মতো বিশেষত মুম্বাইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুসলমানরা তাদের প্রতি অতিমাত্রায় শক্তি প্রয়োগ এবং তাদের রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য পুলিশকে অভিযুক্ত করেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মুসলমানদের সহিংস প্রতিবাদ ছিল কাঙ্ক্ষিত। পুলিশ এটাকে বিস্ময়কর কোনো কিছু মনে করেনি।

পুলিশ যেটাতে বিস্মিত হয়েছে তা ছিল ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বাইতে ১২টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণের ঘটনায়। এ ঘটনায় ২৩৫ জন বেসামরিক নিরপরাধ নাগরিক নিহত হয়। ভারতের অভ্যন্তরে ঘটা এটিই ছিল বিপুলসংখ্যক প্রাণক্ষয়ের প্রথম সন্ত্রাসী ঘটনা। ১৯৮৫ সালের জুনে খালিস্তানি সন্ত্রাসীরা কানিষ্কা এয়ারক্রাফট ছিনতাইয়ের পর যে হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল সেটি ছিল আকাশে। ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরে এটি ছিল জিহাদিদের প্রতিশোধমূলক বড় ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা। আইএসআই এ ঘটনায় জিহাদিদের সাথে মাফিয়া অপরাধীদের যোগসূত্র ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল।

এটি ছিল অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর প্রথম বড় ধরনের সন্ত্রাসী আঘাত। ১৯৮১ সালের পর থেকে আইএসআই খালিস্তানিদের অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে বলে আসছিল। ১৯৮৯ সালে তাদের তৎপরতা শুরু করার পর জম্মু ও কাশ্মীরের জিহাদিরা রাজ্যটির পর্যটন অর্থনীতিকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে। ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ এ ক্ষেত্রে তখন দুবাইয়ে বসবাসরত মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমকে ব্যবহার করা হয়। একই সাথে বাবরি মসজিদ এবং এর পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানদের রক্ষায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদেরও বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এরপর থেকে ভারত এবং উপমহাসাগরীয় বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত কিছু সদস্য দিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন মুসলিমের সহায়তায় পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠনগুলো এ কার্যক্রম চালাতে থাকে।

১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য জিহাদি পন্থা গ্রহণের কথা বলে মুসলিম তরুণদের আগ্রহী করতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৮০-এর

দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পাকিস্তান গেলেও ভারতীয় মুসলমানরা তা থেকে নিজেদের দূরে রাখে। তারা ওয়াহাবিবাদ এবং প্যান ইসলামিক ভাবধারায়ও উদ্বুদ্ধ হয়নি। বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের ক্ষোভ এবং বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়নি আর তাদের ক্ষতিকর চিন্তাধারাকে সমর্থনও করেনি।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর থেকে পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যায়। জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরেও মুসলিম যুবকদের একটি অংশ আইএসআই, পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠন ও তাদের ক্ষতিকর চিন্তাচেতনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় মুসলিম যুবকদের মধ্যে প্যান ইসলামিক চরম ভাবাদর্শের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে পাকিস্তান তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক তুলে দিতে পারেনি। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট প্রচণ্ড ক্ষোভ তাদের হাতে সে সুযোগ এনে দেয়। জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশেও আইএসআই সহায়তাপুষ্ট জিহাদি কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করে। এর দায় কংগ্রেসের (আই) নরসিমা রাও এবং বিজেপির এল কে আদভানিকে সমভাবে বহন করতে হবে।

১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ সবাইকে বিস্মিত করে তোলে। না মুম্বাই পুলিশ, না আইবি, না 'র'– কেউই এর কোনো আভাস দিতে পারেনি। তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস-উত্তর মুসলিম দাঙ্গা যে এ ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে তা বুঝে উঠতে পারেনি।

এ ধরনের দাঙ্গা এরপরও মাঝে মধ্যে হয়েছে এবং এটাকে ধামাচাপা দেয়া হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর তারা জিহাদি প্রতিক্রিয়ার জন্য তৈরি ছিল না। তারা এই বিস্ফোরণ নয়াদিল্লি পর্যন্ত পৌঁছতে দেখে সংশয়গ্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে এ ঘটনার পর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া এবং আইএসআই'র বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মাথায় আসে কিন্তু কারা এজন্য দায়ী হতে পারে সে ধারণা তাদের মধ্যে আসেনি।

গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের অনেকে মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসীদের কাজের ধরনের সাথে যুক্তরাজ্যের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) পদ্ধতির মিল দেখতে পান। ১৯৯৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'র' প্রধানের পদ থেকে অবসরগ্রহণকারী এন নরসিমানের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে সেই রাতে আয়োজিত নৈশভোজে ছিলেন 'র' কর্মকর্তারা। মুম্বাইয়ে এমও এবং আইআরএ'র ঘটানো ঘটনার মধ্যে মিল নিয়ে এ নৈশভোজেও আলোচনা হয়। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান এবং আরব বংশোদ্ভূত জিহাদিদের একটি দল বিস্ফোরক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেড এসিডের সহায়তায় নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার উড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। এটি ছিল তাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু এতে সন্ত্রাসীদের টাওয়ার ধ্বংস করার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। মুম্বাই বিস্ফোরণের কয়েক দিন আগে আমি নিউইয়র্ক বিস্ফোরণ এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও ধারণাপত্র তৈরি করি।

যারা আমার এ লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন এবং ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ স্মরণ করেছেন তাদের মধ্যে নরসিমা রাও এবং তদানীন্তন কেবিনেট সচিব এস রাজগোপালও ছিলেন। তাদের মধ্যে যারা এটি দেখেছেন কিন্তু পড়েননি অথবা পড়লেও নিউইয়র্ক বিস্ফোরণের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করেননি তারা ছিলেন 'র' এবং আইবি'র পদস্থ কর্মকর্তারা। মুম্বাই বিস্ফোরণের খবর নয়াদিল্লি পৌঁছার সময় দিল্লির নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বড়জোর অর্ধডজনের মতো ব্যক্তি ছিলেন যারা মুম্বাই বিস্ফোরণের এমও এবং নিউইয়র্ক বিস্ফোরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছেন। যারা পেরেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নরসিমা রাও নিজে, এস রাজগোপাল, নরেন্দ্র চন্দ্র এবং আমি নিজে। নরেন্দ্র চন্দ্র বাবরি মসজিদ ধ্বংস-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলায় নরসিমা রাওকে সহযোগিতা করেন এবং পরে কেবিনেট সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মুম্বাই বিস্ফোরণ যখন সংঘটিত হয় তখন মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ার ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সে বছর গোড়ার দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে তাকে আবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদে ফিরিয়ে নেয়া হয়। শারদ পাওয়ারকে সেখানে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী এবং রাজেশ পাইলট স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। বোমা বিস্ফোরণের পরবর্তী সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মোকাবেলায় নরসিমা রাও, রাজেশ পাইলট এবং শারদ পাওয়ার সর্বোচ্চ মাত্রার দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই পরিস্থিতি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের জন্য শারদ পাওয়ার ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাতে না বাধে এবং আরও সন্ত্রাসী ঘটনা না ঘটে এবং বিস্ফোরণের ঘটনার প্রত্যক্ষ তদন্তের জন্য তিনি নিজের নেতৃত্বে একটি সঙ্কট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেন। রাজেশ পাইলটকে পদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞানীদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছার নির্দেশ দেন নরসিমা রাও। যাতে তারা নিজেরাই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তাকে অবহিত করতে পারেন এবং মহারাষ্ট্র সরকারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করতে পারেন। নরসিমা রাও দিল্লিতে সর্বভারতীয় পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা এবং মহারাষ্ট্র সরকারকে সঙ্কট উত্তরণে সহায়তা দানের জন্য কেবিনেট সচিবের নেতৃত্বে একটি সঙ্কট মোকাবেলা গ্রুপ তৈরি করেন।

তদানীন্তন কেবিনেট সচিব এস রাজগোপাল, স্বরাষ্ট্র সচিব এম ডি গডবোল ও এন রাগুনাথান এই টীমের সদস্য হিসেবে সঙ্কট মোকাবেলায় কাজ করেন। রাগুনাথানকে এর পরপরই মহারাষ্ট্রের মুখ্য সচিবের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। এর আগে বহুদিন আমি এভাবে কোনো টীমকে কাজ করতে দেখিনি। বস্তুত এই তিন কর্মকর্তাই আইএএস ক্যাডার মহারাষ্ট্রের সদস্য হওয়ায় দায়িত্ব পালনে এটি তাদের জন্য বেশ সহায়ক হয়। তারা একে অন্যকে খুব ভালোভাবেই জানতেন। শারদ পাওয়ারও তাদের ভালোভাবে চিনতেন এবং তাদের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন।

রাও সঙ্কট ব্যবস্থাপনা টীমকে রাসায়নিক তদন্তে সহায়তা করার জন্য প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থায় (ডিআরডিও) কর্মরত বিজ্ঞানী এপি আবদুল কালাম ও ড. কে শান্তানামকে মুম্বাই যেতে অনুরোধ করেন। শারদ পাওয়ারের অনুরোধে ১৯৯৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এন নরসিমান অবসর গ্রহণের পর 'র' প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণকারী জে এস বেদিকে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে সহায়তা করার জন্য রাও নির্দেশ দেন। বেশ কয়েক বছর একাধিক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন নিয়ে কাজ করা এবং নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিস্ফোরণের ওপর বিস্তারিতভাবে সমীক্ষার অভিজ্ঞতা থাকায় কেবিনেট সচিব বেদিকে মুম্বাইয়ে আমাকেও সাথে নিয়ে যেতে বলেন। ১৯৯৩ সালের ১৪ মার্চ বেদি একটি বিশেষ বিমানে সকালে মুম্বাই পৌঁছেন। আমিও তার সফরসঙ্গী হই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মুম্বাই বিস্ফোরণের কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের 'র'-এর ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা নেতিবাচকে পরিণত হয়। ১৯৯২ সালে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামার প্রধানমন্ত্রীর একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে এটি ঘটে। 'র'-এর সাথে আলোচনাক্রমে নরসিমা রাও এক গোপন সৌজন্য সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হন দালাইলামাকে। এ সাক্ষাৎকারের বিষয়টি গণমাধ্যমে অপ্রকাশিত থাকার কথা। এর আগেই সব ক'জন পূর্ববর্তী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের সাক্ষাৎ দিয়েছেন যা ভারতীয় জনগণ যেমন জানতে পারেনি তেমনি চীনারাও এ সম্পর্কে অনবহিত থাকত। এ সৌজন্য সাক্ষাৎকারের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত জল্পনা-কল্পনা এড়ানোর জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

'র' রাওকে পরামর্শ দেয়, এ সফরের ব্যাপারটিকে আগে থেকেই চীনাদের অবহিত রাখলে ভালো হবে। 'র' প্রধানমন্ত্রীকে জানায়, চীনা গোয়েন্দা সংস্থা এ স্বচ্ছতার ব্যাপকভাবে প্রশংসা করবে। রাও এ পরামর্শকে গ্রহণ করেন। তখনকার চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেংকে নরসিমা রাওয়ের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠানোর জন্য 'র' একটি খসড়া তৈরি করে। এতে বলা হয়, তিনি দালাইলামাকে একান্তভাবে একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে সৌজন্য সাক্ষাৎ দিচ্ছেন যার কোনো ধরনের রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকবে না। এ বার্তাটি 'র' এবং প্রতিপক্ষ চীনা রাষ্ট্র নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের হটলাইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লি পেংয়ের কাছে পাঠানো হয়।

এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লি পেংয়ের পক্ষ থেকে দালাইলামাকে সাক্ষাৎ দেয়ার ব্যাপারে কড়া প্রতিবাদ আসে। এতে দালাইলামাকে তিব্বতের প্রধান বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং এতে রাজনৈতিক কোনো তাৎপর্য থাকবে না বলে রাওয়ের চিঠিতে উল্লিখিত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়। চীনের এই কড়া জবাবে নরসিমা রাও এ ব্যাপারে কিছুটা পিছিয়ে পড়েন। 'র' প্রধানমন্ত্রী নরসিমাকে জানায়, চীনা জবাবের মধ্যে দালাইলামার প্রতি তাদের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে এবং চীনাদের এ প্রতিবাদ কাঙ্ক্ষিতই ছিল। 'র' রাওকে চীনা প্রতিবাদ নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য পরামর্শ দেয় এবং দালাইলামার সাথে তার সাক্ষাৎ দানের কর্মসূচি নিয়ে সামনে এগোনো উচিত বলে উল্লেখ করে।

নরসিমা রাও 'র'-এর অবস্থানে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'তোমরা যদি চীনাদের এ ধরনের প্রতিবাদের বিষয়টি আগে থেকেই আশা করে থাক তাহলে এ সম্পর্কে আমাকে জানানো উচিত ছিল এবং সাক্ষাৎকারের বিষয়টি জানিয়ে তাদের কাছে বার্তা পাঠানোর পরামর্শ দেয়া অনুচিত ছিল। এই বার্তাই তাদের এতটা কঠোর জবাব দিতে উসকে দিয়েছে।' আমি জানি না পরে তিনি সাক্ষাৎকার দালাইলামাকে দিয়েছিলেন কি না। খুব সম্ভবত তিনি তা দেননি। এরপর থেকে অন্য দেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের ব্যাপারে 'র'-এর পরামর্শ গ্রহণ করতে রাও ইতস্তত করতেন।

মুম্বাই বিস্ফোরণের আগের মাসগুলোতে 'র'-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিভিন্ন কাহিনীও প্রচার করে। 'র'-এর সদর দফতরের একজন পদস্থ কর্মকর্তা সংস্থার মিজোরাম পোস্ট পরিদর্শনের সময় মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্ত্রী অভিযোগ করেন, তার স্বামী ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু সংস্থার লোকদের নিগ্রহে মনোবল হারিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিছু কর্মকর্তা তাকে এই অভিযোগটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেন।

'র'-এর সিনিয়র কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্ত্রীসহ এআরসি'র বিমান ব্যবহার করে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন এবং দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের দুই সন্তানকে রিচার্স অ্যান্ড এনালাইসিস সার্ভিসে (আরএএস) নিয়োগ করেছেন বলে নরসিমা রাও বেনামী অভিযোগ পান। রাও বিশেষভাবে বিব্রত হন নিয়োগের তালিকা অনুমোদনের জন্য তার কাছে পাঠানোর সময় এ দু'জন 'র'-এর সিনিয়র দু'কর্মকর্তার পুত্র হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ না করায়। নিয়োগের ব্যাপারে অজ্ঞাতনামার অভিযোগ পাওয়ার পর নরসিমা রাও কেবিনেট সচিবকে সংস্থার প্রত্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে অনুসৃত নীতিমালাটি যাচাই করার জন্য বলেন। কেবিনেট সচিবের অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কয়েক মাসের জন্য আরএএস'র প্রত্যক্ষ নিয়োগ বন্ধ থাকে। অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রাজ্য এবং আইবি থেকে অধিকসংখ্যক আইপিএস কর্মকর্তাকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য 'র'তে ডেপুটেশনে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর আগে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) আওতা থেকে 'র'কে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টিও রহিত হয়ে যায়।

'র'-প্রধান হওয়ার ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদনও বের হয়। তদন্তে জানা যায়, সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এর পেছনে ভূমিকা রেখেছেন। এমন অভিযোগও ওঠে যে, এক তামিল মাফিয়া 'র'-এর নিয়ন্ত্রণ নিতে চাচ্ছে। এর মধ্যে সিআইএ'র এক অভিযোগকে কেন্দ্র করে আইবি'র সাথে 'র'-এর সম্পর্কের আবার অবনতি ঘটে। 'র'-এর কাছে সিআইএ অভিযোগ করে, ওয়াশিংটনে প্রশিক্ষণের জন্য যাওয়া আইবি'র কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা সেখানে থাকাকালে স্ত্রীদের বিল পরিশোধ না করে চলে এসেছেন। আইবি 'র'-এর ওপর এ কারণে ক্ষুব্ধ হয় যে, তারা বিল শোধ না করার বিষয়টি লিখিতভাবে না জানিয়ে মৌখিকভাবে জানালেও পারত। পদস্থ কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের সময় বেগমদের সাথে নেয়ার প্রবণতা

বাড়তে থাকে। একই সাথে তাদের খরচের আনুপাতিক সরকারি অংশ পুনঃজমা না করে স্ত্রীদের জন্য খরচের অভিযোগও উঠতে থাকে। এসব আপত্তি এবং অভিযোগ নরসিমা রাওয়ের মনে 'র' সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে।

সৌভাগ্যবশত এই বিরূপ ধারণা দীর্ঘায়িত হয়নি। মুম্বাই বিস্ফোরণের সফল তদন্ত অনুষ্ঠানে অবদান রেখে 'র' তাদের সুনাম ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। বিস্ফোরণ ঘটানোর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আইএসআই'র প্রশিক্ষণের জন্য দুবাই থেকে করাচি আসা এবং আবার দুবাই ফিরে যাওয়ার টিকিটপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করে 'র'। দুবাইয়ের পাকিস্তানি মিশন তাদের পাসপোর্টের পরিবর্তে সাদা কাগজে ভিসা ইস্যু করে যে তাদের পাকিস্তান ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে তার কাগজপত্রও 'র' সংগ্রহ করে। সংস্থাটি এমন কাগজপত্রও জোগাড় করে যাতে দেখা যায়, হামলাকারীরা প্রস্তুতির জন্য করাচি আসার পর আইএসআই কর্মকর্তারা তাদের টারমাকে রিসিভ করেছেন এবং ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তাদের বিমানবন্দরের বাইরে নিয়ে যান। বিস্ফোরণকারীদের কারো কারো বিস্ফোরক নিয়ে কাঠমান্ডু হয়ে দুবাই যাওয়ার কাগজপত্রও 'র' সংগ্রহ করে। নরসিমা রাও মন্তব্য করেন, 'র' যে প্রমাণাদি এ ব্যাপারে সংগ্রহ করেছে তা স্বর্ণের চেয়েও দামি। আইবিও 'র'-এর ব্যাপারে তাদের সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির কথা ভুলে যায় এবং দুই সংস্থা একে অপরকে তদন্তকাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে।

শারদ পাওয়ার তার গণমাধ্যমের সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলার স্বভাবের কারণে 'র'-এর কিছু সূত্রের কথা ফাঁস করে ফেলেন। এতে 'র'কে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র প্রদানকারী কিছু ব্যক্তির নাম প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং কিছু লোক তাদের চাকরি হারায়। কিছু কিছু চাকরিচ্যুত সোর্সের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। 'র' কেবিনেট সচিবের কাছে সংস্থার দলিলপত্রের সূত্র শারদ পাওয়ারের গণমাধ্যমকে জানানোর ব্যাপারে কড়া আপত্তি জানায়। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, 'র' সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণাদি শুধু আইবি, কেবিনেট সচিব অথবা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। এরপর 'র'-এর সোর্সগুলোর জন্য কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি ছাড়াই আইবি এর প্রয়োজনীয় ফলোআপ সম্পন্ন করে।

'র'-এর মনিটরিং বিভাগ অপরাধীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কাঠমান্ডু, দুবাই ও করাচিতে যে টেলিযোগাযোগ হয়েছে তা আড়ি পেতে সংগ্রহে চমৎকার ভূমিকা পালন করে। এটি বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, অপরাধীদের কথাবার্তার মধ্যে করাচিতে থাকা দাউদ ইব্রাহিমের সংলাপও রয়েছে। ফোনের এসব সংলাপে শুধু ঘটনা ঘটানোর পর পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ই নয়, অধিকন্তু ভারতে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ গল্প-গুজবও রয়েছে। এসব গল্প-গুজবে রাও মন্ত্রিসভার সদস্য কল্পনাথ রাইয়ের নামের প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দাউদ ইব্রাহিমের চক্রের একজন সদস্য নয়াদিল্লিতে রাইয়ের চাকরের বাসায় থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় এতে। অন্য এক উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, রাইয়ের অফিস থেকে অন্য একজনকে একটি সরকারি অতিথি ভবনে থাকার ব্যাপারে সহায়তা করা হয়েছে। এসব আড়িপাতা তথ্যাবলি নরসিমা রাওয়ের দৃষ্টিতে আনা হয়।

মুম্বাই বিস্ফোরণের পরপরই মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বরাবরের মতো তার দেশের নাগরিকদের ভারত ভ্রমণ এবং ভারতে অবস্থানরত কূটনীতিকদের সব ভ্রমণ কর্মসূচি স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময় ভারতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত থমাস পিকারিংকে মস্কোতে বদলি করা হলেও তিনি নতুন কর্মস্থলে তখনও পর্যন্ত যোগ দেননি। পররাষ্ট্র দফতরের নির্দেশনা পেতে তিনি কিছু দিনের জন্য দিল্লিতে আটকে যান। পিকারিং মস্কোতে নতুন মিশন শুরু করার ব্যাপারে ধৈর্যহারা হয়ে ওঠেন। তিনি পররাষ্ট্র দফতরে মস্কোর উদ্দেশে রওনা দেয়ার অনুমতি দানের জন্য চেষ্টা-তদবির শুরু করেন। তাকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে সে অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয়। মার্কিন দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা এ সময় আমাকে ফোন করে এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। আমি তাকে বলি, তোমার রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দেয়ার জন্য আমি কে? তোমার পররাষ্ট্র দফতর এ ধরনের নির্দেশনা জারির আগে কখনও আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ করেনি যা সম্পূর্ণভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত। তুমি তোমার রাষ্ট্রদূতকে তার পররাষ্ট্র দফতর থেকে পরামর্শ নিতে বল। তিনি জানান, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরই আমাদের পরামর্শ নিতে বলেছে। আমি এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দিতে রাজি হইনি। সেই সময়কার দিনগুলো ছিল এমন যখন আমরা আমেরিকানদের ভয়ে ভীত ছিলাম না এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে আমাদের পেছনে রয়েছে সে আস্থা পুরোপুরি ছিল। সেই দিনগুলো এখনকার মতো ছিল না যখন আমেরিকানদের অনুগ্রহ লাভের জন্য আমরা নত হয়ে পড়ছি। এর অল্প ক'দিন পর পিকারিং মস্কোর উদ্দেশে রওনা দেয়।

এ সময় তদানীন্তন কানাডীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেইজিং যাওয়ার পথে নয়াদিল্লিতে ১ দিনের যাত্রাবিরতি করতে গিয়ে আটকে যান। নিরাপত্তা বিষয়ে কানাডীয়রা সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে। কানাডীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অযাচিত বিলম্বের জন্য ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন। নয়াদিল্লির কানাডীয় হাইকমিশনকে তাদের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একইভাবে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়। কানাডীয় হাইকমিশনের একজন কর্মকর্তা আমার সাথে দেখা করেন। আমি তাকে বলি, 'তোমরা যেহেতু আমেরিকানদের নির্দেশনা অনুসরণ করছ সেহেতু তাদের জিজ্ঞেস করাটাই ভালো। কেন তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছ?' এর কয়েক ঘণ্টা পর এই কর্মকর্তা আবার ফিরে এসে জানান, তার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ছাড়পত্র চাচ্ছেন।

আমি তাকে বলি, তার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারব না তবে আমি আমার প্রধানমন্ত্রীকে কি পরামর্শ দিতাম সেটি তাকে জানাতে পারি যদি তার এ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ থাকে। আমি আরও বলি, আমার প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলতাম, 'স্যার আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সম্ভব সব রকমের নিরাপত্তা সতর্কব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরপরও কেউ শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, কোনো সন্ত্রাসী দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হলে কোনো আঘাত হানতে পারবে না। এ জন্য আপনি স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বন্ধ থাকতে দিতে পারেন না। যদি সেটিই করেন তাহলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্ধেক হেরেই বসে থাকবেন।'

কানাডীয় কর্মকর্তা প্রশ্ন করেন, 'তুমি যদি এভাবে কথা বলো তাহলে তোমার

প্রধানমন্ত্রী কিছু মনে করবেন না।' জবাবে আমি বলি, 'না, তিনি কিছু মনে করবেন না। বরং তিনি একথার প্রশংসা করবেন।' কানাডীয় হাইকমিশনের এই কর্মকর্তা বিষয়টি তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাবেন কি না জানতে চান। আমি তাকে জানাই যে, হ্যাঁ জানাতে পারো। সেই রাতেই কানাডীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেইজিংয়ের উদ্দেশে নয়াদিল্লি ত্যাগ করেন। বিস্ফোরণ ঘটার পরপরই নরসিমা রাও 'র'-এর একটি পরামর্শ গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়েছিল, বিস্ফোরণের পরপর পুলিশ যেসব বিস্ফোরণের নমুনা সংগ্রহ করেছে তা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য পশ্চিমা সংস্থার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হোক যাতে তারা ঘটনাস্থল, অস্ত্র ও পুলিশের সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করতে পারে। বিস্ফোরণে ব্যবহৃত টাইমারটি ছিল আমেরিকার তৈরি, হ্যান্ডগ্রেনেডটি ছিল অস্ট্রেলীয় ডিজাইনের আর একে-৪৭ রাইফেল ছিল চীনের তৈরি। এসব প্রমাণ ইঙ্গিত দেয়, সন্ত্রাসীরা এসব পেয়েছে আইএসআই'র কাছ থেকে।

বিস্ফোরণের সাথে সাথেই পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে এ যুক্তি কাজ করে যে, এসব বিশেষজ্ঞ তাদের বিশ্লেষণকে আমাদের সাথে বিনিময় না করলেও অন্ততপক্ষে সেসব দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জানাবেন যে, বিস্ফোরণের পেছনে আইএসআই'র হাত রয়েছে বলে তারা মনে করে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অস্ট্রেলীয় নকশার কিছু হ্যান্ডগ্রেনেড ও টাইমার উদ্ধার করে। অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞরা নয়াদিল্লি এসে এসব পরীক্ষা করে দেখে এবং লিখিতভাবে জানায় যে, এসব হ্যান্ডগ্রেনেড অস্ট্রেলীয় ডিজাইনের এবং পাকিস্তানের কাছে একটি অস্ট্রেলীয় কোম্পানির বিক্রি করা প্রযুক্তি ও মেশিন টুলসের সমরাস্ত্র কারখানায় এটি তৈরি করা হয়েছে। তারা ভারত সরকারকে জানায় যে, এ রিপোর্ট তারা যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারে।

আমাদের আমন্ত্রণে মুম্বাই পরিদর্শনে আসা আমেরিকান কাউন্টার টেররিজম বিশেষজ্ঞ টাইমারটি দেখে বলেন, এটি দেখতে মার্কিন তৈরি টাইমারের মতো। তারা এটি রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে চান। পরীক্ষা শেষে তা আবার ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করেন তারা। আমি এ বিষয়ে একমত হই। এর কয়েক দিন পর একটি সাদা অস্বাক্ষরিত কাগজে তারা জানায়, টাইমারটি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি এবং ১৯৮০-এর দশকে পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া কনসাইনমেন্টের একটি অংশ ছিল এটি।

আমি উল্লেখ করি তারা এখন ঘোষণা করতে পারবে যে, পাকিস্তান সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী একটি রাষ্ট্র। জবাবে তারা বলে, পাকিস্তান সরকারের বিপক্ষে এ ধরনের ঘোষণা দেয়ার জন্য এটি মোটেই পর্যাপ্ত প্রমাণ নয়। তারা দাবি করে, পাকিস্তান সরকারের সমরাস্ত্র মজুদ থেকে পাচার হয়ে অস্ত্রের চোরাই বাজারে যাওয়ার দৃষ্টান্ত এর আগেও পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীরা সে বাজার থেকে এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে থাকতে পারে। তারা আরও উল্লেখ করে, যুক্তরাষ্ট্রের রিপোর্ট কোনো বিচারিক আদালতে ব্যবহার করা যাবে না।

আমি যখন তাদের টাইমারটি ফেরত দেয়ার কথা বলি তখন তারা জানায়,

ভুলক্রমে তাদের রাসায়নিক কারখানা টাইমারটি ধ্বংস করে ফেলেছে এবং তারা এ জন্য রাসায়নিক কারখানায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমার অবসর গ্রহণের পর কাও এবং অন্যদের বলি কিভাবে আমেরিকানরা টাইমারটি ধ্বংস করে আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। একদিন কাও আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কিভাবে তাদের এতটা বিশ্বাস করলে এবং টাইমারটি তাদের হাতে তুলে দিলে। পাকিস্তানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে কারো বিশ্বাস করা উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্র ভারতে পাকিস্তান যাই করুক না কেন তাতে দেশটির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবে না। এ বিষয়টি অতীতে যেমন সত্য ছিল এখনো তাই রয়েছে।'

মুম্বাই পুলিশের এক সূত্র থেকে নয়াদিল্লিতে কর্মরত এক ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্কিন বিশেষজ্ঞরা মুম্বাই সফরকালে তাদের আগমন এবং তারা কোন হোটেলে থাকছেন সে সম্পর্কে জানতে পারেন। এই সাংবাদিক তাদের ফোন করেন এবং একটি সাক্ষাৎকার নিতে চান। আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা জোরালোভাবে এ ব্যাপারে না করে দেন এবং তারা যে কাউন্টার টেররিজম বিশেষজ্ঞ সেটিও অস্বীকার করেন। পরে তারা ভারতে তাদের সফরকে সংক্ষিপ্ত করে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। দৃশ্যত তারা ভীত ছিলেন যে, আমেরিকা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করতে ভারতকে সাহায্য করছে মর্মে জানাজানি হয়ে গেলে ভারতে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকরা সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে।

মুম্বাই সফরকারী ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা মুম্বাই পুলিশের উদ্ধারকৃত একে-৪৭ রাইফেল এবং এর গোলাবারুদ চীনে তৈরি হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতকে সহায়তা দেয়। তারা চীনের কোন কারখানায় এই রাইফেল কোন সময়ে তৈরি হয়েছে তাও জানায়। এরপর আমরা চীনকে মুম্বাইয়ে উদ্ধারকৃত একে-৪৭ রাইফেলটির বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তারা পাকিস্তানের কাছে এটি বিক্রি করেছে কি না তা জানাতে বলি। চীন জানায়, তাদের সমরাস্ত্র কারখানার রেকর্ডপত্র ঠিকমতো রাখা নেই বলে একে-৪৭ রাইফেল কাকে কখন বিক্রি করা হয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহে তারা সক্ষম নয়। তারা উল্লেখ করে, একে-৪৭ রাইফেল এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে চীন বিক্রি করেছে। তারা আরও বলে, মুম্বাই থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রটি সন্ত্রাসীরা পাকিস্তান থেকে পেয়েছে তা বলা যায় না।

মুম্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানির জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করার ব্যাপারে সিআইএ এবং চীনা গোয়েন্দা সংস্থার পরিষ্কারভাবে অনাগ্রহের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই উভয় সংস্থা একে অন্যের পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত না হয়েই বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে সহযোগিতা এবং গণমাধ্যম থেকে দূরে থেকে বিষয়টি নিয়ে দু'দেশের গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানের মধ্যে আলোচনার আয়োজন করার প্রস্তাব দেয়। তখনকার সিআইএ'র পরিচালক জেমস ওলসে ইসলামাবাদে নওয়াজ শরিফের সাথে আলোচনার পর যৌথ টেররিজম মেকানিজম তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ টেররিজম মেকানিজম তৈরি করার যে পরামর্শ দিয়েছিল পরে সে ধরনের প্রস্তাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে হাভানায় জেনারেল মোশাররফের সাথে আলাপকালে একমত হয়ে

আসেন। চীনের প্রস্তাবটি আসে একে-৪৭ রাইফেল এবং এর গোলাবারুদ বিক্রিসংক্রান্ত বিষয়ে লিয়াজোঁ চ্যানেলে 'র'-এর সাথে যোগাযোগের পর।

নরসিমা রাও দুই প্রস্তাবই নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, 'র'-এর সাথে সিআইএ'র সম্পর্কের ২৫ বছরে কাউন্টার টেররিজমের ব্যাপারে কোনো আমেরিকান সহযোগিতা ভারত পায়নি। পাকিস্তানের সাথে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার ব্যাপারে সহযোগিতার পরামর্শ দেয়ার আগে এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সততার সাথে ভারতকে সহযোগিতা প্রদান করা। আমরা জানি জুলফিকার আলী ভুট্টো কিভাবে সিমলায় ইন্দিরা গান্ধীকে বিভ্রান্ত করেছেন। তিনি মৌখিকভাবে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখাকে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে নির্ধারণের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তার সৈন্যদের ফেরত নেয়ার পর এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়ার কথা ভুট্টো বেমালুম অস্বীকার করেন। এখন হামিদ গুল সিয়াচেন নিয়ে ভার্মার সাথে বৈঠকের বিষয়টি পর্যন্ত অস্বীকার করছেন। এ অবস্থায় 'র' এবং আইএসআই'র মধ্যে সহযোগিতার কোনো ফল পাওয়া যাবে বলে চিন্তা করাই হবে মারাত্মক কল্পনাবিলাস। আমাদের বারবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে দেয়া ঠিক হবে না। নরসিমা রাও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রস্তাবের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কোনো জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের নীরবতা দিয়েই তাদের বুঝতে দেয়া উচিত আমরা এটি চাই না।

কেউ মনে করতে পারেন, রাওয়ের এ প্রত্যাখ্যান তখনকার পররাষ্ট্র সচিব জে এন দিক্ষিতের পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি মনে করতেন, হামিদ গুলের সাথে আলোচনায় ভার্মা তাকে দেয়া এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন। হামিদ গুলের সাথে সাক্ষাৎকালে ভার্মাকে শুধু সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের সহায়তা নিয়ে কথা বলার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। এটি সত্যি যে, রাজিব গান্ধী ভার্মা-গুল সংলাপে শুধু ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে পাকিস্তানের সহায়তা নিয়ে আলোচনায় সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন প্রথম বৈঠকে হামিদ গুল সন্ত্রাসবাদের চেয়েও সিয়াচেন নিয়ে আলোচনায় অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন তখন রাজিব গান্ধী নিজেই সিয়াচেন নিয়ে আলোচনায় ভার্মাকে উৎসাহিত করেন।

নরসিমা রাওয়ের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের 'র'-আইএসআই আলোচনার আয়োজনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলেও ভারত ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে আনুষ্ঠানিক লিয়াজোঁ ছাড়া হলেও অনানুষ্ঠানিক সংলাপের ব্যাপারটি আলোচিত হতে থাকে। দিক্ষিতের অভিমত ছিল পরিষ্কার। তার মতে, এ ধরনের কোনো সংলাপ অথবা লিয়াজোঁ কোনোটারই প্রয়োজন নেই। যদি কোনো পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী এর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন তাহলে বিষয়টি 'র'-এর পরিবর্তে আইবি'রই দেখা উচিত। দিক্ষিতের মনে এ অসন্তোষ রয়ে যায় যে, তিনি পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার থাকাকালে তাকে 'র'-এর অপারেশনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। তিনি মনে করেন, তার ক্ষেত্রে 'র' কর্মকর্তাদের চেয়ে আইবি কর্মকর্তারা অনেক বেশি স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিস্ফোরণের কয়েক দিনের মধ্যেই মুম্বাই পুলিশ, আইবি ও 'র' বিস্ফোরণের জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। একই সাথে তারা সন্ত্রাসীদের পাকিস্তানে

প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সেখানে যাওয়া এবং সেখান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ আর বিস্ফোরণকালে একটি অব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণাদি পায়।

কোনো সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এর তদন্তকাজে আমরা খুবই দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছি কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটার আগে তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সাফল্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। আমাদের সতর্কমূলক গোয়েন্দা তথ্য না পাওয়ার কারণে এটি ঘটেছে তা নয়। প্রতিটি সফল সন্ত্রাসের ঘটনার ক্ষেত্রে এর আগে সময়মতো ও সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রাপ্তিতে আগাম সন্ত্রাস প্রতিরোধের ঘটনা অনেক ঘটেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যা ঘটেছে তা দিয়েই সাফল্য পরিমাপ করে যা ঘটতে পারত কিন্তু প্রতিহত করা হয়েছে তা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয় না।

বিস্ফোরণের কয়েক মাস পর মুম্বাইয়ের বিস্ফোরণের গোয়েন্দা ব্যর্থতা দায়ী কি না এ মর্মে নয়াদিল্লিতে বিতর্ক ওঠে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাদের ব্যর্থতার অভিযোগে কঠোরভাবে আপত্তি জানায়। তারা উল্লেখ করে, তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে মহারাষ্ট্রে নিয়োগকৃত ব্যক্তিরা জানতেন উপকূলে গোপনে কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ নেমেছে। তাদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তারাও ছিলেন। তারা এসব ব্যবহারের জন্য নেমেছে কি না এ ব্যাপারে জানতেন না এবং এ বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করেনি। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরও উল্লেখ করেন, এতে প্রমাণ হয় এটি গোয়েন্দা ব্যর্থতার ঘটনা ছিল না, এটি ছিল সমন্বয়হীনতার বিষয়। সরকার তখন গোয়েন্দা ব্যর্থতার তদন্তের জন্য আর কোনো আদেশ জারি করেনি।

মুম্বাই বিস্ফোরণের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরিফ। তিনি কঠোরভাবে মুম্বাই বিস্ফোরণের সাথে পাকিস্তানের আইএসআই'র জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে এরপর প্রধানমন্ত্রী হওয়া বেনজির ভুট্টো ১৯৮৮-৯০ মেয়াদের বেনজিরের তুলনায় বেশ খানিকটা ভিন্নরকমের ছিলেন। প্রথম মেয়াদে বেনজির জম্মু ও কাশ্মীরে আইএসআইকে কাজ করার একচ্ছত্র স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কিন্তু পাঞ্জাবের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। ১৯৯৩ সালের শেষে নতুন করে ক্ষমতায় আসার পর সেটুকু নিয়ন্ত্রণও তিনি প্রত্যাহার করেন। এ সময় আইএসআই ভারতের যেকোনো অংশে সন্ত্রাসী ঘটনায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার ব্যাপারে এখতিয়ার লাভ করে। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রথম বার্ষিকীতে আইএসআই'র ইন্ধনে সিমি উত্তর ভারতে রেলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

আইএসআই ভারতের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইন্ধন জোগানোর পরও পাকিস্তান দেখে যে সিন্ধুতে বিশেষভাবে করাচির পরিস্থিতির অবনতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে নজিবুল্লাহর পতনের পর পাকিস্তানপন্থী আফগান সরকারের মধ্যেও তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। কাবুলে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করার আইএসআই'র প্রচেষ্টায় বিক্ষুব্ধ আফগান মুজাহিদ গ্রুপগুলো আইএসআই এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হেজবে ইসলামির পাকিস্তানপন্থী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তা চায়।

করাচির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে বেনজির ভুট্টো মার্কিন পররাষ্ট্র

দফতরে তার বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করে, সিন্ধু থেকে পাকিস্তানি পাঞ্জাব পর্যন্ত সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে কলকাঠি নাড়ছে 'র'। ভারত তার অভিযোগ কড়াভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মুম্বাই বিস্ফোরণের সাথে জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। আটক ব্যক্তি বিস্ফোরণের পর করাচিতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্ফোরণের সাথে জড়িতদের আইএসআই'র নিয়োগ প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দেয়া আর অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার জন্য নির্বাচন আর পুরো ষড়যন্ত্রে দাউদ ইব্রাহিমের সম্পৃক্ততার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এতে আরও প্রকাশ পায়, কিভাবে আইএসআই ঘটনার সাথে জড়িতদের ব্যাংককে স্থানান্তর করে এবং করাচিতে তাদের অবস্থান লুকানোর জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যাংককের হোটেলে কিছুদিন রাখেন। 'র' পৃথক সূত্র থেকে জানতে পারে দুবাই কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে দাউদ ইব্রাহিম তার অফিস ও আভাসস্থল দুবাই থেকে করাচিতে সরিয়ে নেন। তিনি সেখানে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে থাকেন।

ভারত সরকার এ সবকিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিতে আনে কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যক্রমে পাকিস্তানকে দায়ী করা এবং দেশটিকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হয়নি। এর পরিবর্তে বেনজির ভুট্টো যখন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে তার বন্ধুদের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি ছাড়াই সিন্ধুতে সহিংসতা সৃষ্টির জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করে ওয়াশিংটন তাকে গুরুত্বের সাথে নেয় এবং প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদান করে। এতে আবারো প্রমাণ হয়, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য অনেক কিছু করতে প্রস্তুত রয়েছে।

পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রটেকশন আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের সময় ছিল। পাকিস্তানি ভূখণ্ডে জিহাদিদের বিকাশ ঘটার সময় আর পাক-আফগান সীমান্ত অঞ্চলে আল কায়েদা তালেবান এবং আরও অসংখ্য জিহাদি সংগঠন বিকশিত হওয়ার সময় ওয়াশিংটন চোখ বন্ধ করে ছিল। এসব সংগঠন নিরপরাধ ভারতীয়দের হত্যার সময়ও মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর পাকিস্তান ভুল কিছু করছে না বলে উল্লেখ করে তাদের পাশে দাঁড়ায়। শুধু ১১ সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী আঘাত খোদ যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছলে আমেরিকানরা চোখ খুলতে শুরু করে– তাও আংশিকভাবে। পাকিস্তানের নেয়া ভুল পদক্ষেপের পরিণতি থেকে এ দেশটিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অতি উদ্বেগ মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নীতিনির্ধারক কর্মকর্তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়।

আমি যুক্তরাষ্ট্রে এটি ঘটুক তা চাই না তবে আমি মনে করি, কোনোদিন যদি যুক্তরাষ্ট্রে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটে থাকে তা ঘটবে পাকিস্তানে তৈরি অস্ত্র থেকে। শুধু তখনই মার্কিন চোখ পুরোপুরি উন্মোচিত হবে। তখন বেশ খানিকটা দেরিই হয়ে যাবে এবং তা হাজার হাজার মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর পরই ঘটবে। সেটিই যদি আমেরিকান কর্মফল বা ভাগ্য হয় তাহলে কিভাবে কেউ তাদের সাহায্য করবে।

পরিচ্ছেদ : উনিশ

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি

অতএব, ২৭ বছর গোয়েন্দাবৃত্তির পর ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট আমি অবসর নিলাম। কেউ জানতেন না আমি তখনও বেঁচে আছি। আমার কত যে ছদ্মনাম ছিল! সেদিন সন্ধ্যায় গাড়িতে করে যখন আমাকে বাসায় নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম যে, আমি আর ঘোমটার আড়ালে থাকব না। ২৭ বছরের ঘোমটা ছিঁড়ে আমি আমার স্বরূপ প্রকাশ করব। আমি লিখব। আমি পড়ব। আমি কথা বলব। আমি অন্যদের একজন সাবেক গোয়েন্দার চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখাব।

১৯৯৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'দি হিন্দুস্তান টাইমসে' আমার প্রথম নিবন্ধ ছাপা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড হিউম্যান রংস'।

প্রথম প্রথম আমি সপ্তাহে দু'টি করে নিবন্ধ লিখতাম। তারপর চারটা। বর্তমানে সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই একটি করে লিখি। অবসর গ্রহণের পর থেকে আমি কী পরিমাণ নিবন্ধ লিখেছি তার সংখ্যা আমার মনে নেই। পাকিস্তানের একজন পাঠক তার হিসাব রাখেন।

এসব কারা পড়ছেন? আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়।

কে পড়ল আর না পড়ল সে তোয়াক্কা আমি করি না। কেউ না পড়ুক। যারা পড়বে না তারা হারাবে। আমার কিছুই হবে না।

আপনি কী করে খোলাখুলি বলতে পারেন আপনি 'র'-তে ছিলেন?

হ্যাঁ, আমি তা পারি। লোকজন বরং প্রত্যক্ষ সূত্র থেকে জানুক, এটাই ভালো।

অন্যথায় যদি আমি আমার 'র'-এর ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা অস্বীকার করি, তাহলে লোকজন যেকোনোভাবেই হোক এটা অনুমান করে নেবে। তারপর তারা জল্পনা-কল্পনা করতে থাকবে আমি কেন আমার অতীত পরিচয় গোপন করছি।

আপনি কি আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নন? আপনি কি নানান ধরনের সন্ত্রাসীদের গালমন্দ করে বেড়াচ্ছেন না?

কেন আমি উদ্বিগ্ন হব?

আপনি কি আপনার দৈহিক নিরাপত্তা চাননি? আরও অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা এটা চেয়েছেন, যদিও তাদের নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি নেই।

আমি কখনও এটার প্রয়োজন বোধ করিনি।

এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবসর গ্রহণের প্রথম কয়েকটি মাসে আমি এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। এখন আর সে ধরনের প্রশ্ন কেউ করেন না।

একজন সরকারি কর্মকর্তা অবসরে যাওয়ার পর দিল্লিতে অন্তত চার মাস সরকারি বাসায় থাকতে পারেন।

প্রত্যেকেই এমনটা করেন এবং অবসর গ্রহণের পর আরেকটা নতুন চাকরি খুঁজতে থাকেন।

আমি তা করিনি। তদুপরি আমাকে এ ধরনের একটা চাকরির প্রস্তাব দেয়া হলেও সেটা প্রত্যাখ্যান করি।

আমি তল্পিতল্পা গুছিয়ে একেবারে সোজা চেন্নাইয়ের উদ্দেশে দিল্লি ত্যাগ করি ১৯৯৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর।

লোকটার এত তাড়া কিসের?

এ ধরনের নানান জল্পনা-কল্পনার জাল বিস্তার হতে থাকে অনেকেরই মাঝে।

মুম্বাইয়ের একটি জার্নালে এ মর্মে খবর বেরোয় যে, আমি 'র'-এর বহু টপ সিক্রেট ফাইল নিয়ে প্যারিস চলে গিয়েছি এবং সেখানে আমি একজন অতি সুন্দরী ও সেক্সি ফরাসি মহিলার সাথে বসবাস করছি যার সাথে প্যারিসে চাকরি করা অবস্থায় আমার পরিচয় ঘটেছিল।

আমি পত্রিকা সম্পাদককে লিখলাম, 'আপনারা যা লিখেছেন তা সত্য হোক সেটা আমি একান্তভাবেই চাই। একজন সুন্দরী ও সেক্সি ফরাসি মহিলাকে প্রতি রাতে কাছে পাওয়ার চেয়ে আর অধিক পছন্দের আমার কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এটা সত্য নয়! আমি চেন্নাইয়ে একটি ছোট্ট তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডে বসবাস করছি।'

তিনি কখনও ক্ষমা চাননি। কিংবা কখনও সংশোধনীও ছাপেননি।

একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে আমার পেশা কি আমাকে তৃপ্তি দিয়েছিল?

নিশ্চয়ই দিয়েছিল। ছদ্মনাম ব্যবহার আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। একজন গোয়েন্দা হিসেবে ছদ্মনাম ব্যবহার আমার কাছে ভালো লাগত।

কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার গুণটা আমার মধ্যে সহজাত। আমাকে কোনো কিছুই এত বেশি আনন্দ দিতে পারেনি যতটা দিয়েছে গোয়েন্দা বিশ্লেষক হিসেবে কাটানো আমার দিনগুলো।

দ্রুত চিন্তা করা এবং সে চিন্তাগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করার ক্ষমতা আমার ছিল। অন্যথায়, একজন গোয়েন্দা হিসেবে আমি যা কিছু অর্জন করেছি তা করা সম্ভব হতো না।

ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারটিও আমার মধ্যে সহজাত। এটার ঘাটতি থাকলে এ পেশায় কোথাও আমার ঠাঁই হতো না।

এ পেশায় থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।

কখনও বড় বড় কথা বলবেন না। বড় বড় কথা অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপায়ে ফিরে

এসে দংশন করে।

আপনার সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করবেন না। তা করতে পারলে আপনার সীমাবদ্ধতাকে জয় ও ভবিষ্যৎ ব্যর্থতাগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

কঠিন ও দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ভাষার ক্ষেত্রে কাঠিন্য ও দুর্বোধ্যতার চেয়ে আর কোনো জিনিস এত বেশি পীড়াদায়ক নয়।

নিজের ব্যাপারে কঠোরতা এবং অন্যের ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করুন। তাহলে সবাই আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন, ভালোবাসবেন।

যাকে বা যেখানে কৃতিত্ব দেয়ার প্রয়োজন তা দিন। কৃতিত্ব পাওয়ার লোভ নিজে সংবরণ করুন। এ জিনিসটার চেয়ে আর কোনো কিছু মানুষকে এতটা সস্তা করে না।

কতই না চমৎকার ধরনের উর্ধ্বতন ব্যক্তির সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তারা এই সংস্থাটিকে দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছিলেন। তারা এটাকে দিল্লির সবচেয়ে মর্যাদাবান আমলাকেন্দ্রের চেয়েও মর্যাদার শিখরে আরওহণ করিয়েছেন।

কতই না চমৎকার ধরনের জুনিয়র সহকর্মীর সাথে আনন্দ-ফূর্তিতে কাজ করেছি। তারা না হলে উর্ধ্বতনদের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাতাসে মিলিয়ে যেত। তারাই এটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তাদের মধ্যকার উৎসাহ-উদ্দীপনাই এই সংস্থাটির পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

'র' একটি জীবন্ত সংস্থা। এটা মহীরুহে রূপ নিতে থাকবে। এটা কখনও শেখার পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

সব জীবন্ত সংগঠনের মতোই 'র'-এরও সুদিন রয়েছে; রয়েছে দুর্দিনও।

এর রয়েছে নানা গৌরবগাথা, রয়েছে নানা ব্যর্থতা।

'র'-এর মতো একটি সংস্থাই কি আমাদের প্রয়োজন? আর, আমরা কি আদৌ এমন একটি সংস্থার উপযুক্ত?

অংশত ভয়টাই সত্য।

এটা প্রবাদ বাক্যের কিউরেটস এগ্-এর মতো– যার মধ্যে ভুল ও মন্দ উভয় দিকই রয়েছে।

ভারতের মতো একটি উদীয়মান শক্তি, যেটি ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর কাতারে শামিল হওয়ার আশা পোষণ করছে, তার অবশ্যই একটি বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখা থাকতে হবে। এবং সেটি হবে এমন একটি শাখা যার দেখাশোনা, ঘ্রাণ নেয়া এবং নৈকট্য ও দূরত্ব বোধ করার ক্ষমতা রয়েছে।

'র'-কে এমন একটি সংস্থা হতে হবে, যেটির কল্পনাশক্তি নিয়ে ও সাহসিকতার সাথে কাজ করার, চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করার, অব্যর্থভাবে পূর্বাভাস দেয়ার এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া সঙ্কট কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার ক্ষমতা রয়েছে।

'র'-কে এমন একটি সংস্থা হতে হবে, যেটির সত্য প্রকাশ করলে কী পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তার পরোয়া না করে তা প্রকাশ করে দেয়ার সাহস রয়েছে।

এটাকে এমন একটি সংস্থা হতে হবে যার কর্মকর্তারা দেশের স্বার্থে কাজ করতে গর্ববোধ এবং নিজের কিংবা কোনো দলীয় সরকারের হীনস্বার্থে কাজ করার লোভ সংবরণ করতে সক্ষম।

এটাকে এমন একটি সংস্থা হতে হবে যার কর্মকর্তারা নিজেদের জ্ঞানের মিশনারি ভাবতে ভালোবাসেন এবং পদের মোহ যাদের মোহাবিষ্ট করে না কিংবা যারা এটাকে নিছক জীবিকার বাহন বলে মনে করে না।

'র' কি এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছে?

না, এখনো না।

ইন্দিরা গান্ধী ও কাও যে স্বপ্ন নিয়ে এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে স্বপ্ন কি এটা পূরণ করতে পেরেছে?

কেবল আংশিকভাবে পেরেছে।

২০০৮ সালে 'র'-এর ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক বছর আগে এই সংস্থাটিকে আমি কিভাবে মূল্যায়ন করব?

■ এটি গোপন তৎপরতা চালানোর ক্ষমতার দিক থেকে শক্তিশালী, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুর্বল।

■ নিম্ন ও মধ্যম মানের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সক্ষম, অতি উচ্চমানের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে দুর্বল।

■ টেকইন্টে দক্ষ, হিউমিন্টে দুর্বল।

■ তুলনা করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুর্বল।

■ বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষ, ভারতের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুর্বল।

■ তদন্তে শক্তিশালী, প্রতিরোধে দুর্বল।

■ সঙ্কট মোকাবেলায় শক্তিশালী, প্রতিরোধে দুর্বল।

■ গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে সব সময় চিন্তাক্লিষ্ট, স্বচ্ছতার ব্যাপারে শঙ্কিত।

এসব ঘাটতি দূর করতে কী কী করা দরকার?

■ এমন একটি রিক্রুটমেন্ট পলিসি অবলম্বন করা যাতে সবচেয়ে মেধাবীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে এখানে আসতে পারে।

■ পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে মেধাকে প্রাধান্য দেয়া।

■ অদক্ষ লোকদের বাছাই করে নিয়মিতভাবে বাদ দেয়া।

■ পেশাগত মানসিকতাকে উৎসাহিত ও চাকরির মানসিকতাকে নিরুৎসাহিত করা।

■ অদক্ষতা ও খারাপ দিকগুলো নিয়মিতভাবে চিহ্নিত ও দূর করার জন্য এর ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষা বাইরে থেকে করানোর বিষয়টিকে মেনে নেয়ার আগ্রহ প্রদর্শন করা।

■ পেশাগত সঙ্কীর্ণতা দূর করা এবং বুদ্ধির চর্চা করা।

এসব ঘাটতি দূর করার দায়িত্ব বহুলাংশে খোদ সংস্থাটির হলেও সম্পূর্ণটা নয়। এর দায়-দায়িত্ব দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের অন্যান্য শাখারও

রয়েছে। তাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, একটি সুদক্ষ গোয়েন্দা সংস্থা একটি জরুরি হাতিয়ার ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সম্পদ। তাদের অবশ্যই এটার বিকাশে সহায়তা দিতে হবে।

একটি সুদক্ষ গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলার কাজটি যদি যথাযথ গুরুত্ব না পায়, তাহলে আমরা যে ধরনের সংস্থার উপযুক্ত আমাদের সে ধরনের একটা গড়ে তুলতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই এশিয়ার দু'টি উদীয়মান শক্তির একটির অর্থাৎ ভারতের চাহিদা মতো হবে না।

অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের মতো ভারতের গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের কলেবরও ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ভারতের দু'টি গোয়েন্দা সংস্থা ছিল– আইবি ও সামরিক গোয়েন্দা। বর্তমানে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮-এ। এগুলো হচ্ছে : আইবি, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব সিকিউরিটি, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব এয়ার ইন্টেলিজেন্স, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব নেভাল ইন্টেলিজেন্স, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এবং ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন।

এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করা একটি সার্বক্ষণিক কাজ। এ কাজটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার তার কৌশলগত নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের বাইরেও করছেন। এখন সময় এসেছে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজারের পদ সৃষ্টি করা, যিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করবেন।

গোয়েন্দা সংস্থা এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলো জাতির দু'টি প্রধান তরবারি। এগুলোকে যদি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তাহলে এগুলোতে মরিচা পড়ে যাবে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব দেয়া দরকার। এটাকে অবহেলা করলে আমাদের চরম মূল্য দিতে হবে।

সমাপ্ত

বি রমন ১৯৬১ সালে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখায় এবং ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে রিসার্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (আর অ্যান্ড এ ডব্লিউ) সংক্ষেপে 'র' সৃষ্টির পর তাতে যোগদান করেন। র ভারত সরকারের কেবিনেট সচিবালয়ের অধীনে পরিচালিত বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা। বি রমন ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত র-এর কাউন্টার টেরোরিজম শাখার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট তিনি ভারত সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

রমন 'গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার' করতে ২০০০ সালে ভারত সরকারের গঠিত স্পেশাল টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন। তিনি ২০০০-এর জুলাই থেকে ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত সরকারের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়াও তিনি ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল অব সিকিউরিটি কো-অপারেশন এশিয়া প্যাসিফিকের টেরোরিজম সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য ছিলেন। ২০০২ সালের জুন মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটি এবং ২০০৩ সালের অক্টোবরে হাউস ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স কমিটির সামনে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।

রমন নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ইন্ডিয়ান ডিফেন্স রিভিউ'র সম্পাদকীয় বোর্ডের অনারারি সদস্য ছিলেন। তার রচিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে- 'ইন্টেলিজেন্স : পাস্ট, প্রেজেন্স অ্যান্ড ফিউচার' এবং 'এ টেরোরিস্ট স্টেট এজ এ ফ্রন্টলাইন এলাই'। তিনি দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় কৌশলগত বিষয়ের ওপর নিয়মিত লেখালেখি করেন। তিনি পুলিশ ও আর্মির বহু প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অতিথি বক্তা হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি চেন্নাইয়ের ইস্ট ইনস্টিটিউট ফর ট্রপিক্যাল স্টাডিজের পরিচালক। তিনি নয়াদিল্লির সাউথ এশিয়া অ্যানালাইসিস গ্রুপ (এসএএজি) (www.saag.org) ও চেন্নাই সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের (www.c3sindia.org.) সাথেও সম্পৃক্ত।

'র এর কাওবয়েরা' বইয়ে র'তে ২৬ বছরের কর্মজীবনে লেখক যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটি বিধৃত হয়েছে। এই বইয়ে সমসাময়িক কালের ইতিহাস – বিশেষ করে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে বিদ্রোহ, জরুরি অবস্থা, আফগানিস্তানে যুদ্ধ, গোয়েন্দাদের আশু করণীয় এবং ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজি দেশাই, রাজিব গান্ধী, ভিপি সিং, চন্দ্র শেখর ও নরসীমা রাওয়ের সময় ভারতে গোয়েন্দা কার্যক্রম কিভাবে চলেছে প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। এসব ঘটনাপ্রবাহে র-এর ভূমিকা কী ছিল এবং এর সফলতা ও ব্যর্থতা কোথায় ছিল তা নিরাসক্তভাবে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এতে র'কে যতটুকু কৃতিত্ব দেয়া জরুরি সেটুকু দেয়া হয়েছে আবার অনুরূপভাবে সমালোচনা যতটুকু করা দরকার সেটুকুও স্থান পেয়েছে।

প্রকাশভঙ্গির সরলতার জন্য খ্যাত লেখক বি রমন র-এর কর্মতৎপরতার ব্যাপারে জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বইটি তার মতামত ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা মেনে চলেছে। রমনের মতো একজন দুর্দান্ত লেখক র থেকে ১৯৯৪ সালে অবসর নেয়ার পর গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই বইটি পাঠকদের উপহার দিতে ১৩ বছর সময় নিয়েছেন। ভারতে অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তারা গোয়েন্দাগিরি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সাধারণ বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বাস্তব কর্মকাণ্ড নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বই লিখতে বরাবরই দ্বিধান্বিত। এ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে পর্যন্ত অন্যান্য দেশের অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দাদের মধ্যেও সক্রিয় ছিল। তার পর থেকে এটা কেটে যায়। এর ফলে বাস্তব গোয়েন্দা কার্যক্রম সংক্রান্ত গ্রন্থের দ্বারা সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গবেষকরা লাভবান হন। এই বইটি ভারতীয় গোয়েন্দাদের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসানেই রচিত, যাতে সাধারণভাবে ভারতবাসী উপকৃত হতে পারেন। বাংলাদেশের পাঠকদের জন্যও বইটি বেশ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে। বইটির একটি বড় অংশ জুড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এ দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনাপরম্পরা ও বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। সঙ্গত কারণেই এসব বিশ্লেষণে ভারতের একজন সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এর পরও বইটি বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হতে পারে এর নিরাসক্ততা ও বস্তুনিষ্ঠতার জন্য।